বিপ্রদাস

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

১

বলরামপুর গ্রামের রথতলায় চাষা-ভূষাদের একটা বৈঠক হইয়া গেল। নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে লাইনের কুলি গ্যাং রবিবারের ছুটির ফাঁকে যোগদান করিয়া সভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিল এবং কলিকাতা হইতে জন-কয়েক নাম-করা বক্তা আসিয়া আধুনিক কালের অসাম্য ও অমৈত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করিলেন। অসংখ্য প্রস্তাব গৃহীত হইল ও পরে শোভাযাত্রায় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি-সহযোগে গ্রাম পরিক্রমণপূর্ব্বক সেদিনের মত সম্মিলনীর কার্য্য সমাধা হইল।

বলরামপুর সমৃদ্ধ গ্রাম। ছোট-বড় অনেকগুলি তালুকদার ও সম্পন্ন গৃহস্থের বাস। একপ্রান্তে মুসলমান কৃষকপল্লী ও তাহারই অদূরে ঘরকয়েক বাগদী ও দুলেদের বসতি। ভাগীরথীর একটি শাখা বহুকাল পূর্ব্বে মজিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকারে ক্রোশেক বিস্তৃত বিলের সৃষ্টি করিয়াছে; ইহারই তীরে তাহাদের কুটির। এই গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা বিত্তশালী ব্যক্তি যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়। জমি-জমা তালুক-তেজারতি প্রভৃতিতে তাঁহার সম্পত্তি সম্পদ প্রচুর বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখের পথে এই শোভাযাত্রা যখন রক্তপতাকায় লিখিত নানাবিধ মন্ত্র ও বিপুল চীৎকারে কৃষক-মজুরের জয়-জয়কার হাঁকিয়া অতিক্রম করিতেছিল, তখন দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ গঠন যুবক নীচের সমস্ত দৃশ্য নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছিল। অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বিক্ষুব্ধ জনতার উদ্বেলিত কোলাহল যেন এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। পুরোবর্ত্তী নেতৃস্থানীয় জন দুই-তিন ব্যক্তি চমকিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া বহু লোকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া উপরের দিকে মুখ তুলিতেই তিনি থামের আড়ালে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

অনেকেই চাপা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, বিপ্রদাসবাবু!

কে বিপ্রদাস? গাঁয়ের জমিদার বুঝি?

কে একজন কহিল, হাঁ।

নেতারা সহরের লোক, কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করেন না; উপেক্ষাভরে

কাহলেন, ওঃ এই! এবং পরক্ষণেই উচ্চ চীৎকারে মাথার উপরে হাত ঘু সমস্বরে হাঁকিলেন, বল, 'ভারত মাতার জয়!' বল, 'কৃষাণ মজুরের জয়!' 'বন্দেমাতরম্!'

বিশেষ ফল হইল না। অনেকেই চুপ করিয়া রহিল, অথবা মনে মনে বলিল এবং যে দুই-চারিজন সাড়া দিল তাহাদেরও ক্ষীণ-কণ্ঠ বেশী ঊর্দ্ধে উঠিল না—বিপ্রদাসের বারান্দা ডিঙাইয়া তাঁহার কানে পৌঁছিল কি-না বুঝা গেল না। নেতারা নিজেদের অপমানিত জ্ঞান করিলেন, বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এই একটা সামান্য গ্রাম্য জমিদার তাকেই এত ভয়! ওরাই ত আমাদের পরম শত্রু—আমাদের গায়ের রক্ত অহরহ শুষে খাচ্চে। আমাদের আসল অভিযান ত ওদেরই বিরুদ্ধে! ওরা যে—

প্রদীপ্ত বাগ্মিতায় সহসা বাধা পড়িল। বহু শাণিত শর তখনও তাঁহাদের তূণে সঞ্চিত ছিল, কিন্তু প্রয়োগ করায় বিঘ্ন ঘটিল। কে একজন ভিড়ের মধ্য হইতে আস্তে বলিল, ওঁর দাদা!

কার?

একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক নিশান লইয়া সকলের অগ্রে চলিয়াছিল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, উনি আমারই বড়ভাই।

অথচ এই ছেলেটির আগ্রহ, উদ্যম ও অর্থব্যয়ে আজিকার অনুষ্ঠান সফল হইতে পারিয়াছিল।

ওঃ—আপনার! আপনিও বুঝি এখানকার জমিদার?

ছেলেটি সলজ্জ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

২

বিপ্রদাস নিজের বসিবার ঘরে ছোটভাইকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, কালকের আয়োজনটা মন্দ হয়নি। অনেকটা চমক লাগবার মত। War cry গুলোও বেশ বাছা বাছা, ঝাঁজ আছে তা মানতেই হবে।

দ্বিজদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপ্রদাস প্রশ্ন করিল, শোভাযাত্রাটি কি বিশেষ করে আমারই উদ্দেশে আমার নাকের ডগা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল? ভয় পাব বলে?

দ্বিজদাস শান্তভাবে জবাব দিল, শুধু আপনার জন্যেই নয়। শোভাযাত্রা যে পথ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হোক, ভয় যাদের পাবার তারা ত পাবেই দাদা!

বিপ্রদাস মুচকিয়া হাসিল। সে একেবারে অবজ্ঞা ভরা। বলিল, তোমার দাদা সে জাতের মানুষ নয়, এ খবর তোমার শোভাযাত্রীরা অনেকেই জানত। নইলে দের জয়ধ্বনি শোনবার জন্য আমাকে বারান্দায় উঠে গিয়ে কান পেতে দাঁড়াতে হ'ত না। ঘরে বসে শোনা যেত। তোমাদের রকমারি নিশান আর বড় বড় বক্তৃতাকে ভয় আমি করিনে। বেশ বুঝি ঝকঝকে বাঁধান দাঁত নিয়ে মানুষকে শুধু খিচোনোই যায়, তাতে কামড়ানোর কাজ চলে না।

যে কারণে কাল বহু লোকেরই কণ্ঠরোধ হইয়াছিল তাহা গোপন ছিল না। এবং ইহারই ইঙ্গিতে দ্বিজদাস মনে মনে গভীর লজ্জা বোধ করিল। সে স্বভাবতঃ শান্ত-প্রকৃতির মানুষ, এবং দাদাকে অত্যন্ত মান্য করিত বলিয়া হয়ত আর কোন প্রসঙ্গে চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু যা লইয়া তিনি খোঁচা দিলেন সে সহ্য কঠিন। তথাপি মৃদু-কণ্ঠেই বলিল, দাদা, বাঁধানো দাঁত দিয়ে যেটুকু হয় তার বেশি যে হয় না এ আমরা জানি, শুধু আপনারাই জানেন না যে সংসারে সত্যিকার দাঁতওয়ালা লোকও আছে, কামড়াবার দিন এলে তাদের অভাব হয় না।

জবাবটা অপ্রত্যাশিত। বিপ্রদাস আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বটে!

দ্বিজদাস প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সভয়ে থামিয়া গেল। ভয় বিপ্রদাসকে নহে, অকস্মাৎ দ্বারের বাহিরে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তোরা দরজায় পর্দ্দা টাঙিয়ে রাখিস্ কেন বল্ ত? ছোঁয়া-ছুঁয়ি না করে যে ঘরে ঢুকবো তার যো নেই। ঘর-সংসার বিলিতি ফ্যাশনে ভরে গেল।

দ্বিজদাস ব্যস্ত হইয়া পর্দ্দাটা টানিয়া দিল, এবং বিপ্রদাস চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু রূপের অবধি নাই। একটু কৃশ, মুখের 'পরে বৈধব্যের কঠোরতার ছাপ পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। ছোটছেলের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া বড়ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, হাঁ রে, বিপিন, শুনচি নাকি একাদশী নিয়ে এ মাসে পাঁজিতে গোল বেঁধেচে? এমন ত কখনও হয় না।

বিপ্রদাস কহিল, হওয়া ত উচিত নয় মা!

তুই স্মৃতিরত্নমশাইকে একবার ডেকে পাঠা। তাঁর মতটা কি শুনি।

বিপ্রদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা পাঠাচ্ছি। কিন্তু তাঁর মতামতে কি হবে মা, তোমার কানে একবার যখন খবর পৌঁছেচে, তখন ও-দুটো দিনের একটা দিনও তুমি জল-স্পর্শ করবে না তা জানি।

মা হাসিলেন, বলিলেন, মিথ্যে উপোস করে মরা কি কারও সখ রে? উপায় কি? এ করলে পুণ্যি নেই, না করলে অনন্ত নরক। হাঁ রে, বৌমা বলছিল খবরের কাগজে লিখেচে কে একজন মস্ত পণ্ডিত কলকাতায় নাকি চমৎকার ভাগবত ব্যাখ্যা করচেন। একবার খোঁজ নে দিকি, কি হলে এ বাড়িতে তিনি পায়ের ধুলো দিতে পারেন?

তোমার হুকুম হলেই নিতে পারি মা।

কেন, আমার হুকুমেরই বা দরকার কি! তোদের শুনতে কি ইচ্ছে যায় না! সেই যে কবে কথকতা হয়ে গেল—

বিপ্রদাস সহাস্যে বাধা দিয়া কহিল, সে ত এখনো তিন মাসও হয়নি মা!

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, মোটে তিন মাস? কিন্তু তিন মাস কি কম সময়! তা সে যাই হোক বাবা, এবার কিন্তু না বললে চলবে না। আমার দুই মামাই চিঠি লিখেচেন। কৈলাসনাথ, মানস সরোবর দর্শনে এবার আমি যাবই যাব।

বিপ্রদাস হাতজোড় করিয়া কহিল, দোহাই মা, ও আদেশটি তুমি ক'রো না। তোমার দুই ছেলের একজন সঙ্গে না গেলে মামাদের জিম্মায় তোমাকে তিব্বতে পাঠাতে পারব না। আর সব ক্ষতিই সইবে, কিন্তু মাকে হারান আমার সইবে না।

মায়ের দুই চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, বলিলেন, ভয় নেই রে, কৈলাসের পথে মরণ হবে এমন পুণ্যি তোর মায়ের নেই। আমি আবার ফিরে আসব। কিন্তু ছেলের মধ্যে তুই ত আমার সঙ্গে যেতে পারবিনে বিপিন, তোর 'পরেই এত বড় সংসারের সব ভার, আর পিছনে যে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে তাকে নিয়ে আমি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজি নই। বামুনের ছেলে হয়ে সন্ধ্যে-আহ্নিক ত অনেকদিনই ছেড়েচে, শুনতে পাই কলকাতায় খাদ্যাখাদ্যের নাকি বিচার করে না। এর ওপর কাল কি করেচে শুনেচিস্?

বিপ্রদাস ভালমানুষের মত করিয়া কহিল, আবার কি করলে? কই শুনিনি কিছু।

মা বলিলেন, নিশ্চয় শুনেচিস্। তোর চোখকে ফাঁকি দেবে এত বুদ্ধি ও ছোঁড়ার ঘটে নেই। কিন্তু এর একটা প্রতিকার কর্। ও আমারই খাবে পরবে, আর আমারই টাকায় কলকাতা থেকে লোক এনে আমার প্রজা বিগড়োবার ফন্দি আঁটবে! ওর কলকাতার খরচা তুই বন্ধ কর।

বিপ্রদাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সে কি কথা মা, পড়ার খরচা বন্ধ করে দেব? ও পড়বে না?

মা বলিলেন, দরকার কি? আমার শ্বশুরের ইস্কুলের ছাত্ররা যখন দল বেঁধে এসে বললে, বিদেশী লেখপড়ায় দেশের সর্ব্বনাশ হ'ল, তখন তাদের তুই তেড়ে মারতে গেলি! আর তোর নিজের ছোটভাই যখন ঠিক ঐ কথাই বলে বেড়ায় তার কি কোন প্রতিবিধান করবিনি? এ তোর কেমন বিবেচনা?

বিপ্রদাস হাসি-মুখে কহিল, তার কারণ আছে মা। ইস্কুলের ক্লাসে প্রমোশন না পেয়ে ও নালিশ করলে আমার সয় না, কিন্তু দ্বিজুর মত এম. এ. পাশ করে বিলিতি শিক্ষাকে যত খুশি গাল দিয়ে বেড়াক আমার গায়ে লাগে না।

মা বলিলেন, কিন্তু এটা? আমার টাকায় আমার প্রজা ক্ষ্যাপানো?

দ্বিজদাস এতক্ষণ নিঃশব্দে ছিল, একটা কথারও জবাব দেয় নাই। এবার উত্তর দিল, কহিল, কালকের সভা-সমিতির জন্যে তোমাদের এষ্টেটের একটা পয়সাও আমি অপব্যয় করিনি।

মা ঘরে ঢুকিয়া পর্য্যন্ত একবারও পিছনে তাকান নাই, এখনও চাহিলেন না। বিপ্রদাসকেই প্রশ্ন করিলেন, তা হলে হতভাগাকে জিজ্ঞেস কর্ ত টাকা পেল কোথায়? রোজগার করেচে?

ঠিক এমনি সময়ে পর্দ্দার বাহিরে টুং টাং করিয়া একটুখানি চুড়ির শব্দ হইল। বিপ্রদাস কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, ঐ ত তার জবাব মা! তোমার নিজের ঘরের বৌ যদি টাকা যোগায়, কে আটকাবে বল দিকি?

মায়ের মনে পড়িল। কহিলেন, ও তাই বটে! সতীর কাজ এই! বড়-মানুষের মেয়ে বাপের জমিদারী থেকে বছরে যে ছ হাজার টাকা পায়, সে আমার খেয়াল ছিল না। তিনিই গুণধর দেওরকে টাকা যোগাচ্চেন। একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিলেন, তোর সম্বন্ধ করতে বেয়াইমশাই নিজে যখন এলেন তখনি কর্ত্তাকে আমি বলেছিলুম, রায়বাড়ির মেয়ে ঘরে এনে কাজ নেই। ওদের বংশেরই ত অনাথ রায় বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করেছিল। ওরা পারে না কি? ওদের অসাধ্য সংসারে কি আছে?

বিপ্রদাস তেমনি হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। সে জানিত সতীর অদৃষ্টে এ খোঁটা আর যাবার নয়। তাহার বাপের বাড়ির সম্পর্কে কে এক অনাথ রায় বাঙালী-মেম বিবাহ করিয়াছিল এ কথা মা আর ভুলিতে পারিলেন না।

সকলেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি পুনশ্চ বলিলেন, আচ্ছা থাক্। বাবা কৈলাসনাথ এবার টেনেচেন, তাঁকে দর্শন করে ফিরে আসি, তার পরে এর বিহিত করব। বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিপ্রদাস কহিল, কি রে দ্বিজু, মাকে নিয়ে পারবি যেতে? উনি ঝোঁক যখন ধরেচেন তখন থামানো যাবে ভরসা হয় না।

দ্বিজদাস তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিয়া কহিল, আপনি ত জানেন, ঠাকুর-দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া আমার সঙ্গে উনি বৈকুণ্ঠে যেতেও নারাজ, এ ত তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনলেন।

বিপ্রদাস বিরক্ত হইয়া কহিল, হাঁ রে পণ্ডিত, শুনলাম। তুই যেতে পারবি কি না তাই বল্।

আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই। বলিয়া দ্বিজদাস অন্য প্রশ্নের পূর্ব্বেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিপ্রদাস নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাই বটে। এমনি দেশের কাজ যে মাকেও মানা চলে না।

এইখানে মায়ের একটুখানি পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিপ্রদাসের ইনি বিমাতা। তাঁহার জননীর মৃত্যুর বৎসর-কাল পরেই যজ্ঞেশ্বর দয়াময়ীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতে ইহার হাতেই সে মানুষ। ইনি যে জননী নহেন এ সংবাদ বিপ্রদাস যথেষ্ট বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত জানিতেও পারে নাই।

৩

এ বাড়িতে দ্বিজদাস সব চেয়ে বেশি খাতির করিত বৌদিদিকে। তাহার সর্ব্ববিধ বাজে খরচের টাকাও আসিত তাঁহারই বাক্স হইতে। সতী শুধু সম্পর্ক হিসাবে তাহার বড় ছিল না, বয়সের হিসাবেও মাস-কয়েকের বড় ছিল। তাই অধিকাংশ সময়েই তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিত। এই লইয়া ছেলে-বেলায় দ্বিজু মায়ের কাছে কত যে নালিশ জানাইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

মাত্র এগারো বছর বয়সে সতী বধূরূপে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাহার আদরের সীমা ছিল না। শাশুড়ী হাসিয়া বলিতেন, সত্যি নাকি? কিন্তু এ ত তোমার বড় অন্যায় বৌমা, দেওরের নাম ধরে ডাকা!

সতী বলিত, অন্যায় কেন, আমি যে ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

অনেক বড়? কত বড় মা?

আমি জন্মেচি বোশেখ মাসে, ও জন্মেচে ভাদ্র মাসে।

মা সহাস্যে কহিতেন, ভাদ্র মাসেই ত বটে মা, আমারই মনে ছিল না! এর পরেও আর যদি কখনো ও নালিশ করতে আসে ওর কান মলে দেব।

আদালতে হারিয়া দ্বিজু রাগ করিয়া চলিয়া গেলে বধূকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া শাশুড়ী সস্নেহে বলিতেন, ও ছেলেমানুষ কি না তাই বোঝে না। ঠাকুরপো বললে ভারি খুশী হয়! মাঝে মাঝে ডেকো, কেমন মা?

সতী রাজি হইয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিয়াছিল, আচ্ছা মা, মাঝে মাঝে তাই বলে ডাকবো।

সেদিন যে ছিল বালিকা, আজ সে এত বড় বাড়ির গৃহিণী। বিধবা হওয়ার পর হইতে শাশুড়ী ত থাকেন নিজের জপ-তপ এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া, তথাপি তাঁহার সেদিনের সেই উপদেশটুকু পরবর্ত্তী কালে সতীর অনেক দিন অনেক কাজে লাগিয়াছে। যেমন আজ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার প্রায় পোনর-ষোল দিন অতীত হইয়াছে, সকাল-বেলা সতী দেবরের পড়িবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে ডাকিল, ভাই ঠাকুরপো—

দ্বিজদাস হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক্ বৌদি, আর খোসামোদের আবশ্যক নেই, আমি করব।

কি করবে শুনি?

তুমি যা হুকুম করবে তাই। কিন্তু দাদার এ ভারী অন্যায়।

অন্যায়টা কিসে হ'ল বল ত?

দ্বিজদাস তেমনি রাগ করিয়াই কহিল, আমি জানি। এই মাত্র দাদার ঘরের সুমুখ দিয়ে এসেচি। ভেতরে তিনি, মা এবং তোমার ষড়যন্ত্র যা হচ্ছিল আমার কানে গেছে। তাঁদের সাহস নেই আমাকে বলেন, তাই তোমাকে ধরেচেন কাজ আদায়ের জন্যে। কত বড় অন্যায় বল ত!

সতী হাসিমুখে কহিল, অন্যায় ত নয় ঠাকুরপো। তাঁরা বেশ জানেন যে তাঁরা বলা মাত্রই জবাব আসবে, আমার মরবার ফুরসুৎ নেই—কিন্তু বৌদিদি হুকুম করলে দ্বিজুর সাধ্য নেই যে না বলে।

দ্বিজদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, এইখানেই হয়েচে আমার মুস্কিল, আর এইখানেই পেয়েচেন ওঁরা জোর। কিন্তু কি করতে হবে?

সতী বলিল, মা কৈলাস-দর্শনে যাবেনই, আর তোমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে।

দ্বিজদাস কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দু-তিন মাসের কম হবে না। কাজের কত ক্ষতি হবে ভেবে দেখেচো বৌদি ?

সতী স্বীকার করিয়া বলিল, ক্ষতি কিছু হবেই। কিন্তু একটা নতুন জায়গাও দেখা হবে। নিজের তরফ থেকে একে নিছক লোকসান বলা চলে না। লক্ষ্মী ভাইটি, পরে যেন আর আপত্তি ক'রো না।

দ্বিজদাস কহিল, তুমি যখন আদেশ করেচ, তখন আপত্তি আর করব না, সঙ্গে যাব। কিন্তু মা অনায়াসে সেদিন দাদাকে বলেছিলেন, আমার কলকাতার পড়ার খরচ বন্ধ করে দিতে।

সতী সহাস্যে বলিল ওটা রাগের কথা ভাই। কিন্তু হুকুম যিনি দিলেন, তিনি মা ছাড়া আর কেউ নয়। এ কথাটাও তোমার ভুললে চলবে না।

দ্বিজদাস উত্তর দিল, ভুলিনি বৌদি! কিন্তু সেদিন থেকে আমিও কি স্থির করেচি জান? আমি একলা মানুষ, বিয়ে করবার আমার কখনো সময় হবে না, সুযোগও ঘটবে না। সুতরাং খরচ সামান্য। আবশ্যক হলে বরঞ্চ ছেলে পড়িয়ে খাব, কিন্তু এদের এষ্টেট থেকে একটা পয়সাও কোনদিন চাইব না।

সতী পুনরায় হাসিয়া কহিল, চাইবার দরকার হবে না ঠাকুরপো, আপনি এসে হাজির হবে। আর তাও যদি না আসে তোমার ছেলে পড়াবার প্রয়োজন হবে না। অন্ততঃ আমি বেঁচে থাকতে ত নয়। সে ভার আমার রইল।

এ বিশ্বাস দ্বিজুরও মনের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় ছিল, পলকের জন্য তাহার চোখের পাতা ভারি হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ভাবনা তাড়াতাড়ি কাটাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা কবে যাত্রা করবেন স্থির করচেন? যবেই করুন, শেষকালে আমাকেই সঙ্গে যেতে হল! অথচ মা সেদিন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে আমার মত ম্লেচ্ছাচারীকে নিয়ে তিনি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজি ন'ন। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস, না বৌদি?

সতী এ অনুযোগের জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিজু বলিল, সে যাই হোক, তোমার আদেশ অমান্য করব না বৌদি, তাঁদের নিশ্চিন্ত থাকতে ব'লো।

সতী হাসিল, কহিল, আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত আছেন। ঘর থেকে বার হওয়া মাত্র তোমার দাদার কথা কানে গেল, তিনি জোর গলায় মাকে বলছিলেন, এবার নির্ভয়ে যাত্রার আয়োজন করগে মা, যাকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করা গেল তাঁর সুমুখে ভায়ার তর্ক চলবে না। ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করবে, তুমি দেখে নিয়ো।

শুনিয়া দ্বিজদাস ক্রোধে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, অস্বীকার করতে পারব না, জেনেই যদি তাঁরা এ ফন্দি এঁটে থাকেন যে মেয়েদের এই অর্থহীন খেয়াল চরিতার্থ করার বাহন আমাকেই হতে হবে, তা হলে আমার পক্ষ থেকে তুমি দাদাকে এই কথাটা ব'লো বৌদি, যে, তাঁদের লজ্জা হওয়া উচিত।

সতী কহিল, বলে লাভ নেই ঠাকুরপো, জমিদার হয়ে যারা প্রজার রক্ত শুষে খায়, এই তাদের নীতি। নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য এদের কোন লজ্জাবোধ নেই। সম্পত্তির অর্দ্ধেক মালিক হয়েও তুমি এদের এষ্টেট থেকে টাকা নিতে সঙ্কোচ বোধ কর, তখন একদিকে আমি যেমন দুঃখ পাই, তেমনি আর একদিকে মন খুশীতে ভরে ওঠে। তোমার নাম করে আমি মাকে আশ্বাস দিয়েচি যে, তাঁর যাওয়ার বিঘ্ন হবে না, সঙ্গে তুমি যাবে। তীর্থ থেকে ভালয় ভালয় ফিরে এসো ঠাকুরপো, যত লোকসানই তোমার হোক, আমি সবটুকু তার পূর্ণ করে দেব।

দ্বিজদাস নিঃশব্দে চৌকি হইতে উঠিয়া বৌদির পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া ফিরিয়া গিয়া বসিল।

সতী বলিল, এতক্ষণ পরের উমেদারি করেই ত সময় কাটল, এখন নিজের অনুরোধ একটা আছে।

দ্বিজদাস হাসিয়া কহিল, তোমার নিজের ? ঐ কিন্তু পারব না বৌদি !

সতী নিজেও হাসিল, বলিল, আশ্চর্য্য নয় ঠাকুরপো। ভয় হয় পাছে শুনে না বলে বসো।

বেশ ত, বলেই দেখো না।

সতী কহিল, আমার এক ম্লেচ্ছ খুড়ো আছেন—আপনার নয়, বাবার খুড়তুত ভাই, তিনি বিলাত গিয়েছিলেন। তখন এ খবরটা এঁদের কানে এসে পৌঁছলে এ বাড়িতে আমার ঢোকাই ঘটত না। মার মুখে ও কথা শুনেচ বোধ হয় ?

বহু বার ! এমন কি গড়পড়তা দিনে একবার করে হিসাব করে নিলে এই পোনর-ষোল বছরে অন্ততঃ সংখ্যায় হাজার পাঁচ-ছয় হবে।

সতী হাসিয়া কহিল, আমারও আন্দাজ তাই। কাকা থাকেন বোম্বায়ে। তাঁর একটি মেয়ে ঐখানেই লেখাপড়া করে। আসচে বছরে সে বিলাত যাবে পড়া শেষ করতে। তোমাকে গিয়ে তাকে আনতে হবে।

কোথায় ? বোম্বাই থেকে ?

হাঁ। সে লিখেচে, সে একলাই আসতে পারে, কিন্তু এতটা দূর একাকী আসতে বলতে আমার সাহস হয় না।

তাঁকে পৌঁছে দেবার কেউ নেই ?

না, কাকা ছুটি পাবেন না।

দ্বিজদাস হঠাৎ রাজি হইতে পারিল না, ভাবিতে লাগিল। সতী বলিতে লাগিল, আমার বিয়ে যখন হয় তখন সে সে সাত-আট বছরের বালিকা। তার পরে একটিবার মাত্র দেখা হয় কলকাতায়, তখন সে সবে ম্যাট্রিক পাশ করে আই. এ. পড়তে সুরু করেচে—সে ত কত বছর হয়ে গেল। তাকে আমি ভারি ভালবাসি ঠাকুরপো, যদি কষ্ট করে গিয়ে একবার এনে দাও। আনবার জন্যে সে আমাকে প্রায় চিঠি লেখে, কিন্তু সুযোগ আর হয় না।

দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এখনই বা সুযোগ হ'ল কিসে? মা কি রাজি হয়েচেন ?

সতী এ প্রশ্নের সহসা উত্তর দিতে পারিল না। এবং পারিল না বলিয়াই একটি সত্যকার ব্যাকুলতা তাহার মুখে প্রকাশ পাইল। একটুখানি থামিয়া কহিল, মাকে বলেচি। এখনো ঠিক মত দেননি বটে, কিন্তু নিজের তীর্থ-যাত্রা নিয়ে এমনি মেতে আছেন যে, আশা হয় আপত্তি করবেন না। তা ছাড়া নিজে যখন থাকবেন না তখন এই দু-তিন মাস সে অনায়াসে আমার কাছে থাকতে পারবে।

দ্বিজদাস মনে মনে বুঝিল, শাশুড়ীর হুকুম না পাইলেও এই সুযোগে সে প্রবাসী বোনটিকে একবার কাছে আনাইতে চায়। প্রশ্ন করিল, তোমার কাকারা কি ব্রাহ্ম-সমাজের ?

সতী বলিল, না। কিন্তু হিন্দু সমাজও তাদের আপন বলে নেয় না। ওরা ঠিক যে কোথায় আছে নিজেরাও বোধ করি জানে না? এমনিভাবেই দিন কেটে যাচ্চে।

এ অবস্থা অনেকেরই। দ্বিজু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, যেতে আমার আপত্তি নেই বৌদি, কিন্তু আমি বলি, মা থাকতে তাকে তুমি এখানে এনো না। মাকে ত জানই, হয়ত খাওয়া-ছোঁয়া নিয়ে এমন কাণ্ড করবেন যে, বোনকে নিয়ে তোমার লজ্জার সীমা থাকবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা চলে গেলে তাকে আনার ব্যবস্থা করো—সব দিকেই ভাল হবে।

ইহা যে সুপরামর্শ তাহা সতী নিজেও জানিত, কিন্তু সে যখন নিজে চিঠি লিখিয়া আসিবার প্রার্থনা জানাইয়াছে, তখন কি করিয়া যে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় নিষেধ করিয়া চিঠির উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ইহার সঙ্কোচ এবং দুঃখই কি কম ? কহিল, নিজের বোন বলে বলচিনে ঠাকুরপো, কিন্তু দেবার

মাস-খানেক তাকে কলকাতায় অত্যন্ত নিকটে পেয়ে নিশ্চয় বুঝেছি যে, রূপে-গুণে তেমন মেয়ে সংসারে দুর্লভ। বাইরে থেকে তাদের আচার-ব্যবহার যেমনই দেখাক, মা তাকে যদি দুটো দিনও কাছে কাছে দেখতে পান ত ম্লেচ্ছ মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে যাবে। কখনো তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারবেন না।

দ্বিজদাস বলিল, কিন্তু এই দুটো দিনই যে মাকে দেখানো শক্ত বৌদি। তিনি দেখতেই চাইবেন না। ইহাও সত্য।

সতী কহিল, কিন্তু তার রূপটাও ত চোখে পড়বে? চোখ বুজে ত মা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না! সেও ত একটা পরিচয়।

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। সতী কহিল, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস বন্দনাকে পৃথিবীতে কেউ অবহেলা করতে পারে না। মাও না।

দ্বিজদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা! নামটা শুনেচি মনে হয় বৌদি। কোথায় যেন দেখেচি, আচ্ছা দাঁড়াও, খবরের কাগজে কি—একটা ছবিও যেন—

কথাটা শেষ হইল না, ঝি সশব্দে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বৌমা, তুমি এখানে? তোমার কে-এক কাকা তাঁর মেয়ে নিয়ে বোম্বাই থেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বাইরে কেউ নেই, বড়বাবুও না। সরকারমশাই তাদের নীচের ঘরে বসিয়েছেন।

ঘটনাটা অভাবনীয়। অ্যাঁ—বলিস্ কি রে? বলিতে বলিতে সতী ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পিছনে গেল দ্বিজদাস।

৪

নিখুঁত সাহেবী-পরিচ্ছদে ভূষিত একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়াছিলেন, এবং একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে তাঁহারই পাশে দাঁড়াইয়া দেয়ালে টাঙানো মস্ত একখানি জগদ্ধাত্রী দেবীর ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহারও পরণে যাহা ছিল তাহা নিছক মেম-সাহেবের মত না হোক, বাঙলার মেয়ে বলিয়াও হঠাৎ মনে হয় না। বিশেষতঃ গায়ের রঙটা যেন সাদার ধার ঘেঁষিয়া আছে—এমনি ফর্সা। দেহের গঠন ও মুখের শ্রী অনিন্দ্যসুন্দর। দেবরের কাছে সতী এইমাত্র যে গর্ব্ব করিয়া বলিতেছিল তার রূপটা ত শাশুড়ীর চোখে পড়িবে—বস্তুতঃ এ কথা সত্য। ভগিনীর হইয়া এ রূপ লইয়া অহঙ্কার করা চলে।

ঘরে ঢুকিয়া সতী গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, সেজকাকা, মেয়ের বাড়িতে এতকাল পরে পায়ের ধুলো পড়ল।

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সতীর মাথায় হাত দিলেন, সহাস্যে কহিলেন, হ্যাঁ রে বুড়ি, পড়ল! কবে, কোন কালে কাকাকে নেমন্তন্ন করে খবর পাঠিয়েছিলি যে অস্বীকার করেছিলাম? কখনো বলেচিস্ আসতে? নিজে যখন যেচে এলাম তখন মস্ত ভণিতা করে বলা হচ্ছে পায়ের ধুলো পড়ল? দ্বিজদাসের প্রতি চোখ পড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কে?

সতী পিছনে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, ওটি আমার দেওর—দ্বিজু।

দ্বিজদাস দূর হইতে নমস্কার করিল। বন্দনা দিদিকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, ওঃ—ইনিই সেই? যাঁর জ্বালায় জমিদারী বুঝি যায়। আমাকে চিঠিতে লিখেছিলে? বংশ ছাড়া, গোত্র-ছাড়া, ভয়ঙ্কর স্বদেশী?

অমন কথা তোকে আবার কবে লিখলুম?

এই ত সেদিন। এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

সতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, ওসব লিখিনি, তোর মনে নেই।

দ্বিজদাস এতক্ষণ পর্য্যন্ত কি এক প্রকার সঙ্কোচের বশে যেন আড়ষ্ট হইয়াছিল। অনাত্মীয়, অপরিচিত যুবতী স্ত্রীলোকের সম্মুখে কি করা উচিত, কি বলিলে ভাল দেখায়, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। ইতিপূর্ব্বে কখনো সুযোগও ঘটে নাই, প্রয়োজনও হয় নাই, কিন্তু এই নবাগত তরুণীর আশ্চর্য্য স্বচ্ছন্দতায় সে যেন একটা নূতন শিক্ষা লাভ করিল। তাহার অহেতুক ও অশোভন জড়তা এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গিয়া সে এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করিল। মেয়েদেরও যে শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রয়োজন এ কথা সে বুদ্ধি দিয়া চিরদিনই স্বীকার করিত এবং মা ও দাদার সহিত তর্ক বাধিলে সে এই যুক্তিই দিত যে, স্ত্রীলোক হইলেও তাহারা মানুষ, সুতরাং শিক্ষা ও স্বাধীনতায় তাহাদের দাবী আছে। মূর্খ করিয়া তাহাদের ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা অন্যায়। কিন্তু আজ এই অতিথি মেয়েটির আকস্মিক পরিচয়ে সে চক্ষের পলকে প্রথম উপলব্ধি করিল যে, ঐ-সব মামুলী দাবী দাওয়ার যুক্তির চেয়েও ঢের বড় কথা এই যে, পুরুষের চরম ও পরম প্রয়োজনেই রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রয়োজন। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া পুরুষ কতখানি যে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে এ সত্য এত বড় স্পষ্ট করিয়া ইতিপূর্ব্বে সে কখনো দেখে নাই। মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া হাসিমুখে কহিল, আপনার কথাই ঠিক, বৌদি ভুলে গেছেন। কিন্তু এ নিয়ে বাদানুবাদ করে লাভ নেই। এই বলিয়া সে ছদ্মগাম্ভীর্য্যে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, বৌদি, তোমার জোরেই আমার সমস্ত জোর, আর তোমারই চিঠিতেই এই কথা? বেশ, আমাকে তোমরা ত্যাগ কর, আর আমিও আমার সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ

করচি। তোমাদের জমিদারী অক্ষয় হয়ে থাক্, তুমি একটিবার মুখ ফুটে আদেশ কর, আজই উকিল ডেকে সমস্ত লেখাপড়া করে দিচ্ছি। ইনিই সাক্ষী থাকুন, দেখ আমি পারি কি না?

সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, তোর দেওর ভয়ঙ্কর স্বদেশী নাকি সতী?

সতী বলিল, হাঁ, ভয়ঙ্কর।

তুই বললেই লেখাপড়া করে জমিদারীর অংশ ছেড়ে দিতে চায়?

সতী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, ও স্বচ্ছন্দে পারে। ওর অসাধ্য কাজ নেই।

বন্দনা কৌতূহল দমন করিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি বলচেন? চিরকালের জন্য বাস্তবিক সমস্ত ত্যাগ করতে পারেন?

দ্বিজদাস তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, সত্য পারি। ওতে আমার এক তিল লোভ নেই। দেশের পনের আনা লোক একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না—উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও না,—আর বিনা পরিশ্রমে আমার বরাদ্দ পোলাও কালিয়া—ও পাপের অন্ন আমার মুখে রোচে না গলায় আটকাতে চায়। ও বিষয় আমার গেলেই ভাল। তখন দেশের পাঁচজনের মত খেটে খেয়ে বাঁচি। জোটে মঙ্গল, না জোটে তাদের সঙ্গে উপোস করে মরতে পারবো বরঞ্চ একদিন স্বর্গে যেতেও পারব, কিন্তু এ পথে কোন কালে সে আশা নেই।

বন্দনা নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া শুনিতেছিল কথা শেষ হইলে আর কথা কহিল না, শুধু মুখ দিয়া তাহার একটা নিশ্বাস পড়িল।

সতীর হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল। ঠাকুরপোর এ ছাড়া যেন আর কথা নেই। বলে বলে এমনি মুখস্থ হয়ে গেছে। কহিল, পুরান বক্তৃতা পরে দিও ঠাকুরপো, ঢের সময় পাবে। সেজকাকাবাবুর হয়ত এখনও হাত মুখ ধোয়াও সারা হয়নি। বন্দনা, চল্ ভাই, ওপরে গিয়ে কাপড় চোপড় ছাড়াবি।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, জামাই বাবাজিকে দেখ চনে ত?

সতী কহিল, তিনি সকালেই কি একটা জরুরি কাজে বেরিয়েছেন, ফিরতে বোধ করি দেরি হবে।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি, তোমার শাশুড়ীকে ত দেখতে পেলুম না? বাড়ীতেই আছেন?

সতী কহিল, এখনো আছেন, কিন্তু শীঘ্রই কৈলাস মানস সরোবরে তীর্থ-যাত্রা করবেন। সমস্ত সকালটা পূজা আহ্নিক নিয়েই থাকেন, আর একটু বেলা হলেই তাঁকে দেখতে পাবে।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, তিনি খুব বেশি ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়েই থাকেন, না?

সতী বলিল, হাঁ।

বিধবা হবার পর শুনেচি ঘর-সংসার কিছুই দেখেন না, সত্যি?

সত্যি বই কি। সব আমাকেই দেখতে শুনতে হয়।

বন্দনা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি তোমার সৎশাশুড়ী না মেজদি?

সতী হাসিয়া বলিল, চোখে ত দেখিনি বোন, লোকে হয়ত মিথ্যে কথা বলে।

দ্বিজদাস উত্তর দিয়া বলিল, মিথ্যেই বলে। কারণ সৎশাশুড়ী মানে দাদার সৎমা ত? মিছে কথা। সৎমা বটে, দাদার নয়, আমার। সে যাক, স্নানাদি সেরে নিয়ে সে আলোচনা পরে হবে, এখন ওপরে চলুন। আচ্ছা, আমি দেখি গে—বৌদি, আর দেরি ক'রো না এঁদের নিয়ে এস। বলিয়া সে আয়োজনের তত্ত্বাবধান করিতে চলিয়া যাইতেছিল, এমনি সময় মাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

খুব সম্ভব দয়াময়ী খবর পাইয়া আহ্নিকের মাঝখানেই পূজার ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। বয়স বেশি নয় বলিয়া তিনি বৈধব্যের পরেও সচরাচর অনাত্মীয় পুরুষদের সম্মুখে বাহির হইতেন না, অন্তরালে থাকিয়া কথা কহিতেন, কিন্তু আজ একেবারে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাথার কাপড় কপালের উপর পর্য্যন্ত টানিয়া দেওয়া, কিন্তু মুখের সবখানিই দেখা যাইতেছে।

আমার মেজকাকাবাবু মা। আর এইটি আমার বোন বন্দনা। বলিয়া সতী কাছে আসিয়া হঠাৎ শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। এমন অকারণে প্রণাম করা প্রথাও নয়, কেহ করেও না। দয়াময়ী মনে মনে হয়তো একটু আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু সে উঠিয়া দাঁড়াইতে সস্নেহে সযত্নে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু বন্দনার প্রতি চোখ পড়িতেই তাঁহার চোখের দৃষ্টি রুক্ষ হইয়া উঠিল। দিদির দেখাদেখি সেও কাছে আসিয়া প্রণাম করিল, কিন্তু তিনি স্পর্শ করিলেন না, বরঞ্চ বোধ হয় স্পর্শ বাঁচাইতে এক পা পিছাইয়া গিয়া শুধু অস্ফুটে বলিলেন, বেঁচে থাক।

রায়সাহেব কহিলেন, বেহানঠাকরুণ, নমস্কার। ছেলে-মেয়ের ভাগ্য যে হঠাৎ আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।

ভদ্রলোক প্রতি-নমস্কার করিয়া কহিলেন, নানা কারণে সময় পাইনে বেহানঠাকরুণ, কিন্তু না বলে কয়ে এমন হঠাৎ এসে পড়ার দোষ মার্জ্জনা করবেন। এবারে যখন আসব যথাসময়ে একটা খবর দিয়েই আসব।

দয়াময়ী এ-সব কথার উত্তর দিলেন না, শুধু বলিলেন, পূজা-আহ্নিক এখনো সারা

হয়নি বেইমশাই, আবার দেখা হবে। বৌমা, এঁদের ওপরে নিয়ে যাও, খাওয়া-দাওয়ার যেন কষ্ট না হয়। বিপিন এলে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিয়ো। বলিয়া তিনি আর কোন দিকে না চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাহ্যতঃ প্রচলিত সৌজন্যের বিশেষ কিছু যে ত্রুটি হইল তাহা নয়, ভিতরের দিক দিয়াই সকলেরই মনে হইল জ্যোৎস্নার মাঝামাঝি একখণ্ড কালো মেঘ নির্ম্মল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাসিয়া গেল।

৫

বন্দনা স্নানাদি সারিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল পিতা ইতিপূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া লইয়াছেন। একখানা জমকালো গোছের আরাম-কেদারায় বসিয়া চোখে চশমা দিয়া সংবাদ-পত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পাশের ছোট্ট টেবিলের উপর একরাশ খবরের কাগজ এবং কাছে দাঁড়াইয়া দ্বিজদাস সেইগুলির তারিখ মিলাইয়া গুছাইয়া দিতেছে। ট্রেনের মধ্যে ও কাজের ভিড়ে কয়েকদিনের কাগজ দেখিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। কন্যাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চোখ তুলিয়া কহিলেন, মা, আমরা দুটোর গাড়ীতেই কলকাতা যাব স্থির করলাম। দিদির বাড়ীতে দিন কতক যদি তোমার থাকবার ইচ্ছে হয় ত ফেরার পথে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আমি সোজা বোম্বাই চলে যাব। কি বল?

কলকাতায় তোমার ক'দিন দেরি হবে বাবা?

পাঁচ-সাত দিন—দিন আষ্টেক—তার বেশি নয়।

কিন্তু তার পরে আমাকে বোম্বায়ে নিয়ে যাবে কে?

সে ব্যবস্থা একটা অনায়াসে হতে পারবে। এই বলিয়া তিনি একটু ভাবিয়া কহিলেন, তা বেশ, ইচ্ছে হয় এই ক'টা দিন তুমি সতীর কাছে থাক, ফেরবার পথে আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাব, কেমন?

বন্দনা ক্ষণকাল চুপ করিয়া বলিল, আচ্ছা মেজদিকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

দ্বিজদাস কহিল, বৌদি রান্নাঘরে ঢুকেছেন, হয়ত দেরি হবে। [illegible] বাণ্ডিলটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কি দেব?

খবরের কাগজ? ও আমি পড়িনে।

কাগজ পড়েন না?

না। ও আমার ধৈর্য্য থাকে না। সন্ধ্যা বেলা বাবার মুখে গল্প শুনি, তাতেই আমার খিধে মিটে।

আশ্চর্য্য! আমি ভেবেছিলাম আপনি নিশ্চয়ই খুব বেশি পড়েন।

বন্দনা বলিল, আমার সম্বন্ধে কিছুই না জেনে অমন ভাবেন কেন? ভারি অন্যায়।

দ্বিজু অপ্রতিভ হইয়া উঠিতেছিল, বন্দনা হাসিয়া কহিল, আপনারা কে কতটা দেশোদ্ধার করলেন, এবং ইংরেজ তাতে রেগে গিয়ে কতখানি চোখ রাঙালে তার কিছুতেই আমার কৌতূহল নেই। আছে বাবার। ঐ দেখুন না, একেবারে খবরের তলায় তলিয়ে গেছেন—বাহ্যজ্ঞান নেই।

সাহেবের কানে বোধ করি শুধু মেয়ের 'বাবা' কথাটাই প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু চোখ তুলিবার সময় পাইলেন না, বলিলেন, একটু সবুর কর—বলচি—ঠিক এই জবাবটাই আমি খুঁজছিলাম।

মেয়ে মুচকিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কহিল, তুমি খুঁজে খুঁজে সারা দিন পড় বাবা, আমার একটুও তাড়াতাড়ি নেই। দ্বিজদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মেজদির মুখে শুনেচি, আপনার মস্ত লাইব্রেরি আছে, বরঞ্চ সেইখানে চলুন, দেখিগে আপনার কত বই জমেচে।

চলুন।

লাইব্রেরি ঘরটা তেতলায়। মস্ত চওড়া সিঁড়ি, উঠিতে উঠিতে দ্বিজদাস কহিল, লাইব্রেরি বেশ বড়ই বটে, কিন্তু আমার নয়, দাদার। আমি শুধু কোথায় কি বই বেরুলো সন্ধান নিই এবং হুকুম মত কিনে এনে দিই।

কিন্তু পড়েন ত আপনি?

সে কিছুই নয়। পড়েন যাঁর লাইব্রেরি তিনি স্বয়ং। আশ্চর্য্য শক্তি এবং তেমনি অদ্ভুত মেধা তাঁর।

কে? দাদা!

হ্যাঁ। ইউনিভারসিটির ছাপ-ছোপ বিশেষ কিছু তাঁর গায়ে লাগেনি সত্যি, কিন্তু মনে হয় এত বড় বিরাট পাণ্ডিত্য এদেশে কম লোকেরই আছে। হয়ত নেই। আপনার ভগিনীপতি তিনি, কখন দেখেননি তাঁকে?

না। [illegible]কম দেখতে?

ঠিক আ[illegible]উল্টো। যেমন দিন আর রাত। আমি কালো, তাঁর বর্ণ সোনার মত। গায়ের জোর তাঁর এ অঞ্চলে বিখ্যাত—লাঠি, তলোয়ার, বন্দুকে এদিকে তাঁর জোড়া নেই। একা মা ছাড়া তাঁর মুখের পানে চেয়ে কথা কইতেও কেউ সাহস করে না।

বন্দনা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার মেজদিও না?

দ্বিজদাস বলিল, না, আপনার মেজদিও না।

ভয়ানক বদ্‌রাগী বুঝি?

না, তাও না। ইংরেজীতে যে অ্যারিষ্টোক্র্যাট্ বলে একটা কথা আছে, আমার দাদা বোধ করি কোন জন্মে তাদেরই রাজা ছিলেন। অন্ততঃ আমার ধারণা তাই বদ্‌রাগী কি না জিজ্ঞাসা করছিলেন? কোনরকম রাগারাগি করবার তাঁর অবকাশ হয় না।

বন্দনা কহিল, দাদার ওপর আপনার ভয়ানক ভক্তি? না?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, এ কথার জবাব যদি কখনো সম্ভব হয় আপনাকে আর একদিন দেব।

বন্দনা সবিস্ময়ে কহিল, তার মানে?

দ্বিজদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, মানে যদি এখনই বলি আর একদিন জবাব দেবার প্রয়োজন হবে না। আজ থাক।

মস্ত লাইব্রেরী। যেমন মূল্যবান আলমারি টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আসবাব, তেমনি সুশৃঙ্খলায় পরিপাটি করিয়া সাজান। পল্লীগ্রামে এত বড় একটা বিরাট কাণ্ড দেখিয়া বন্দনা আশ্চর্য হইয়া গেল। বোম্বাই সহরে এ বস্তুর অভাব নাই, সে তুলনায় এ হয়ত তেমন কিছু নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে বাস করিয়া কোন একজনের নিছক নিজের জন্যে এত অধিক সঞ্চয় সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করিল, বাস্তবিক এত বই দাদা পড়েন না কি?

দ্বিজদাস বলিল, পড়েন এবং পড়চেন। আলমারি বন্ধ নয়, কোন একটা বই খুলে দেখুন না, তাঁর পড়ার চিহ্ন হয়ত চোখে পড়বে।

এত সময় পান কখন? দিন রাত শুধু এই-ই করেন না কি?

দ্বিজু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। অন্ততঃ আমি ত জানিনে। তা ছাড়া আমাদের বিষয় সম্পত্তি ভীষণ কিছু একটা না হলেও নিতান্ত কমও নয়। তাঁর কোথায় কি আছে এবং হচ্চে দাদার চোখের ওপর। কেবল আজ বলে নয়, বাবা বেঁচে থাকতেও এই ব্যবস্থাই বরাবর আছে। সময় পাবার রহস্য আমিও ঠিক খুঁজে পাইনে, আপনার মত আমার বিস্ময়ও কম নয়, তবে শুধু এই ভাবি যে জগতে মাঝে মাঝে দু-একজন জন্মায় তারা সাধারণ মানুষের হিসেবের বাইরে। দাদা সেই জাতীয় জীব। আমাদের মত হয়ত এঁদের কষ্ট করে পড়তেও হয় না, ছাপার অক্ষর

চোখের মধ্যে দিয়ে আপনিই গিয়ে মগজে ছাপ মেরে দেয়। কিন্তু দাদার কথা এখন থাক্। আপনি তাঁকে এখনো চোখে দেখেননি, আমার মুখে এক-তরফা আলোচনা অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে।

কিন্তু আমার শুনতে খুব ভালই লাগচে।

কিন্তু কেবল ভাল লাগাটাই ত সব নয়। পৃথিবীতে আমরাও অত্যন্ত সাধারণ আরও দশজন ত আছি। একটি মাত্র অসাধারণ ব্যক্তিই যদি সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে, আমরা যাই কোথা? ভগবান মুখটা ত কেবল পরের স্তব গাইতেই দেননি?

বন্দনা সহাস্যে কহিল, অর্থাৎ দাদাকে ছেড়ে এখন ছোটভাইয়ের একটু স্তব গাইতে চান—এই ত?

দ্বিজুও হাসিল, কহিল, চাই ত বটে, কিন্তু সুযোগ পাই কোথায়? যারা পরিচিত তারা কান দেবে না, অচেনার কাছেই একটু গুন্ গুন্ করা চলে। কিন্তু সাহস পাইনে, ভয় হয় অভ্যাসের অভাবে নিজের স্তব নিজের মুখে হয়ত বেধে যাবে।

বন্দনা বলিল, না যেতেও পারে, চেষ্টা করে দেখুন। আমার বিশ্বাস পুরুষেরা এ বিদ্যেয় আজন্মসিদ্ধ। আর দেরি করবেন না, আরম্ভ করুন।

দ্বিজু মাথা নাড়িয়া কহিল, না, পেরে উঠব না। তার চেয়ে বরঞ্চ নিরিবিলি বসে দু-চারখানা বই দেখুন, আমি বৌদিকে পাঠিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই বন্দনা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, বেশ ত আপনি! না, একলা ফেলে আমাকে যাবেন না। বই আমি অনেক পড়েচি, তার দরকার নেই। আপনি গল্প করুন আমি শুনি।

কিসের গল্প?

আপনার নিজের।

তা হলে একটু সবুর করুন, আমি এক্ষুণি নীচে গিয়ে ঢের ভাল বক্তা পাঠিয়ে দিচ্চি।

বন্দনা বলিল, পাঠাবেন মেজদিদিকে ত? তার দরকার নেই। তাঁর বলবার যা কিছু ছিল চিঠিতেই শেষ হয়ে গেছে। সেগুলো সত্যি কি না এখন তাই শুনতে চাই।

দ্বিজদাস বলিল, না, সত্যি নয়। অন্ততঃ বারো আনা মিথ্যে। আচ্ছা, আপনি নাকি শীঘ্রই বিলেত যাচ্চেন?

বন্দনা বুঝিল, এই লোকটি নিজের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে চায় না এবং জিদ করিবার মত ঘনিষ্ঠতা অশোভন হইবে। কহিল, বাবার ইচ্ছে তাই। স্কুলের বিদ্যেটা তিনি সেখানে গিয়েই শেষ করতে বলেন। আপনি কেন চলুন না?

দ্বিজদাস বলিল, আমার নিজের আপত্তি নেই, কিন্তু টাকা পাব কোথায়? সেখানে

ছেলে পড়িয়েও চলবে না, এবং এত ভার বৌদির ওপরেও চাপাতে পারব না। এ আশা বৃথা।

শুনিয়া বন্দনা হাসিল। কহিল, দ্বিজুবাবু, এ আপনার রাগের কথা। নইলে যে অর্থ আপনাদের আছে তাতে শুধু নিজে নয়, ইচ্ছে করলে এ গ্রামের অর্ধেক লোককে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। বেশ, সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্চি, আপনি যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ন।

দ্বিজু কহিল, সে ব্যবস্থা হবার নয়। টাকা প্রচুর আছে সত্যি, কিন্তু সে-সব দাদার, আমার নয়। আমি দয়ার ওপর আছি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বন্দনা পুনরায় হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, অত্যুক্তি যে কি এবং কোনটা, সে আমিও বুঝি। কিন্তু এও রাগের কথা। মেজদিদির চিঠিতে একবার শুনেছিলাম যে, যে-সম্পত্তি আপনি নিজে অর্জ্জন করেননি সে নিতে আপনি অনিচ্ছুক। এ কথা ঠিক নয়?

দ্বিজদাস বলিল, যদি ঠিকও হয়, সে মানুষের ধর্ম্ম-বুদ্ধির কথা, রাগের নয়। কিন্তু এ-ই সমস্ত কারণ নয়।

সমস্ত কারণটা কি শুনতে পাইনে?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি স্বভাবতঃ এত কৌতূহলী নই এবং আমার এই আগ্রহ যে সৃষ্টিছাড়া আতিশয্য সে বোধ আমারও আছে, কিন্তু বোধ থাকলেই সংসারের সব প্রয়োজন মেটে না—অভাব হাঁ করে চেয়ে থাকে! আপনার কথা আমি এত বেশি শুনেচি যে, আপনি প্রথম যখন ঘরে ঢুকলেন অপরিচিত বলে আপনাকে মনেই হ'ল না, যেন কতবার দেখেচি এমনি সহজে চিনতে পারলুম। মেজদিদিকে এত কথা বলতে পেরেচেন আর, আমাকে পারেন না? আর কিছু না হোক, তাঁর মত আমিও ত একজন আত্মীয়।

কথা শুনিয়া দ্বিজু অবাক্ হইয়া গেল। এবং অকস্মাৎ সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়িয়া তাহার সঙ্কোচ ও বিস্ময়ের অবাধ রহিল না। সম্পূর্ণ অচেনা বয়স্থা কন্যার সহিত নির্জ্জনে এইভাবে আলাপ করার ইতিহাস এই প্রথম, দেয়ালে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, এক ঘণ্টারও উপর কাটিয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে নীচে কেহ যদি তাহাদের খুঁজিয়া থাকে এ-বাটীতে তাহার জবাব যে কি সে ভাবিয়া পাইল না। হয়ত দাদা বাড়ী ফিরিয়াছেন, হয়ত মায়ের আহ্নিক সারা হইয়াছে, হঠাৎ সমস্ত দেহ মন তাহার ব্যাকুল হইয়া যেন এক মুহূর্ত্তে সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া গেল, কিন্তু কিছুই করিতে না পারিয়া তেম'ন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কই, বললেন না? বলুন?

দ্বিজুর চমক ভাঙিল। কহিল, যদি বলি, আপনাকেই প্রথম বলব। বৌদিদিকেও আজও বলিনি।

সে বোঝাপড়া তিনি করবেন। আমি কিন্তু না শুনে –

বলা যে উচিত নয় এ-সম্বন্ধে দ্বিজুর সংশয় ছিল না, কিন্তু অনুরোধ উপেক্ষা করারও তাহার শক্তি রহিল না।

হতবুদ্ধির মত মিনিট-খানেক চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বাবা আমাকে বস্তুতঃ কিছুই দিয়ে যাননি।

বন্দনা চমকিয়া উঠিল—ইস্! মিছে কথা। এ হতেই পারে না।

প্রত্যুত্তরে দ্বিজু মাথা নাড়িয়া শুধু জানাইল—পারে।

কিন্তু তার কারণ?

বাবার বোধ হয় ধারণা জন্মেছিল, আমাকে দিলে সম্পত্তি তাঁর নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ ধারণার কোন সত্যিকার হেতু ছিল?

ছিল। আমাকে বাঁচাবার জন্য একবার বহু টাকা নষ্ট হয়ে গেছে।

বন্দনার মনে পড়িল এই ধরণের একটা ইঙ্গিত একবার সতীর চিঠির মধ্যে ছিল। জিজ্ঞাসা করিল, বাবা উইল করে গেছেন?

দ্বিজদাস কহিল, এ শুধু দাদাই জানেন। তিনি বলেন, না।

বন্দনা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে রক্ষে। আমি ভাবচি বুঝি তিনি সত্যিই উইল করে আপনাকে বঞ্চিত করে গেছে।

দ্বিজদাস কহিল, তাঁর নিজের ইচ্ছের অভাব ছিল না, কিন্তু মনে হয় দাদা করতে দেননি।

দাদা করতে দেননি? আশ্চর্য্য!

দ্বিজু হাসিয়া বলিল, দাদাকে জানলে আর আশ্চয্য মনে হবে না। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ঘরে তখনো চাকর আলো দিয়ে যায়নি, আমি পাশের ঘরে একটা বই খুঁজছিলাম, হঠাৎ বাবার কথা কানে গেল! দাদা বললেন, না। বাবা জিদ করতে লাগলেন, না কেন বিপ্রদাস? আমার পিতা-পিতামহকালের সম্পত্তি আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না। পরলোকে থেকেও আমি শান্তি পাব না। তবুও দাদা জবাব দিলেন, না, সে কোনমতেই হতে পারে না। বাবা বললেন, তবুও তোমারি হাতে আমি সমস্ত রেখে গেলাম। যদি ভাল মনে কর দিয়ো, যদি তা না মনে করতে

পার, তাকে দিয়ো, না। এর পরেও বাবা দু-তিন বছর ছিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তিনি তাঁর মত পরিবর্ত্তন করেননি।

বন্দনা মৃদু-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ কথা আর কেউ জানে?

কেউ না, শুধু আমি জানি, লুকিয়ে শুনেছিলাম বসে।

বন্দনা বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অস্ফুটে কহিল, সত্যই আপনার দাদা অসাধারণ মানুষ!

দ্বিজদাস শান্তভাবে শুধু বলিল, হাঁ। কিন্তু এখন আমি নীচে যাই, আমার অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। আপনি বসে বসে বই পড়ুন যতক্ষণ না ডাক পড়ে।

বন্দনা হাসিয়া কহিল, এখন বই পড়বার রুচি নেই, চলুন আমিও যাই। অন্ততঃ আট-দশদিন ত এখানে আছি, বই পড়বার অনেক সময় পাব।

দ্বিজদাস চলিতে উদ্যত হইয়াছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাবার সঙ্গে আজ কলকাতা যাবেন না?

না। তাঁর ফেরবার পথে বোম্বায়ে চলে যাব।

দ্বিজদাস কহিল, বরঞ্চ আমি বলি তাঁর ফেরবার পথেই আপনি কিছুদিন এখানে থেকে যাবেন।

বন্দনা কহিল, প্রথমে সেই ইচ্ছেই ছিল, কিন্তু এখন দেখচি তাতে ঢের অসুবিধে। আমাকে পৌঁছে দেবার কেউ নেই। কিন্তু আপনি যদি রাজি হন, আপনার পরামর্শই শুনি।

কিন্তু আমি ত তখন থাকব না। এই সোমবার মাকে নিয়ে কৈলাস তীর্থে যাত্রা করব।

বন্দনার দুই চক্ষু আনন্দে ও উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কৈলাস? কৈলাসে যাবেন? শুনেচি সে নাকি এক পরমাশ্চর্য্য বস্তু। সঙ্গে আপনাদের আর কে কে যাবেন?

ঠিক জানিনে, বোধ হয় আরও কেউ কেউ যাবেন।

আমাকে সঙ্গে নেবেন?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা ক্ষুণ্ণ অভিমানের কণ্ঠে জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আর এই জন্যেই বুঝি ঠিক সেই সময়ে আমাকে এখানে এসে থাকবার সুপরামর্শ দিচ্ছেন?

দ্বিজদাস তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া শান্তভাবে কহিল, সত্যিই এই জন্যে পরামর্শ দিয়েচি। বৌদি এত কথা লিখেচেন, কেবল এই খবরটি দেননি যে আমাদের

এটা কত বড় গোঁড়া হিন্দুর বাড়ি? এর আচার-বিচারের ছোঁয়াছুঁয়িতার কোন আভাস চিঠিতে পাননি?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

না? আশ্চর্য্য! একটুখানি থামিয়া দ্বিজদাস বলিল, একা আমি ছাড়া আপনার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাবার লোক এ-বাড়িতে কেউ নেই।

কিন্তু দাদা?

না।

মেজদি?

না, তিনিও না। আমরা চলে গেলে তবুও হয়ত দুদিন এখানে থাকতে পারেন, কিন্তু মা থাকতে একটা দিনও আপনার এ-বাড়িতে থাকা চলে না।

বন্দনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল—সত্যি বলচেন?

সত্যিই বলচি।

ঠিক এমনি সময়ে নীচের সিঁড়ি হইতে সতীর ডাক শোনা গেল, ঠাকুরপো! বন্দনা! তোমরা দুটিতে করচ কি?

যাচ্চি বৌদি, সাড়া দিয়া দ্বিজদাস দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, বন্দনা পাংশু-মুখে চাপা-কণ্ঠে শুধু কহিল, এত কথা আমি কিছুই জানতুম না। ধন্যবাদ।

৬

বন্দনা নীচে আসিয়া দেখিল পিতা হৃষ্টচিত্তে আহারে বসিয়াছেন। সেই বসিবার ঘরের মধ্যেই একখানি ছোট টেবিলের উপর রূপার থালায় করিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে। একজন দীর্ঘাকৃতি অতিশয় সুশ্রী ব্যক্তি অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দেহের শক্তিমান গঠন ও অত্যন্ত ফর্সা রং দেখিয়াই বন্দনা চিনিল যে ইনিই বিপ্রদাস। সতী সঙ্গেই আসিতেছিল, কিন্তু সে প্রবেশ করিল না, দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতে ইঙ্গিত করিয়া জানাইল যে, হাঁ ইনিই।

বাঙালীর মেয়েকে ইহা শিখাইবার কথা নহে এবং ইতিপূর্ব্বে মাকে যেমন সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল বড় ভগিনীপতিকে তাহাই করিত কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন তাহার সমস্ত মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। ইহার অনন্যসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধির বিবরণ দ্বিজদাসের মুখে না শুনিলে হয়ত এই প্রচলিত শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিবার কথা, তাহার মনেও উঠিত না, কিন্তু এই পরিচয়ই তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিল। দিদির

মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সে হাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিল বটে, কিন্তু তাহার উপেক্ষাটাই তাহাতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, কথা কহিল সে পিতার সঙ্গেই, বলিল, তুমি একলা খেতে বসেচ, আমাকে ডেকে পাঠাওনি কেন?

সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, আমার যে গাড়ীর সময় হ'লো মা, কিন্তু তোমার ত তাড়াতাড়ি নেই। আমি চলে গেলে তোমরা ধীরে-সুস্থে খাওয়া দাওয়া করতে পারবে।

সতী আড়াল হইতে ঘাড় নাড়িয়া ইহার অনুমোদন করিল। বন্দনা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, মেজদি অতগুলি দামী রূপোর বাসন নষ্ট করলে কেন, বাবাকে এনামেল কিংবা চিনেমাটির বাসনে খেতে দিলেই ত হত?

সাহেবের চিবান বন্ধ হইল। অত্যন্ত সরল-প্রকৃতির মানুষ তিনি, কন্যার কথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিলেন না, ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিলেন -যেন দোষটা তাঁহার নিজেরই—তাই ত, তাই ত—এ আমি লক্ষ্য করিনি—সতী কোথা গেল--আমাকে ডিসে খেতে দিলেই হত—এঃ—

বিপ্রদাসের মুখ ক্রোধে কঠোর ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এতাবৎ এত বড় অপমান করিতে তাহাকে কেহ সাহস করে নাই, এই নবাগত কুটুম্ব মেয়েটি তাহাকে যেমন করিল! বাসন নষ্ট হইবার দুশ্চিন্তা একটা ছলনা মাত্র। আসলে ইহা তাহাদের আচারনিষ্ঠ পরিবারের প্রতি নির্লজ্জ ব্যঙ্গ, এবং খুব সম্ভব তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া। এ দুরভিসন্ধি কে তাহার মাথায় আনিয়া দিল বিপ্রদাস ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু যেই দিক, ভাল মানুষ ব্যক্তিটিকে উপলক্ষ সৃষ্ট করার কদর্য্যতায় তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না। কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমার দিদির কাছে শোনোনি যে, এ গোঁড়া হিন্দুর বাড়ী? এখানে এনামেল বল, চিনে-মাটিই বল কিছুই ঢোকবার যো নেই—শোনোনি?

বন্দনা কহিল, কিন্তু দামী পাত্রগুলো ত নষ্ট হয়ে গেল?

সাহেব ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু শুনেছি ঘি মাখিয়ে একটুখানি পুড়িয়ে নিলেই—

বিপ্রদাস এ কথায় কান দিল না, যেমন বলিতেছিল তেমনি বন্দনাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিল, এ-বাড়ীতে রূপোর বাসনের অভাব নেই, কিন্তু কোন কাজে লাগে না। তোমার বাবা সম্বন্ধে আমার গুরুজন, এ-বাড়ীতে অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি, রূপোর বাসনের যতই দাম হোক, তাঁর মর্য্যাদার কাছে একেবারেই তুচ্ছ; তোমাদের আসার উপলক্ষে কতকগুলো যদি নষ্ট হয়েই যায়—যাক না। এই বলিয়া একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার দিদির মত তোমারও যদি কোন গোঁড়াদের বাড়ীতে

বিয়ে হয়, তোমার বাবা এলে তাঁকে মাটির সরাতে খেতে দিয়ো, ফেলা গেলে কারও গায়ে লাগবে না। কি বল বন্দনা?

ইস্, তাই বই কি! বাবার জন্যে আমি সোনার পাত্র গড়িয়ে দেব।

বিপ্রদাস হাসিমুখে উত্তর দিল, সে তুমি পারবে না। যে পারে সে বাপের সম্বন্ধে অমন কথা মুখে আনতেও পারে না। এমন কি অপরকে অপমান করার জন্যেও না। তোমার বাবাকে তুমি যত ভালবাস আর একজন তার কাকাকে বোধ করি তার চেয়ে বেশি ভালবাসে।

শুনিয়া সাহেবের মনের উপর হইতে যে একটা ভার নামিয়া গেল তাই নয়, সমস্ত অন্তর খুশীতে ভরিয়া গেল। বলিলেন, তোমার এই কথাটা বাবা ভারি সত্যি। দাদা যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন সতী খুবই ছোট, বিদেশে চাকুরি নিয়ে থাকি, সর্ব্বদা বাড়ী আসা ঘটে না, আর এলেও সমাজের শাসনে একলাটি থাকতে হয়, কিন্তু সতী ফাঁক পেলেই আমার কাছে ছুটে আসত—

বন্দনা তাড়াতাড়ি বাধা দিল—ওসব থাক্ না বাবা—

না, না, আমার যে সমস্তই মনে আছে, মিথ্যে ত নয়। একদিন আমার সঙ্গে একপাতে খেতেই বসে গেল—তার মা ত এই দেখে—

আঃ বাবা, তুমি যে কি বল তার ঠিকানা নেই। কবে আবার মেজদি তোমার সঙ্গে —তোমার কিছু মনে নেই।

সাহেব মুখ তুলিয়া প্রতিবাদ করিলেন—বাঃ মনে আছে বই কি। আর পাছে এই নিয়ে একটা গোলমাল হয়, তাই তোমার মা সেদিন কি রকম ভয়ে ভয়ে—

বন্দনা বলিল, বাবা, আজ তুমি নিশ্চয় গাড়ী ফেল করবে। ক'টা বেজেচে জান?

সাহেব ব্যস্ত হইয়া পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিলেন, সময় দেখিয়া নিরুদ্বেগের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুই এমন ভয় লাগিয়ে দিস্ যে চমকে উঠতে হয়। এখনো ঢের দেরী—অনায়াসে গাড়ী ধরা যাবে।

বিপ্রদাস সহাস্যে সায় দিয়া বলিল, হাঁ গাড়ীর এখনো ঢের দেরী। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আহার করুন, আমি নিজে ষ্টেশনে গিয়ে আপনাকে তুলে দিয়ে আসব। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বারের আড়াল হইতে সতী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে বন্দনা অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি, বাবা কি কাণ্ড করলেন শুনেচ?

সতী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

বন্দনা বলিল, তোমার শাশুড়ীর কানে গেলে হয়ত তোমাকে দুঃখ পেতে হবে। না মেজদি?

সতী কহিল, হয় হবে। এখন থাক্, কাকা শুনতে পাবেন।

কিন্তু তোমার স্বামী—তিনিও যে নিজের কানেই সমস্ত শুনে গেলেন, এ অপরাধের মার্জ্জনা বোধ করি তাঁর কাছেও নেই?

সতী হাসিল, কহিল, অপরাধ যদি সত্যিই হয়ে থাকে আমিই বা মার্জ্জনা চাইব কেন? সে বিচার আমি তাঁর 'পরেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চন্ত হয়ে আছি। যদি থাক, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। কাকা, তোমাকে আর কি এনে দেব বল?

সাহেব মুখ তুলিয়া কহিলেন, যথেষ্ট যথেষ্ট—আমার খাওয়া হয়ে গেছে মা, আর কিছুই চাইনে। এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্রমশঃ ষ্টেশনে যাত্রা করিবার সময় হইয়া আসিল; নীচে গাড়ী-বারান্দায় মোটর অপেক্ষা করিতেছে, বিছানা ব্যাগ প্রভৃতি আর একখানা গাড়ীতে চালান হইয়াছে, সাহেব নিকটে দাঁড়াইয়া বিপ্রদাসের সহিত কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে বন্দনা কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

পিতা বিস্মিত হইলেন—এই রোদে ষ্টেশনে গিয়ে লাভ কি মা?

বন্দনা বলিল, শুধু ষ্টেশনে নয়, কলকাতায় যাব। যখন বোম্বায়ে যাবে, আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব।

বিপ্রদাস অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, সে কি কথা! তুমি দিনকয়েক থাকবে বলেই ত জানি।

বন্দনা উত্তরে শুধু কহিল, না।

কিন্তু তোমার ত এখনো খাওয়া হয়নি?

না, দরকার নেই। কলকাতায় পৌঁছে খাব।

তুমি চলে যাচ্ছ তোমার মেজদি শুনেচেন?

বন্দনা কহিল, ঠিক জানিনে, আমি চলে গেলেই শুনতে পাবেন।

বিপ্রদাস বলিলেন, তুমি না খেয়ে অমন করে চলে গেলে সে ভারি কষ্ট পাবে।

বন্দনা মুখ তুলিয়া বলিল, কষ্ট কিসের? আমাকে ত তিনি নেমন্তন্ন করে আনেননি যে না খেয়ে চলে গেলে তাঁর আয়োজন নষ্ট হবে। তিনি নির্ব্বোধ নয়, বুঝবেন। এই বলিয়া সে আর কথা না বাড়াইয়া দ্রুতপদে গাড়ীতে গিয়া বসিল।

সাহেব মনে মনে বুঝিলেন কি একটা হইয়াছে। না হইলে হঠাৎ অকারণে কোন-কিছু করিয়া ফেলিবার মেয়ে সে নয়। শুধু বলিলেন, আমিও জানতাম ও

দিন কয়েক সতীর কাছেই থাকবে। কিন্তু একবার যখন গাড়ীতে গিয়ে উঠেচে তখন আর নামবে না।

বিপ্রদাস জবাব দিলেন না, নিঃশব্দে তাঁহার পিছনে পিছনে গিয়া মোটরে উঠিলেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অকস্মাৎ উপরের দিকে চাহিতেই বন্দনা দেখিতে পাইল তেতলার লাইব্রেরী-ঘরের জানালার গরাদ ধরিয়া দ্বিজদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখা-চোখি হইতেই সে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

৭

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া খবর পাওয়া গেল, কোথায় কি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় জন্য ট্রেনের আজ বহু বিলম্ব; বোধ করি বা এক ঘণ্টারও বেশি লেট হইবে। পরিচিত ষ্টেশনমাষ্টারটিও হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় একজন মাদ্রাজী রিলিভিং হাণ্ড কাল হইতে কাজ করিতেছিল, সে সঠিক সংবাদ কিছু দিতে পারিল না, শুধু অনুমান করিল যে, দেরি এক ঘণ্টাও হইতে পারে, দুঘণ্টাও হইতে পারে। বিপ্রদাস সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কলকাতায় পৌঁছতে রাত্রি হয়ে যাবে, আজ কি না গেলেই চলে না?

কেন চলবে না? আমার ত—

বন্দনা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না বাবা, সে হয় না; একবার বেরিয়ে এসে আর ফিরে যাওয়া চলে না।

বিপ্রদাস অনুনয়ের সুরে কহিল, কেন চলবে না বন্দনা? বিশেষতঃ তুমি না খেয়ে এসেচ, সারাদিন কি উপোস করেই কাটাবে?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার ক্ষিদে নেই। ফিরে গেলেও আমি খেতে পারব না।

সাহেব মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন, কহিলেন, এদের শিক্ষা-দীক্ষাই আলাদা। একবার জিদ ধরলে আর টলান যায় না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল, আর অনুরোধ করিল না।

ষ্টেশনটি বড় না হইলেও একটি ছোট গোছের ওয়েটিং রুম ছিল; সেখানে গিয়া দেখা গেল, একজন ছোকরা বয়সের বাঙালী-সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী ঘরখানি পূর্ব্বেই দখলে আনিয়াছেন। সাহেব সম্ভবতঃ ব্যারিষ্টার কিংবা ডাক্তার কিংবা বিলাতী পাশ-করা প্রফেসারও হইতে পারেন। এ অঞ্চলে কোথায় আসিয়াছিলেন, সে একটা রহস্য। আরাম-কেদারায় দুই হাতলে পদদ্বয় দীর্ঘপ্রসারিত করিয়া অর্দ্ধ সুপ্ত।

আকস্মিক জনসমাগমে মাত্র চক্ষুরুন্মীলন করিলেন—ভদ্রতা-প্রকাশের উদ্যম ইহার অধিক অগ্রসর হইল না। কিন্তু মহিলাটি চেয়ার ছাড়িয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হয়ত মেমসাহেব হইয়া উঠিতে তখনও পারেন নাই, কিন্তু উঁচু গোড়ালির জুতা ও পোষাক-পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া মনে হয়, এ-বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না।

ঘরের মধ্যে আর একখানা আরাম-চৌকি ছিল, বন্দনা পিতাকে তাহাতে বসাইয়া দিয়া নিজে একখানি বেঞ্চি অধিকার করিয়া বসিল এবং অত্যন্ত সমাদরে বিপ্রদাসকে আহ্বান করিয়া বলিল, জামাইবাবু, মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন, আমার কাছে এসে বসুন। বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই, আপনার জাত যাবে না।

শুনিয়া বন্দনার পিতা অল্প একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, বিপ্রদাসের ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাচ-বিচার কি খুব বেশি না কি।

বিপ্রদাস নিজেও হাসিল, বলিল, বাচ-বিচার আছে, কিন্তু কি হলে খুব বেশি হয়, না জানলে এ-প্রশ্নের জবাব দিই কি করে?

বৃদ্ধ কহিলেন, এই ধর বন্দনা যা বললে?

বিপ্রদাস কহিল, উনি না খেয়ে ভয়ানক রেগে আছেন। মেয়েরা রাগের মাথায় যা বলে তা নিয়ে আলোচনা হয় না।

বন্দনা বলিল, আমি রেগে নেই—একটুও রেগে নেই।

বিপ্রদাস কহিল, আছ, এবং খুব বেশি রকমই রেগে আছ, নইলে আজ তুমি কলকাতায় না গিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে। তা ছাড়া তোমার আপনিই মনে পড়ত যে, এইমাত্র আমরা এক গাড়ীতেই এলাম, জাত গিয়ে থাকলে আগেই গেছে, বেঞ্চিতে বসার কথাটা শুধু তোমার ছল মাত্র।

বন্দনা বলিল, হোক ছল, কিন্তু সত্যি কথা বলুন ত মুখুয্যেমশাই, আমাদের ছোঁয়াছুঁয়ি করার জন্যে ফিরে গিয়ে আপনাকে আবার স্নান করতে হবে কি না?

চল না, বাড়ী গিয়ে নিজের চোখে দেখবে?

না। জানেন আপনি, মাকে প্রণাম করতে গেলে তিনি ছোঁবার ভয়ে দূরে সরে গিয়েছিলেন? বলিতে বলিতে তাহার মুখ ক্রোধে ও লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস ইহা লক্ষ্য করিল। উত্তরে শুধু শান্তভাবে বলিল, কথাটা মিথ্যে না, অথচ সত্যিও নয়। এর আসল কারণ তাঁর কাছে না থাকলে তুমি বুঝতে পারবে না। কিন্তু সে সম্ভাবনা ত নেই।

না, নেই।

এই তীব্র অস্বীকারের হেতু এতক্ষণে বিপ্রদাসের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনে

মনে তাহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। ক্ষোভ নানা কারণে। বিমাতার সম্বন্ধে কথাটা আংশিক সত্য মাত্র এবং সে নিজেও যেন ইহাতে কতকটা জড়াইয়া গিয়াছে। অথচ বুঝাইয়া বলিবার সুযোগও নাই, সময়ও নাই। অন্যপক্ষে ধীর-চিত্তে বুঝিবার মত মনোবৃত্তির একান্ত অভাব। সুতরাং চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় ছিল না—বিপ্রদাস একেবারেই নীরব হইয়া রহিল।

ছোকরা সাহেব পা নীচে নামাইয়া হাই তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জমিদার বিপ্রদাসবাবু না?

হাঁ।

আপনার নাম শুনেচি। পাশের গাঁয়ে আমার স্ত্রীর মামার বাড়ী, বেঙ্গলে যখন আসা-ই হল তখন ওর ইচ্ছে একবার দেখা করে যান। তাই আসা। আমি পাঞ্জাবে প্র্যাকটিস করি।

বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল লোকটি তাহারই সমবয়সী—এক-আধ বছরের এদিক-হইতে পারে, তার বেশি নয়।

সাহেব কহিতে লাগিলেন, কালই আপনার কথা হচ্ছিল। লোকে বলে আপনি ভয়ানক, অর্থাৎ কিনা খুব কড়া জমিদার। অবশ্য দু-চারজন বামুন পণ্ডিত গোঁড়া হিন্দু বলে বেশ তারিফও করলে। এখন দেখচি কথাটা মিথ্যে নয়।

অপরিচিতের এই অযাচিত আলোচনায় বন্দনা ও তাহার পিতা উভয়েই আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু বিপ্রদাস কোন উত্তর দিল না। বোধ হয় সে এমনি অন্যমনস্ক ছিল যে সকল কথা তাহার কানে যায় নাই।

তিনি পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, আমার লেক্‌চারে আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, চাই রিয়েল সলিড্ শিক্ষা—ফাঁকিবাজী, ধাপ্পাবাজি নয়। আপনার উচিত একবার ইয়োরোপ ঘুরে আসা। সেখানকার আবহাওয়া, সেখানকার ফ্রি এয়ার ব্রিদ ক'রে না এলে মনের মধ্যে freedom আসে না—কুসংস্কার মন থেকে মুক্ত হতে চায় না। আমি একাধিক্রমে পাঁচ বৎসর সে-দেশে ছিলাম।

বন্দনার পিতা শেষ কথাটায় খুশী হইয়া কহিলেন, একথা সত্যি।

উৎসাহ পাইয়া তিনি গরম হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, এই ডিমোক্র্যাসির যুগে সবাই সমান, কেউ কারো ছোট নয়, এবং চাই প্রত্যেকেরই নিজের অধিকার জোর করে assert করা—consequence তার যা-ই কেন না হোক আমার টাকা থাকলে আপনার জমিদারীর প্রত্যেক প্রজাকে আমি নিজের খরচে ইয়োরোপ ঘুরিয়ে আনতাম। নিজের right কাকে বলে এ-কথা তারা তখন নিজেরাই বুঝত।

বন্দনার বোধ করি ভারি খারাপ লাগিল, সে আস্তে আস্তে কহিল, জামাইবাবু ..র প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন এ-খবর আপনাকে কে দিলে? আশা করি আপনার মামাশ্বশুরের ওপর কোন জুলুম হয়নি?

ও--উনি আপনার ভগিনীপতি? Thanks—না তিনি কোন অভিযোগ করেননি। নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া সহাস্যে কহিলেন, তোমার বোনেরা যদি এই রকম হত!—আপনি বোধ করি বিলেত ঘুরে এসেচেন? যাননি? যান, যান। Freedom, সাহস, শক্তি কাকে বলে, সে দেশের মেয়েরা সত্যি কি একবার স্বচক্ষে দেখে আসুন। আমি next timeযাবার সময় ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব স্থির করেচি।

কেহ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই ষ্টেশনের সেই ঝিলিঙ্গি হাওটি মুখ বাড়াইয়া জানাইল যে ট্রেন distance signal পার হইয়াছে, আসিয়া পড়িল বলিয়া।

সকলে ব্যস্ত হইয়া প্লাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গাড়ী দাঁড়াইলে দেখা গেল ছুটির বাজারে যাত্রী-সংখ্যার সীমা নাই। তিল-ধারণের জায়গা পাওয়া কঠিন। মাত্র একখানি ফার্ষ্ট ক্লাস আর একখানি সেকেণ্ড ক্লাস। সেকেণ্ড ক্লাস ভর্ত্তি করিয়া এক দল ফিরিঙ্গী রেলওয়ে-সারভ্যাণ্ট কলিকাতায় কি একটা খেলার উপলক্ষে চলিয়াছে, এবং বোধ হয় তাহাদেরই কয়েকজন স্থানা-ভাবে ফার্ষ্ট ক্লাসে চড়িয়া বসিয়াছে। অপর্য্যাপ্ত মদ ও বিয়ার খাইয়া লোকগুলার চেহারাও যেমন ভয়ঙ্কর, ব্যবহারও তেমনি বে-পরোয়া। গাড়ীর দরজা আটকাইয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—go—যাও—যাও!

ষ্টেশন মাষ্টার আসিল, গার্ডসাহেব আসিল, তাহারা গ্রাহ্যই করিল না।

ছোকরা সাহেব কহিল, উপায়?

বন্দনা ভয়ে ভয়ে কহিল, চলুন আজ বাড়ী ফিরে যাই।

বিপ্রদাস বলিল, না।

না ত কি? না হয় রাত্রির ট্রেনে—

ছোকরা সাহেব বলিলেন, সে ছাড়া আর উপায় কি? কষ্ট হবে, তা হোক।

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। গাড়ীতে চার-পাঁচজন আছে, আর চার-পাঁচজনের জায়গা হওয়া চাই।

বন্দনার পিতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, চাই ত জানি, কিন্তু ওরা সব মাতাল যে!

বিপ্রদাসের সমস্ত দেহ যেন কঠিন লোহার মত ঋজু হইয়া উঠিল, কহিল, সে ওদের সখ—আমাদের নয়। উঠুন, আমি সঙ্গে যাব। এবং পরক্ষণেই গাড়ীর হাতল ধরিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। বন্দনার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া

কহিল, এসো। ছোকরা সাহেবকে ডাকিয়া কহিল, right assert করবেন ত স্ত্রী নিয়ে উঠে পড়ুন। অত্যাচারী জমিদার সঙ্গে থাকতে ভয় নেই।

মাতাল সাহেবগুলো এই লোকটির মুখের পানে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে গিয়া ও-দিকের বেঞ্চে বসিয়া পড়িল।

৮

গণ্ডগোল শুনিয়া পাশের কামরার সহযাত্রী সাহেবরা প্ল্যাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইল, এবং রুক্ষ-কণ্ঠে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, what's up? ভাবটা এই যে সঙ্গীদের হইয়া তাহারা বিক্রম দেখাইতে প্রস্তুত।

বিপ্রদাস অদূরবর্ত্তী গার্ডকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া কহিল, এই লোকগুলা খুব সম্ভব ফার্ষ্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার নয়. তোমার ডিউটি এদের সরিয়ে দেওয়া।

সে বেচারাও সাহেব, কিন্তু অত্যন্ত কাল-সাহেব। সুতরাং ডিউটি যাই হোক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অনেকেই তামাসা দেখিতেছিল, সেই মাদ্রাজী রিলিভিং হ্যাওটিও দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে হাত নাড়িয়া নিকটে ডাকিয়া বিপ্রদাস পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়া কহিল, আমার নাম আমার চাকরদের কাছে পাবে। তোমার কর্ত্তাদের কাছে একটা তার করে দাও যে এই মাতাল ফিরিঙ্গীর দল জোর করে ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠেচে, নামতে চায় না। আর এ খবরটাও তাদের জানিয়ো যে গাড়ীর গার্ড দাঁড়িয়ে মজা দেখলে, কিন্তু কোন সাহায্য করলে না।

গার্ড নিজের বিপদ বুঝিল। সাহসে ভর করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, Don't you see they are big people? তোমরা রেলওয়ে সারভ্যাণ্ট, রেলের পাশে যাচ্ছ—be careful!

কথাটা মাতালের পক্ষেও উপেক্ষণীয় নয়। অতএব তাহারা নামিয়া পাশের কামরায় গেল, কিন্তু ঠিক অহিংস মেজাজে গেল না। চাপা গলায় যাহা বলিয়া গেল তাহাতে মন বেশ নিশ্চিন্ত হয় না। সে যা হোক, পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টারসাহেব গার্ডকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, আপনি না থাকলে আজ হয়ত আমাদের যাওয়াই ঘটত না।

ও—নো। এ আমার ডিউটি।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। বিপ্রদাস নামিবার উপক্রম করিয়া কহিল, আর বোধ হয় আমার সঙ্গে যাবার প্রয়োজন নেই। ওরা আর কিছু করবে না।

ব্যারিষ্টার বলিলেন, সাহস করবে না। চাকরির ভয় আছে ত?

বন্দনা দরজা আগলাইয়া কহিল, না, সে হবে না। চাকরির ভয়টাই চরম gurantee নয়—সঙ্গে আপনাকে যেতেই হবে।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, পুরুষ হলে বুঝতে এর চেয়ে বড় gurantee সংসারে নেই। কিন্তু আমি যে কিছুই খেয়ে আসিনি।

খেয়ে আমিও ত আসিনি।

সে তোমার সখ। কিন্তু একটু পরেই আসবে হোটেল-ওয়ালা বড় ষ্টেশন, সেখানে ইচ্ছে হলেই খেতে পারবে।

বন্দনা কহিল, কিন্তু সে ইচ্ছে হবে না। উপোস করতে আমিও পারি।

বিপ্রদাস বলিল, পেরে কোন পক্ষেরই লাভ নেই—আমি নেবে যাই। ব্যারিষ্টারসাহেবকে কহিল, আপনি সঙ্গে রইলেন একটু দেখবেন। যদি আবশ্যক হয় ত—

বন্দনা কহিল, চেন টেনে গাড়ী থামাবেন? সে আমিও পারব। এই বলিয়া সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাড়ীর চাকরদের বলিয়া দিল, তোমরা মাকে গিয়ে ব'লো যে উনি সঙ্গে গেলেন। কাল কিংবা পরশু ফিরবেন।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

বন্দনা কাছে আসিয়া বসিল, কহিল, আচ্ছা মুখুয্যেমশাই, আপনি ত একগুঁয়ে কম নন।

কেন?

আপনি যে জোর করে আমাদের গাড়ীতে তুললেন, কিন্তু ওরা-ত ছিল মাতাল, যদি নেমে গিয়ে একটা মারামারি বাধিয়ে দিত?

বিপ্রদাস কহিল, তা হলে ওদের চাকরি যেত।

বন্দনা বলিল, কিন্তু আমাদের কি যেত? দেহের অস্থি-পঞ্জর। সেটা চাকরির চেয়ে তুচ্ছ বস্তু নয়।

বিপ্রদাস ও বন্দনা উভয়েই হাসিতে লাগিল, অন্য মহিলাটিও হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ঘাড় ফিরাইল, শুধু তাঁহার স্বামী পাঞ্জাবের নবীন ব্যারিষ্টার মুখ গম্ভীর করিয়া রহিলেন।

বন্দনার পিতা এতক্ষণ বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, আলোচনার শেষের দিকটা কানে যাইতেই, সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, না না, তামাসার কথা নয়, এ ব্যাপার ট্রেনে প্রায়ই ঘটে খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া যায়। তাই ত জোর-জবরদস্তির আমার ইচ্ছেই ছিল না, রাত্রের ট্রেনে গেলেই সব দিকে সুবিধে হ'ত।

বন্দনা কহিল, রাত্রের ট্রেনেও যদি মাতাল সাহেব থাকত বাবা?

পিতা কহিলেন, তা কি আর সত্যিই হয় রে? তা হলে ত ভদ্রলোকের যাতায়াতই বন্ধ করতে হয়। এই বলিয়া তিনি একটা মোটা চুরুট ধরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বন্দনা আস্তে আস্তে বলিল, মুখুয্যেমশাই, ভদ্রলোকের সংজ্ঞা নিয়ে যেন বাবাকে জেরা করবেন না।

বিপ্রদাস হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। সে আমি বুঝে'চ।

আচ্ছা মুখুয্যেমশাই, ছেলে বেলা গড়ের মাঠে সাহেবদের সঙ্গে কখনো মারামারি করেচেন? সত্যি বলবেন।

না, সে সৌভাগ্য এখনো ঘটেনি।

বন্দনা কহিল, লোকে বলে, দেশের লোকের কাছে আপনি একটা terror। শুনি, বাড়ীর সবাই আপনাকে বাঘের মত ভয় করে। সত্যি?

কিন্তু শুনলে কার কাছে?

বন্দনা গলা খাট করিয়া বলিল, মেজদির কাছে।

কি বলেন তিনি?

বলেন, ভয়ে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

কি রকম জল! মাতাল সাহেব দেখলে আমাদের যেমন হয়, তেমনি?

বন্দনা সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, অনেকটা ঐ রকম।

বিপ্রদাস কহিল, ওটা দরকার। নইলে মেয়েদের শাসনে রাখা যায় না। তোমার বিয়ে হলে বিদ্যেটা ভায়াকে শিখিয়ে দিয়ে আসব।

বন্দনা কহিল, দেবেন। কিন্তু সব বিদ্যে সকলের বেলায় খাটে না এও জানবেন। মেজদি বরাবরই ভালমানুষ, কিন্তু আমি হলে আমাকেই সকলের ভয় করে চলতে হ'ত।

বিপ্রদাস বলিল, অর্থাৎ ভয়ে বাড়ী-সুদ্ধ লোকের গায়ের রক্ত জল হয়ে যেত। খুব আশ্চর্য্য নয়। কারণ একটা বেলার মধ্যেই নমুনা যা দেখিয়ে এসেচ তাতে বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হয়। অন্ততঃ মা সহজে ভুলতে পারবেন না।

বন্দনা মনে মনে একটুখানি উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার মা কি করেচেন, জানেন? আমি প্রণাম করতে গেনুম, তিনি পিছিয়ে সরে গেলেন।

বিপ্রদাস কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কহিল, আমার মায়ের ঐটুকুমাত্রই দেখে এলে, আর কিছু দেখবার সুযোগ পেলে না। পেলে বুঝতে এই নিয়ে রাগ করে না-খেয়ে আসার মত ভুল কিছু নেই।

বন্দনা বলিল, মানুষের আত্ম-সম্ভ্রম বলে ত একটা জিনিষ আছে।

বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল, আত্মসম্ভ্রমের ধারণা পেলে কোথা থেকে? ইস্কুল-কলেজের মোটা মোটা বই পড়ে ত? কিন্তু মা ত ইংরাজি জানেন না, বইও পড়েননি। তাঁর জানার সঙ্গে তোমার ধারণা মিলবে কি করে?

বন্দনা বলিল, কিন্তু আমি শুধু নিজের ধারণা নিয়েই চলতে পারি।

বিপ্রদাস কহিল, পারলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়, যেমন আজ তোমার হয়েচে। বিদেশের বই থেকে যা শিখেচ তাকেই একান্ত বলে মেনে নিয়েচ বলেই এমনি করে চলে আসতে পারলে। নইলে পারতে না। গুরুজনকে অকারণে অসম্মান করতে বাধত। আত্মমর্য্যাদা আর আত্ম-অভিমানের তফাৎ বুঝতে।

বন্দনা তফাৎ না বুঝুক, এটা সে বুঝিল যে তাহার আজিকার আচরণটা বিপ্রদাসের অন্তরে লাগিয়াছে। তাহার জন্য নয়, মায়ের অসম্মানের জন্য।

মিনিট দুই-তিন চুপ করিয়া থাকিয়া বন্দনা হঠাৎ প্রশ্ন করিল, মায়ের মত আপনি নিজেও খুব গোঁড়া হিন্দু, না?

বিপ্রদাস কহিল হাঁ।

তেমনি ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাচ বিচার করে চলেন?

চলি।

প্রণাম করতে গেলে তাঁর মতই দূরে সরে যান?

যাই। সময় অসময়ের হিসেব আমাদের মেনে চলতে হয়।

আমার মেজদিদিকেও বোধ করি এমনি অন্ধ বানিয়ে তুলেচেন?

সে তোমার দিদিকেই জিজ্ঞাসা ক'রো। তবে পারিবারিক নিয়ম তাঁকেও মেনে চলতে হয়।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ বাঘের ভয় না করে কারও চলবার যো নেই।

বিপ্রদাসও হাসিয়া বলিল, না, যো নেই। যেমন দিনের গাড়ীতে বাঘের ভয় থাকলে মানুষকে রাত্রের গাড়ীতে যেতে হয়—ওটা প্রাণধর্মের স্বাভাবিক নিয়ম।

বন্দনা বলিল, দিদি মেয়েমানুষ, সহজেই দুর্ব্বল, তাঁর ওপর সব নিয়মই খাটান যায়, কিন্তু দ্বিজুবাবুও ত শুনি পারিবারিক নিয়ম মেনে চলেন না, সে সম্বন্ধে বাঘ-মশায়ের অভিমতটা কি?

প্রশ্নটা খোঁচা দিবার জন্যই বন্দনা করিয়াছিল এবং বিদ্ধ করিবে বলিয়াই সে আশা করিয়াছিল, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের 'পরে কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না,

তেমনই হাসিয়া বলিল, এ সকল গূঢ় তথ্য অধিকারী ব্যতিরেকে প্রকাশ করা নিষেধ।

দ্বিজুবাবু নিজে জানতে পাবেন ত?

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সময় হলেই পাবে। সে জানে রক্তমাংসে বাঘের পক্ষপাতিত্ব নেই।

মুহূর্তকালের জন্য বন্দনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। ইহার পরে সে যে কি প্রশ্ন করিবে ভাবিয়া পাইল না।

এই পরিবর্তন বিপ্রদাসের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে এড়াইল না।

পিতা ডাকিলেন, বুড়ি, আমাকে একটু জল দাও ত মা।

বন্দনা উঠিয়া গিয়া পিতাকে কুঁজা হইতে জল দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। পুনশ্চ দ্বিজদাসের কথা পাড়িতে তাহার ভয় করিল। অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কহিল, মেজদির শাশুড়ীর জন্যে নয়, কিন্তু আমার না-খেয়ে আসায় মেজদি যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন ত আমিও দুঃখ পাব। আমি সেই কথাই এখন ভাবচি।

বিপ্রদাস কহিল, মেজদি কষ্ট পাবেন সেইটে হ'লো বড়, আর আমার মা যে লজ্জা পাবেন, বেদনা বোধ করবেন সেটা হ'লো তুচ্ছ! তার মানে, মানুষ আসল জিনিষটি না জানলে কত উল্টো চিন্তাই না করে!

বন্দনা কহিল, একে উল্টো চিন্তা বলচেন কেন? বরঞ্চ এই ত স্বাভাবিক।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। তাহার ক্ষুণ্ণ মুখের চেহারা বন্দনার চোখে পড়িল।

বাহিরে অন্ধকার করিয়া আসিতেছিল, কিছুই দেখা যায় না, তথাপি জানালার বাহিরে চাহিয়া বন্দনা বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অন্যদিন এই সময়ে ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছায়, কিন্তু আজ এখনো দু-তিন ঘণ্টা দেরি। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল বিপ্রদাস পকেট হইতে একটা ছোট খাতা বাহির করিয়া কি-সব লিখিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মুখুয্যেমশাই, একটা কথার জবাব দেবেন?

কি কথা?

আপনি বলছিলেন আমাদের আত্ম-সম্ভ্রমবোধ শুধু ইস্কুল-কলেজের বইপড়া ধারণা। কিন্তু আপনার মা ত ইস্কুল-কলেজে পড়েননি, তাঁর ধারণা কোথাকার শিক্ষা?

বিপ্রদাস বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না।

বন্দনা কহিল, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল আমি মন থেকে সরাতে পারচিনে।

তিনি গুরুজন, আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু সংসারে সেই কথাটাই কি সকল কথার বড়?

বিপ্রদাস পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া রহিল।

বন্দনা বলিতে লাগিল, আজ আমরা ছিলুম তাঁর বাড়ীতে অনাহূত অতিথি। এ ত আমার বই-পড়া বিদেশের শিক্ষা নয়? তবু ত এসব কিছুই নয়—শুধু বয়সে ছোট বলেই কি আমারই অপমানটা আপনারা অগ্রাহ্য করবেন?

এখনও বিপ্রদাস কিছুই বলিল না, তেমনি নীরবে রহিল।

বন্দনা কহিল, তবুও তাঁর কাছে আমি ক্ষমা চাইচি। আমার আচরণের জন্যে দিদি যেন না দুঃখ পান। একটু থামিয়া বলিল, আমার বাপ-মা বিলেত গিয়েছেন রূপে মেমসাহেব ছাড়া তাঁকে আজও কিছু তিনি ভাবতেই পারেন না। শুনেচি, এই জন্যেই নাকি আজও মেজদির গঞ্জনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তাঁর ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা মিলবে না, তবু তাঁকে বলবেন, আমি যাই হই, অপমানটা অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। দিদির শাশুড়ী করলেও না। বলিতে বলিতে তাহার চোখের কোলে জল আসিয়া পড়িল।

বিপ্রদাস ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু তিনি ত তোমাকে অপমান করেন নি।

বন্দনা জোর দিয়া বলিল, নিশ্চয় করেচেন।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না, কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া কহিল, না, অপমান তোমাকে মা করেননি। কিন্তু তিনি নিজে ছাড়া এ কথা তোমাকে কেউ বোঝাতে পারবেন না। তর্ক করে নয়, তাঁর কাছে থেকে এ কথা বুঝতে হবে।

বন্দনা জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, একদিন বাবার সঙ্গে মার ঝগড়া হয়। কারণটা তুচ্ছ, কিন্তু হয়ে দাঁড়াল মস্ত বড়। তোমাকে সকল কথা বলা চলে না, কিন্তু সেই দিন বুঝেছিলাম আমার এই লেখাপড়া-না-জানা মায়ের আত্ম-মর্য্যাদাবোধ কত গভীর।

বন্দনা সহসা ফিরিয়া দেখিল অপরিসীম মাতৃ-গর্ব্বে বিপ্রদাসের সমস্ত মুখ যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে কিছুই না বলিয়া আবার জানালার বাহিরেই চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, অনেকদিন পরে কি-একটা কথার সূত্রে একদিন এই কথাই মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মা, এত বড় আত্মমর্য্যাদাবোধ তুমি পেয়েছিলে কোথায়?

বন্দনা মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, কি বললেন তিনি?

বিপ্রদাস কহিল, জান বোধ হয় মায়ের আমি আপন ছেলে নই। তাঁর নিজের

দুটি ছেলে-মেয়ে আছে—দ্বিজু আর কল্যাণী। মা বললেন, তোদের তিনটিকে এক সঙ্গে এক বিছানায় যিনি মানুষ করে তোলবার ভার দিয়েছিলেন, তিনিই এ-বিশ্বে আমাকে দান করেছিলেন বাবা, অন্য কেউ নয়। সেই দিন থেকেই জানি মায়ের এই গভীর আত্ম-সম্মানবোধই কাউকে একটা দিনের জন্যে জানতে দেয়নি, তিনি আমার জননী ন'ন, বিমাতা। বুঝতে পার এর অর্থ?

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনরায় সে বলিতে লাগিল, অভিবাদনের উত্তরে কে কতটুকু হাত তুললে, কতটুকু সরে দাঁড়াল, নমস্কারের প্রতি-নমস্কারে কে কতখানি মাথা নোয়ালে, এই নিয়ে মর্য্যাদার লড়াই সকল দেশেই আছে, অহঙ্কারের নেশার খোরাক তোমাদের পাঠ্য-পুস্তকের পাতায় পাতায় পাবে, কিন্তু মা না হয়েও পরের ছেলের মা হয়ে যেদিন মা আমাদের বৃহৎ পরিবারে প্রবেশ করলেন, সেদিন আশ্রিত আত্মীয়-পরিজনদের গলায় বিষের থলি যেন উপচে উঠল। কিন্তু যে বস্তু দিয়ে তিনি সমস্ত বিষ অমৃত করে তুললেন, সে গৃহকর্ত্রীর অভিমান নয়, সে গৃহিণীপনার জবরদস্তি নয়, সে মায়ের স্বকীয় মর্য্যাদা। সে এত উঁচু যে তাকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারলে না। কিন্তু এ তত্ত্ব আছে শুধু আমাদের দেশে। বিদেশীরা এ খবর ত জানে না, তারা খবরের কাগজের খবর দেখে বলে এঁদের দাসী, বলে অন্তঃপুরে শেকল-পরা বাঁদী। বাইরে থেকে হয়ত তাই দেখায়—দোষ তাদের দিইনে, কিন্তু বাড়ীর দাস-দাসীরও সেবার নীচে অন্নপূর্ণার রাজ্যেশ্বরী মূর্ত্তি তাদের যদিও বা না চোখে পড়ে, তোমাদেরও কি পড়বে না?

বন্দনা অভিভূত-চক্ষে বিপ্রদাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ব্যারিষ্টার সাহেব অকস্মাৎ জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন, ট্রেন এতক্ষণে হাওড়া প্লাটফর্ম্মে ইন্ করলে।

বন্দনার পিতার বোধ করি তন্দ্রা আসিয়াছিল, চমকিয়া চাহিয়া কহিলেন, বাঁচা গেল।

বন্দনা মৃদুকণ্ঠে চুপি চুপি বলিল, আমার কলকাতায় নামতে আর যেন ভাল লাগচে না মুখুয্যেমশাই। ইচ্ছে হচ্ছে আপনার মার কাছে ফিরে যাই। গিয়ে বলি, মা, আমি ভাল করিনি, আমাকে মার্জ্জনা করুন।

বিপ্রদাস শুধু হাসিল, কিছু বলিল না।

ষ্টেশনে নামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন?

রায়সাহেব বলিলেন, গ্র্যাণ্ড হোটেলেই ত বরাবর উঠি, তাদের তার করেও দিয়েচি—ঐখানেই উঠব।

এই লোকটির সুমুখে গ্র্যাণ্ড হোটেলের কথায় বন্দনার কেমন যেন আজ লজ্জা করিতে লাগিল।

পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টার সাহেব গাড়ীর অত্যন্ত লেট হওয়ার প্রতি নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বার বার জানাইতে লাগিলেন তাঁহাকে বি. এন. লাইনে যাইতে হইবে, অতএব ওয়েটিং রুম ব্যতীত আজ আর গত্যন্তর নাই।

বিপ্রদাস নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, রায়সাহেব নিজেও একটুখানি যেন লজ্জিত হইয়াই কহিলেন, কিন্তু বিপ্রদাস, তুমিও—তুমি বোধ হয় আমাদের সঙ্গে—

গ্র্যাণ্ড হোটেলে? বলিয়াই বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল, কহিল, আমার জন্যে চিন্তা নেই। বৌবাজারে দ্বিজুর একটা বাড়ী আছে, প্রায়ই আসতে হয়, লোকজন সবই আছে —আচ্ছা, আজ সেইখানেই চলুন না?

বন্দনা পুলকিত হইয়া উঠিল—চলুন, সবাই সেইখানেই যাব। তাহার মাথার উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। আনন্দের প্রাবল্যে অপর দুই সহযাত্রীকে সে-ই সাদরে আহ্বান করিয়া সবাই মিলিয়া মোটরে গিয়া উঠিল।

৯

বন্দনা সকালে উঠিয়া দেখিল এই বাড়ীটার সম্বন্ধে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়। মনে করিয়াছিল পুরুষমানুষের বাসাবাড়ী, হয়ত ঘরের কোণে কোণে জঞ্জাল, সিঁড়ির গায়ে থুথু, পানের পিচের দাগ, ভাঙা-চোরা আসবাব-পত্র, ময়লা বিছানা, কড়ি-বরগায় ঝুল, মাকড়সার জাল—এমনি সব আগোছাল বিশৃঙ্খল ব্যাপার। কাল রাত্রে সামান্য আলোকে স্বল্পকালের মধ্যে দেখাও কিছু হয় নাই, কিন্তু আজ তাহার সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্নতায় সত্যই আশ্চর্য্য হইল। মস্ত বাড়ী, অনেক ঘর, অনেক বারান্দা, সমস্ত পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দ্বারের বাহিরে একজন মধ্যবয়সী বিধবা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়াছিল, দেখিতে ভদ্রঘরের মেয়ের মত, সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতেই বন্দনা সসঙ্কোচে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে বলিল, দিদি, আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি, চলুন, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিই। আমি এ বাড়ীর দাসী।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, বাবা উঠেচেন?

না, কাল শুতে দেরি হয়েচে, হয়ত উঠতেও দেরি হবে।

আমাদের সঙ্গে দুজনে যাঁরা এসেচেন তাঁরা?

না, তাঁরাও ওঠেননি।

তোমাদের বড়বাবু? তিনিও ঘুমুচ্ছেন?

দাসী হাসিয়া বলিল, না, তিনি গঙ্গাস্নান, পুজো আহ্নিক সেরে কাছারি-ঘরে গেছেন। খবর পাঠাব কি?

বন্দনা বলিল, না, তার দরকার নেই।

স্নানের ঘরটা একটু দূরে, ছোট একটা বারান্দা পার হইয়া যাইতে হয়। বন্দনা যাইতে যাইতে কহিল, তোমাদের এখানে বাথরুম শোবার ঘরের কাছে থাকবার যো নেই, না?

দাসী কহিল, না। মা মাঝে মাঝে কালী-দর্শনের জন্যে কলকাতায় এলে এ-বাড়ীতেই থাকেন কি না, তাই ও-সব হবার যো নেই।

বন্দনা মনে মনে বলিল, এখানেও সেই প্রবল প্রতাপ মা। আচার-অনাচারের কঠিন শাসন। সে ফিরিয়া গিয়া কাপড় জামা গামছা প্রভৃতি লইয়া আসিল, কহিল, এখানে দু-চারদিন যদি থাকতে হয়, তোমাকে কি বলে ডাকব? এখানে তুমি ছাড়া আর বোধ হয় কোন দাসী নেই?

সে বলিল, আছে, কিন্তু তার অনেক কাজ। ওপরে আসবার সময় পায় না। যা দরকার হয় আমাকেই আদেশ করবেন দিদি, আমার নাম অন্নদা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক, হয়ত অনেক দোষ-ত্রুটি হবে।

তাহার বিনয়বাক্যে বন্দনা মনে মনে খুশী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় তোমার বাড়ী অন্নদা? তোমার কে কে আছে?

অন্নদা বলিল, বাড়ী আমাদের এঁদের গ্রামেই—বলরামপুরে। একটি ছেলে, তাকে এঁরাই লেখা-পড়া শিখিয়ে কাজ দিয়েছেন, বৌ নিয়ে সে দেশেই থাকে। ভালই আছে দিদি।

বন্দনা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, তবে নিজে তুমি এখনো চাকুরি ক'র কেন, বৌ-ব্যাটা নিয়ে বাড়ীতে থাকলেই ত পার?

অন্নদা কহিল, ইচ্ছে ত হয় দিদি, কিন্তু পেরে উঠিনে। দুঃখের দিনে বাবুদের কথা দিয়েছিলুম নিজের ছেলে যদি মানুষ হয়, পরের ছেলেদের মানুষ করার ভার নেব। সেই ভারটা ঘাড় থেকে নামাতে পারিনি। দেশের অনেকগুলি ছেলে এই বিদেশে লেখা-পড়া করে। আমি না দেখলে তাদের দেখবার কেউ নেই।

তারা বুঝি এই বাড়ীতে থাকে?

হাঁ, এই বাড়ীতে থেকেই কলেজে পড়ে। কিন্তু আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি বাইরেই আছি, ডাকলেই সাড়া পাবেন।

বন্দনা বাথরুমে ঢুকিয়া দেখিল ভিতরে নানাবিধ ব্যবস্থা। পাশাপাশি গোটা-তিনেক ঘর, স্পর্শ-দোষ বাঁচানোর যত প্রকার ফন্দি-ফিকির বুদ্ধিতে আসিতে পারে তাহার কোন ত্রুটি ঘটে নাই। বুঝিল এসব মায়ের ব্যবহারের জন্য। পাথরের মেঝে, পাথরের জলচৌকি, একদিকে গোটা-তিনেক প্রকাণ্ড তাঁবার হাঁড়া, বোধ হয় গঙ্গা-জল রাখার জন্য—নিত্য মাজা-ঘষার ঝক্ ঝক্ করিতেছে—তিনি কবে আসিয়াছিলেন এবং আবার কবে আসিবেন নিশ্চিত কেহ জানে না, তথাপি অবহেলার চিহ্নমাত্র কোথাও চোখে পড়িবার যো নাই। যেন এইখানেই বাস করিয়া আছেন এমনি সযত্ন-সতর্ক ব্যবস্থা। এ যে কেবল হুকুম করিয়া, শাসন চালাইয়াই হয় না, তাহার চেয়েও বড় কিছু একটা সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এ কথা বন্দনা চাহিবামাত্রই অনুভব করিল। এবং এই মা, স্ত্রীলোকটি যে এ-সংসারে সর্ব্বসাধারণের কতখানি উর্দ্ধে অবস্থিত এই কথাটা সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের মনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। গল্পে, প্রবন্ধে, পুস্তকে ভারতীয় নারীজাতির বহু দুঃখের কাহিনী সে পড়িয়াছে, তাহাদের হীনতার লজ্জায় নিজে নারী হইয়া সে মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছে—ইহা মিথ্যাও নয়, কিন্তু এই ঘরের মধ্যে আজ একাকী দাঁড়াইয়া সে-সকল সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেও তাহার বাধিল।

বাহিরে আসিতে অন্নদা হাসিমুখে কহিল, বড্ড দেরি হয়ে গেল যে দিদি, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক, ওঁরা সব নীচে খাবার-ঘরে অপেক্ষা করে আছেন। চলুন।

তোমাদের বড়বাবু কাছারি-ঘর থেকে বেরিয়েচেন?

হাঁ, তিনিও নীচে আছেন।

আমাদের সঙ্গে বোধকরি খাবেন না?

অন্নদা সহাস্যে কহিল, খেলেও ত সেই দুপুরের পরে দিদি। আজ আবার তাও নেই। একাদশী, সন্ধ্যের পর বোধ হয় কিছু ফল-মূল খাবেন।

বন্দনা কি করিয়া যেন বুঝিয়াছিল এ-গৃহে এ স্ত্রীলোকটি ঠিক দাসী জাতীয় নয়। কহিল, তিনি ত আর বামুনের ঘরের বিধবা ন'ন, একাদশীর উপোস করবেন কোন্ দুঃখে? কাল গাড়ীতে একাদশী না হোক দশমীর উপবাস ত ওঁর এমনি হয়ে গেছে।

অন্নদা বলিল, তা হোক, উপোস ওঁর গায়ে লাগে না। মা বলেন আর জন্মে তপস্যা করে বিপিন এ জন্মে উপোস-সিদ্ধির বর পেয়েচে। ওঁর খাওয়া দেখলে অবাক হতে হয়।

বন্দনা নীচে আসিয়া দেখিল, তাহাদের অভ্যস্ত চা রুটি ডিম প্রভৃতি টেবিলে সুসজ্জিত, এবং পিতা ও সস্ত্রীক পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টার ক্ষুধায় চঞ্চল। ধৈর্য্য তাহাদের প্রায় শেষ সীমায় উপনীত, মুহূর্ত্তে খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া সাহেব অনুযোগের

কণ্ঠে কহিলেন, ইঃ—এত দেরি মা, সকাল বেলাটায় আর ত কোন কাজ হবে না দেখচি।

বিপ্রদাস অদূরে বসিয়াছিল, বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মুখুয্যেমশাই, আপনি খাবেন না?

বিপ্রদাস কথাটা বুঝিল, হাসিয়া কহিল, চা আমি খাইনে, খাই শুধু ডাল-ভাত। তার সময় এ নয় আমার জন্য চিন্তা নেই, তুমি বসে যাও।

বন্দনা ইহার উত্তর দিল না, পিতা এবং অতিথি দুজনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আমার অপরাধ হয়ে গেছে, বলে পাঠান উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। খাবার ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু আপনারা আর অপেক্ষা করবেন না—আরম্ভ করে দিন। আমি বরঞ্চ আপনাদের চা তৈরী করে দিই। বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গেল।

সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকরটা একধারে দাঁড়াইয়াছিল, সে কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। পিতা উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুখ করেনি ত মা? সস্ত্রীক ব্যারিষ্টারসাহেব কি যে বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

বন্দনা চা তৈরি করিতে করিতে, না বাবা, অসুখ করেনি, শুধু খেতে ইচ্ছে করচে না।

তা হলে কাজ নেই। কাল বেশি রাতের খাওয়াটা বোধ করি তেমন হজম হয়নি। তা ছাড়া দিনের বেলা পিত্তি পড়ে গেল কি না।

তাই বোধ হয় হবে। বেলা হলে মুখুয্যেমশায়ের সঙ্গে বসে ডাল ভাত খাব, এ বাড়ীতে সে হয়ত হজম করতে পারব।

কথাটায় আর কেহ কোন খেয়াল করিল না, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের উপর দিয়া যেন একটা কাল ছায়া মুহূর্তের জন্য ভাসিয়া গেল।

চাকরটা কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আজ একাদশী, ও-বেলায় দুটো ফল মূল ছাড়া আর ত কিছু খান না।

বন্দনা এইমাত্র এ-কথা শুনিয়া আসিয়াছিল তথাপি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, শুধু ফল মূল? বেশ হাল্কা খাওয়া। সেই বোধ হয় খুব ভাল হবে। না, মুখুয্যেমশাই

বিপ্রদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িল বটে, কিন্তু কেহ যে তাহাকে স্বচ্ছন্দ উপহাস করিতে পারে আজ এই প্রথম জানিয়া মনে মনে সে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। এবং তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বন্দনাও বোধ করি ইহা অনুভব করিল।

কাজ-কর্ম্ম সারিয়া বন্দনা পিতার সহিত যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল তখন অপরাহ্ণ বেলা। সস্ত্রীক ব্যারিষ্টারসাহেব যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠের ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তুসকল পরিদর্শন করিয়া

তখনও ফিরে নাই। রাত্রের গাড়ীতে তাঁহাদের যাইবার কথা, কিন্তু প্রোগ্রাম বদল করিয়া যাত্রাটা আপাততঃ তাঁহারা বাতিল করিয়াছেন।

রায়সাহেব কাপড় ছাড়িতে তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন, বন্দনার নিজের ঘরের সম্মুখে দেখা হইল অন্নদার সঙ্গে। সে হাসিমুখে অনুযোগের সুরে বলিল, দিদি, সারাদিন ত না খেয়ে কাটল আপনার। ফল-মূল সমস্ত আনিয়ে রেখেছি, একটু শীগ্‌গির করে মুখহাত ধুয়ে নিন, আমি ততক্ষণ সব তৈরী করে ফেলি। কি বলেন?

কিন্তু বড়বাবু—মুখুয্যেমশাই? তিনি কই?

অন্নদা কহিল, তাঁর জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই দিদি; এ-সব তাঁর রোজকার ব্যাপার। খাওয়ার চেয়ে না-খাওয়াটাই তাঁর নিয়ম।

কিন্তু কই তিনি?

তিনি গেছেন দক্ষিণেশ্বর কালীদর্শন করতে। এখুনি আসবেন।

বন্দনা কহিল, সেই ভাল, তিনি এলেই হবে। কিন্তু বাকি সকলে? তাঁদের কি ব্যবস্থা হ'লো? চল ত অন্নদা, তোমাদের রান্নাঘরটা একবার দেখে আসি।

অন্নদা কহিল, চলুন, কিন্তু এ-বেলায় তাঁদের ব্যবস্থা ত রান্নাঘরে হয়নি দিদি, ব্যবস্থা হয়েচে হোটেলে—খাবার সেখান থেকেই আসবে।

বন্দনা আশ্চর্য্য হইয়া গেল—সে কি কথা? এ পরামর্শ তোমাদের দিলে কে?

বড়বাবু নিজেই হুকুম দিয়ে গেছেন।

কিন্তু সে-সব অখাদ্য-কুখাদ্য তাঁরা খাবেন কোথায়? এই বাড়ীতে? তোমাদের মা শুনলে বলবেন কি?

অন্নদা অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, কহিল, না, তিনি শুনতে পাবেন না। নীচের একটা ঘরে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বাসন-পত্র হোটেলওয়ালারাই নিয়ে আসবে, কোন অসুবিধে হবে না।

বন্দনা বলিল, হুকুম ত দিয়ে গেলেন, কিন্তু তামিল করলে কে? তাঁর কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে পার?

সে আর বেশি কথা কি দিদি, চলুন নিয়ে যাচ্ছি।

চল।

মুখুয্যেদের একটা বড় রকমের তেজারতি কারবার কলিকাতায় চলে। নীচের তলায় গোটা-চারেক ঘর লইয়া আফিস; কেরানী, গোমস্তা, সরকার, পেয়াদা, ম্যানেজার প্রভৃতি ব্যবসায়ের যাবতীয় লোকজন কাজ করে, বন্দনা প্রবেশ করিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। বয়স ও পদমর্য্যাদার লক্ষণে ম্যানেজার ব্যক্তিটিকেই সহজে

চিনিতে পারিয়া সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া কহিল, হোটেলে হুকুম দিয়ে এসেছিলেন কি আপনি নিজে?

ম্যানেজার ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলে কহিল, আর একবার গিয়ে তাদের বারণ করে দিয়ে আসুন।

ম্যানেজার বিস্মিত হইল, ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, বড়বাবু ফিরে না আসা পর্য্যন্ত—

বন্দনা কহিল, তখন হয়ত আর বারণ করবার সময় থাকবে না। মুখুয্যমশাই রাগ করলে আমার ওপর করবেন। আপনার ভয় নেই। যান, দেরি করবেন না। এই বলিয়াই সে ফিরিতে উদ্যত হইল, উত্তরের অপেক্ষাও করিল না।

হতবুদ্ধি ম্যানেজার ভাবিল, মন্দ নয়। বিপ্রদাসের হুকুম অমান্য করা কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলাও চলে, কিন্তু এই অপরিচিত মেয়েটির সুনিশ্চিত নিঃসংশয় শাসন অবহেলা করাও কম কঠিন নয়। প্রায় তেমনি অসম্ভব। ক্ষণকাল বিমূঢ়ের ন্যায় স্তব্ধ থাকিয়া দ্বিধা-স্বরে কহিল, আজ্ঞে, যাই তা হলে—নিষেধ করে আসি? কিছু আগাম দেওয়া হয়ে গেছে—

তা হোক, আপনি দেরি করবেন না। বলিয়া সে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিয়া বিপ্রদাস খবর শুনিল। খুশী হইবে কি রাগ করিবে হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না। রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল, আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, বন্দনা ছোট একটা টুল পাতিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে লইয়া ব্যস্ত, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম বিনয়ের কণ্ঠে কহিল, রাগের মাথায় ম্যানেজারবাবুকে বরখাস্ত করে আসেননি ত মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস কহিল, মুখুয্যেমশাই যে বদ্‌রাগী এ খবর তোমায় দিলে কে?

বন্দনা বলিল, লোকে বলে বাঘের গন্ধ এক যোজন দূর থেকে পাওয়া যায়।

বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল—কিন্তু অতিথিদের উপায় কি হবে? এদের সকলের যে রাত্রে ডিনার করা অভ্যেস—তার কি বল ত?

বন্দনা কহিল, যাঁর যা না হলে নয় তাঁকে লোক দিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দিন। বিলের টাকা আমি দেব।

তামাসা নয় বন্দনা, এ হয়ত ঠিক ভাল হ'ল না।

ভাল হ'তো বুঝি ঐ সব জিনিষ এ বাড়ীতে বয়ে আনলে? মা শুনলে কি বলতেন বলুন ত?

বিপ্রদাস একথা যে ভাবে নাই তাহা নহে, কিন্তু স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই, কহিল, তিনি জানতে পারতেন না।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া বলিল, পারতেন। আমি চিঠি লিখে দিতুম।

কেন ?

কেন ? কখনো যা করেননি, দুদিনের এই কটা বাইরের লোকের জন্যে কিসের জন্যে তা করতে যাবেন ? কখ্খনো না।

শুনিয়া বিপ্রদাস শুধু যে খুশী হইল তাই নয়, বিস্ময়াপন্ন হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু তুমি যে কাল থেকে কিছুই খাওনি বন্দনা ? রাগ কি পড়বে না ? তাহার কণ্ঠস্বরে একবার একটু স্নেহের সুর লাগিল।

বন্দনা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, রাগিয়ে দিয়েছিলেন কেন ? কিন্তু শুনুন, আপনার খাবার ফল মূল সব আনান আছে, ততক্ষণ মধ্যে আহ্নিক আপনি সেরে নিন, আমি গিয়ে তৈরি করে দেব। কিন্তু আর কেউ যদি দেয়, আমি আজও খাব না বলে দিচ্চি।

আচ্ছা, এস, বলিয়া বিপ্রদাস উপরে চলিয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে বন্দনা ফল-মূল মিষ্টান্নের শাদা পাথরের থালা হাতে লইয়া বিপ্রদাসের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্নদার হাতে আসন ও জলের গ্লাস। জল-হাতে সমস্তটা সে সযত্নে মুছিয়া ঠাঁই করিয়া দিল।

বিপ্রদাস বন্দনার পানে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল, তুমি কি আবার এখন স্নান করলে না কি ?

আপনি খেতে বসুন, বলিয়া সে পাত্রটা নামাইয়া রাখিল।

১০

বিপ্রদাস আসনে বসিয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল, সত্যিই আবার এখন স্নান করে এলে না কি ? অসুখ করবে যে ?

তা করুক। কিন্তু হাতে না-খাবার ছল-ছুতা আবিষ্কার করতে আপনাকে দেব না এই আমার পণ। স্পষ্ট করে বলতে হবে, তোমার ছোঁয়া খাব না, তুমি ম্লেচ্ছ-ঘরের মেয়ে।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, বইয়ে পড়নি যে দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না ?

বন্দনা বলিল, পড়েচি, কিন্তু আপনি দুরাত্মাও ন'ন, ভগবানও ন'ন—আমাদেরই মত দোষে গুণে জড়ান মানুষ। তা না হলে সত্যই আজ ও-বেচারাদের ডিনার বন্ধ করতে যেতুম না।

কিন্তু সত্যি কারণটা কি ?

সত্যি কারণটাই আপনাকে বলচি। আপনাদের পরিবারে ওটা চলে না। না দেশের বাড়ীতে, না এখানে। কিসের ভয়ে ওকাজ করতে যাবেন ?

কিন্তু জান ত, সবাই ওঁরা বিলেত-ফেরত—এমনি খাওয়াতেই ওরা অভ্যস্ত।

বন্দনা কহিল, অভ্যাস যাই হোক, তবুও বাঙালী। বাঙালী অতিথি ডিনার খেতে না পেয়ে মারা গেছে কোথাও এমন নজির নেই। সুতরাং এ অছাত অগ্রাহ্য। আপনার বাজে কথা।

বিপ্রদাস কহিল, তবে কাজের কথাটা কি শুনি?

বন্দনা বলিল, সে আমি ঠিক জাননে। কিন্তু বোধ হয় যা আপনি মুখে বলেন তার সবটুকু ভেতরে মানেন না। নইলে মাকে লুকিয়ে এ ব্যবস্থা করতে কিছুতেই রাজি হতেন না। লোকে আপনাকে মিথ্যে অত ভয় করে। যাঁকে করা দরকার সে আপনি ন'ন, আপনার মা।

শুনিয়া বিপ্রদাস কিছুমাত্র রাগ করিল না, বরঞ্চ হাসিয়া বলিল, তুমি দুজনকেই চেনেচ। কিন্তু ব্যাপারটা যে মাকে লুকিয়ে হচ্ছিল এ খবর তুমি শুনলে কার কাছে?

বন্দনা নাম করিল না, শুধু কহিল, আমি জিজ্ঞেসা করে জেনে নিয়েছি। সে এক বড় দুর্ঘটনা যে, মেজদি আমাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেন না, চিরদিন অভিসম্পাত করে বলবেন, বন্দনার জন্যেই এমন হ'ল। তাই কিছুতেই একাজ করতে আপনাকে আমি দিতে পারিনে।

বিপ্রদাস কহিল, তুমি পরম আত্মীয় কুটুম্বর মধ্যে সকলের বড়। এ তোমার যোগ্য কথা। কিন্তু লুকোচুরি না করে তোমার হাতে আমার খাওয়া চলে না এ-কথা সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলে? বরঞ্চ জেনে এস গিয়ে, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করে রইলুম, বলিয়া সে হাসিয়া খাবারের থালাটা একটুখানি ঠেলিয়া দিল।

বন্দনার মুখ প্রথমে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, পরে সামলাইয়া লইয়া কহিল, না, এ কথা তাকে জিজ্ঞেসা করতে আমি যেতে পারব না, আপনার খেয়ে কাজ নেই।

বিপ্রদাস বলিল, কিন্তু মুস্কিল এই যে, নিজের বাড়ীতে তোমাকে উপবাসী রাখতে ত পারিনে, বলিয়া সে আহারে প্রবৃত্ত হইল।

বন্দনা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এর পরে কি করবেন?

বাড়ী ফিরে গিয়ে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব, বলিয়া হাসিল। কিন্তু তাহার হাসি সত্ত্বেও ইহা সত্য না পরিহাস, বন্দনা নিশ্চিত বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া একটা হবেই, কিন্তু তোমার বোনের শাস্তি থেকে যে পরিত্রাণ পাব এটা তার চেয়েও বড়। বলিয়া পুনশ্চ সহাস্যে কহিল, বিশ্বাস হ'ল না? আচ্ছা আগে বিয়ে হোক, তখন মুখুয্যেমশায়ের কথাটা বুঝবে, বলিয়া সে খাবারের পাত্রটা নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এদিকে ডিনার বাতিল হইল বটে, কিন্তু অন্যান্য রুচিকর খাদ্যের আয়োজনে অবহেলা ছিল না। সুতরাং পরিতৃপ্তির দিক দিয়া কোথাও ত্রুটি ঘটিল না। কর্ম সর্ব্বকার্য্য সমাধা করার পরে বিছানায় শুইয়া বন্দনা ভাবিতেছিল, তাহার সম্বন্ধে বিপ্রদাসের আচরণ প্রত্যাশিতও নয়, হয়ত অন্যায়ও নয়, এবং আপনার জন হইয়াও যেজন্য এতকাল ঘনিষ্ঠতা ও পরিচয় ছিল না তাহাও এতদিনের প্রাচীন কাহিনী যে নূতন করিয়া আঘাত বোধ করা শুধু বাহুল্য নয়, বিড়ম্বনা। প্রণাম করিতে গেলে বিপ্রদাসের মা স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদে বন্দনা না খাইয়া রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। শিক্ষাবিহীন নারীর উগ্র ধর্ম্ম বাধ তাহাকে আঘাত করে নাই তাহা নয়, তথাপি এই মূঢ়তাকেও একদিন বিস্মৃত হওয়া সহজ কিন্তু বিপ্রদাস যাহা করিল তাহার প্রতিবাদে কি বলা যে উচিত বন্দনা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার হাতের ছোঁয়া ফলমূল-মিষ্টান্ন সে খাইয়াছে সত্য, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়, দায়ে পড়িয়া। পাছে বলরামপুরের কদর্য্য কাণ্ড এখানেও ঘটে এই ভয়ে। এ যেন পাগলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে। কিন্তু এই অনাচার বিপ্রদাসের লাগিয়াছে বাটী ফিরিয়া সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে এই কথাটা কেমন করিয়া যেন নিশ্চয় অনুমান করিয়া বন্দনার চোখে ঘুম রহিল না। অথচ একটাও বন্দনার ভাবিল ব্যাপারটা এত গুরুতর কিসে? তাহাদের চলার পথ ত এক নয়—সংসারে উভয়ের জন্যই প্রশস্ত স্থান যথেষ্ট রহিয়াছে। দৈবাৎ সংঘর্ষ যদি একদিন বাধিয়াই থাকে বাধিলই বা। এ প্রশ্নের মুখোমুখী হইবার ডাক এ জীবনে তাহাকে কে দিতেছে? এমন করিয়া সে আপনাকে আপনি শান্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তথাপি এই মানুষটির নিঃশব্দ অবজ্ঞা কোনমতে মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

ভাবিতে ভাবিতে কখন এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু অসুস্থ বাধাগ্রস্ত নিদ্রা অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। তখনও ভোর হয় নাই, অসমাপ্ত নিদ্রার অবসন্ন জড়িমা দুই চোখ আচ্ছন্ন করিয়া আছে, কিন্তু বিছানাতেও থাকিতে পারিল না, বাহিরে আসিয়া বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল আলো আকাশ নিশান্তের অন্ধকারে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। দূরে বড় রাস্তায় কাচিৎ কদাচিৎ গাড়ীর শব্দ অস্ফুট শোনা যায়, লোক চলাচলের তখনও অনেক বিলম্ব, সমস্ত বাড়ীটাই একান্ত নীরব, সহসা চোখে পড়িল দ্বিতলে মায়ের পূজার ঘরে আলো জ্বলিতেছে, এবং তাহারই একটা সূক্ষ্ম রেখা রুদ্ধ জানালার ফাঁক দিয়া সম্মুখের থামে আসিয়া পড়িয়াছে। একবার মনে করিল চাকরেরা হয়ত আলোটা নিবাইতে ভুলিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল হয়ত এ বিপ্রদাস—পূজায় বসিয়াছে।

কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। বুঝিল, হঠাৎ দেখা হইয়া গেলে লজ্জা রাখিবার ঠাঁই রহিবে না, এই রাত্রে ঘর ছাড়িয়া নীচে আসার কোন কারণই দেওয়া যাইবে না, কিন্তু আগ্রহ সংবরণ করিতে পারিল না।

ধ্যানের কথা বন্দনা পুস্তকে পড়িয়াছে, ছবিতে দেখিয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখনো চোখে দেখে নাই। নিঃশব্দে রাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকারে সেই দৃশ্যই আজ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। বিপ্রদাসের দুই চোখ মুদ্রিত, তাহার বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ আসনের পরে স্তব্ধ হইয়া আছে, উপরের বাতির আলোটা তাহার মুখে, কপালে প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছে—বিশেষ কিছুই নয়, হয়ত আর কোন সময়ে দেখিলে বন্দনার হাসিই পাইত, কিন্তু তন্দ্রা-জড়িত চক্ষে এ মূর্ত্তি আজ তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। এইভাবে কতক্ষণ সে যে দাঁড়াইয়াছিল তাহার হুঁস নাই, কিন্তু হঠাৎ যখন চৈতন্য হইল তখন পূবের আকাশ ফর্সা হইয়া গিয়াছে, এবং ভৃত্যের দল ঘুম ভাঙিয়া উঠিল বলিয়া। ভাগ্য ভাল যে, ইতিমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া কেহ তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে নাই। আর সে অপেক্ষা করিল না, ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িতেই গভীর নিদ্রামগ্ন হইতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না।

দ্বারে করাঘাত করিয়া অন্নদা ডাকিল, বড্ড বেলা হয়ে গেল যে, উঠবেন না?

বন্দনা ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, বাস্তবিকই বেলা হইয়াছে, লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা বোধ হয় আজও অপেক্ষা করে আছেন? একটু সকালে আমাকে তুলে দিলে না কেন? স্নান করে তৈরী হয়ে নিতে ত একঘণ্টার আগে পেরে উঠব না অন্নদা।

তাহার বিপন্ন মুখের পানে চাহিয়া অন্নদা হাসিয়া বলিল, ভয় নেই দিদি, আজ আর ওঁরা সবুর করতে পারেন নি—শেষ করে নিয়েছেন—এখন যতক্ষণ খুশি স্নান করুন গে, কেউ পেছু ডাকবে না।

শুনিয়া বন্দনা যেন বাঁচিয়া গেল। সেও হাসিমুখে কহিল, তোমাদের অনেক জিনিষই পছন্দ করিনে সত্যি, কিন্তু এটা করি। সকলের দল বেঁধে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে যে গেলবার পালা নেই এ মস্ত স্বস্তি।

অন্নদা বলিল, কিন্তু সকালে কি আপনার ক্ষিদে পায় না দিদি?

বন্দনা কহিল, একদিনও না। অথচ ছেলেবেলা থেকে নিত্যই খেয়ে আসচি। আচ্ছা যাই, আর দেরী করব না, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরে নীচে বিপ্রদাসের সহিত তাহার দেখা হইল। সে কাছারি-ঘর হইতে কাজ সারিয়া বাহির হইতেছিল। বন্দনা নমস্কার করিল।

চা খাওয়া হ'লো?

হঁ।

ওঁরা অপেক্ষা করতে পারলেন না, কিন্তু তোমারই—

বন্দনা থামাইয়া দিয়া কহিল, সেজন্তে ত অনুযোগ করিনি মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, মেজাজের বাহাদুরী আছে তা অস্বীকার করব না, কিন্তু দুবোনের মধ্যে প্রভেদটি যেন চন্দ্র-সূর্য্যের মত। শুনলাম নাকি শীঘ্রই যাচ্ছ বিলেতে শিক্ষাটা পাকা করে নিতে। যাও ফিরে এসে একটা খবর দিয়ো, গিয়ে একবার মূর্ত্তিটা দেখে আসব।

শুনিয়া বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বিপ্রদাস কহিল, সেদেশে শুনেচি বেলা বারোটা পর্য্যন্ত লোককে ঘুমুতে হয়। কঠিন সাধনা। তোমাকে কিন্তু কষ্ট করে সাধতে হবে না, এদেশ থেকেই আয়ত্ত হয়ে রইল।

বন্দনা এবারও হাসিল, কিন্তু তেমনই চুপ করিয়া বিপ্রদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিতান্তই সাধাসিধে সাধারণ ভদ্র চেহারা। হাস্যপরিহাসে স্নেহশীল তাহাদের একজন। অথচ কাল রাত্রির নীরবতায়, নির্জ্জন গৃহের মধ্যে শুদ্ধ মৌন এই মূর্ত্তিটিকে কি যে রহস্যাবৃত মনে হইয়াছিল এই দিবালোকে সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহার কৌতূহলের সীমা রহিল না।

মুখুয্যেমশাই, এঁরা কোথায়? কাউকে ত দেখচিনে?

বিপ্রদাস কহিল, তার মানে তাঁরা নেই। অর্থাৎ শ্বশুরমশাই এবং সস্ত্রীক ব্যারিষ্টার মশাই - তিনজনেই গেছেন হাওড়ায় রেলওয়ে ষ্টেশনে - গাড়ী রিজার্ভ করতে।

বন্দনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সস্ত্রীক ব্যারিষ্টারমশাই করতে পারেন, কিন্তু বাবা করতে যাবেন কেন? তাঁর ছুটি শেষ হতে এখনও আট-দশ দিন বাকি আছে। তা ছাড়া আমাকে না বলে?

বিপ্রদাস কহিল, বলবার সময় পাননি, বোধ করি ফিরে এসেই বলবেন। সকালে বোম্বায়ের আফিস থেকে জরুরি তার এসেচে—মুখের ভাব দেখে সন্দেহ রইল না যে না গেলেই নয়।

কিন্তু আমি? এত শীগ্‌গির যেতে যাব কেন?

বিপ্রদাসও সেই সুরে সুর মিলাইয়া কহিল, নিশ্চয়ই, যেতে যাবে কেন? আমিও ত ঠিক তাই বলি।

বন্দনা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, বোনটিকে একটা তার করে দাও না দেওরটিকে সঙ্গে করে এসে

পড়ুন। তোমাদের মিলবে ভাল অতিথি সংসারের দায় থেকে আমিও অব্যাহতি পেয়ে বাঁচব।

বন্দনা সভয়ে ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, সে কি সম্ভব হতে পারে মুখুয্যেমশাই? মা কি কখনো এ প্রস্তাবে রাজি হবেন? আমাকে তিনি ত দেখতে পারেন না।

বিপ্রদাস কহিল, একবার চেষ্টা করেই দেখো না। বল ত তার করার একটা ফরম পাঠিয়ে দিই - কি বল?

বন্দনা উৎসুক চক্ষে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া শেষে কি ভাবিয়া বলিল, থাক্ মুখুয্যেমশাই, এ আমি পারব না।

তবে থাক্।

আমি বরঞ্চ বাবার সঙ্গে না হয় চলেই যাই।

সেই ভাল, বলিয়া বিপ্রদাস চলিয়া গেল।

খাবার টেবিলের ওপর পিতার টেলিগ্রামখানা পড়িয়াছিল, বন্দনা খুলিয়া দেখিল সত্যই বোম্বাই আফিসের তার। অত্যন্ত জরুরি—বিলম্ব করিবার যো নাই।

বন্দনা ঘরে গিয়া আরেকবার জিনিসপত্র গুছাইতে প্রবৃত্ত হইল।

বাবা তখনও ফিরেন নাই, ঘণ্টা কয়েক পরে অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া কহিল আপনার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেচে দিদি, এই নিন।

আমার টেলিগ্রাম? সবিস্ময়ে হাতে লইয়া বন্দনা খুলিয়া দেখিল বলরামপুর হইতে মা তাকেই তার করিয়াছেন। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন পিতার সহিত সে যেন কোনমতে ফিরিয়া না যায়। বৌমা দ্বিজুকে লইয়া রাত্রের গাড়ীতে যাত্রা করিতেছে।

১১

রাত্রের গাড়ীতে আসিতেছে মেজদি এবং সঙ্গে আসিতেছে দ্বিজদাস। বন্দনার আনন্দ আর ধরে না। সেদিন দিদির শ্বশুরবাড়ীতে নিজের আচরণের জন্য সে মনে মনে বড় লজ্জিত ছিল, অথচ প্রতিকারের উপায় পাইতেছিল না। আজ অত্যন্ত অনিচ্ছাতেও তাহাকে পিতার সঙ্গে বোম্বায়ে ফিরিয়া যাইতে হইত, অকস্মাৎ অভাবিত পথে এ সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। টেলিগ্রামের কাগজখানা বন্দনা অনেকবার নাড়াচাড়া করিল অন্নদাকে পড়িয়া শুনাইল এবং উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিল পিতার জন্যে—এই ছোট্ট কাগজখানি তাহার হাতে তুলিয়া দিতে।

বিপ্রদাস বাড়ীতে নাই, খোঁজ লইয়া জানিল কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি বাহিরে গিয়াছেন। এ ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন সুতরাং তাহাকে জানাইবার কিছুই নাই, তবু একবার বলিতেই হইবে। অথচ এই বলার ভাষাটা সে মনে মনে আলোচনা করিতে গিয়া দেখিল কোন কথাই তাহার মনঃপুত হয় না। আনন্দ-প্রকাশের সহজ রাস্তাটা যেন কখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বহুনিন্দিত জমিদার-জাতীয় এই কড়া ও গোঁড়া লোকটিকে তাহার সুরু হইতেই খারাপ লাগিয়াছিল, এখন তিনি যথেষ্ট দুর্ব্বোধ্য, তথাপি ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে একটা পরবর্ত্তন ঘটিতেছিল। সে দেখিতেছিল এই মানুষটির আচরণ পরিমিত, কথা স্বল্প, ব্যবহার ভদ্র ও মিষ্ট, তবু কেমন একটা ব্যবধান তাঁহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে প্রাস্ত মুহূর্ত্তেই অনুভব করা যায়। সকলের মাঝখানে থাকিয়াও সে সকলের হইতে দূরে বাস করে। আশ্রিত পরিজন, দাসী-চাকর, কর্ম্মচারিবর্গ সকলে ইহাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশি করে ভয়। তাহাদের ভাবটা যেন এইরূপ—বড়বাবু অন্নদাতা, বড়বাবু রক্ষাকর্ত্তা, বড়বাবু দুর্দ্দিনের অবলম্বন, কিন্তু বড়বাবু কাহারও আত্মীয় ন'ন। পিতৃবিয়োগে তাঁহাকে দায় জানান যায়, কিন্তু পুত্রের বিবাহ-উৎসবে আহারের নিমন্ত্রণ করা চলে না। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটুকু তাহারা ভাবিতে পারে না।

কাল বন্দনা রান্নাঘরের দাসীটিকে সরল ও কিঞ্চিৎ নির্ব্বোধ পাইয়া কথায় কথায় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু অনেক জেরা করিয়াও কেবল এইটুকু বাহির করিতে পারিল যে, সে ইহার হেতু জানে না, শুধু সকলেই ভয় করে বলিয়া সে-ও করে এবং অপরকে প্রশ্ন করিলেও বোধ করি এই উত্তরই মিলিত। মুখুয্যে পরিবারে এ যেন এক সংক্রামক ব্যাধি। সেদিন ট্রেণের মধ্যে দৈবাৎ সেই ক্ষুদ্র ঘটনাটুকু অবলম্বন করিয়া বিপ্রদাসের বলিষ্ঠ প্রকৃতি বন্দনার কাছে ক্ষণিকের জন্ত দেখা দিয়া আবার সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছে। গাড়ীর মধ্যে সেদিন কাছে বসিয়া হাস্তপরিহাসের কত কথাই হইয়া গেল, কিন্তু আজ মনে হয় না সেই মানুষটি এ-বাড়ীর বড়বাবু।

হঠাৎ নীচে হইতে একটা গোলমাল উঠিল, কে একজন ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল তাহার পিতা রায়সাহেব ষ্টেশন হইতে ফিরিয়াছেন খোঁড়া হইয়া। বন্দনা জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টার ও তদীয় পত্নী দুইজন দুই বগল ধরিয়া সাহেবকে গাড়ী হইতে নামাইতেছেন। তাঁহার এক পায়ে জুতা-মোজা খোলা ও তাহাতে খান দুই-তিন ভিজা রুমাল জড়ানো। প্ল্যাটফর্ম্মে ভিড়ের

হুড়ামুড়িতে কে নাকি তাঁহার পায়ের উপর ভারী কাঠের বাক্স ফেলিয়া দিয়াছে। লোকজনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল—দরওয়ান ছুটিল ডাক্তার ডাকিতে—ডাক্তার আসিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঔষধ দিল—বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তাঁহার চলা-হাঁটা বন্ধ হইল।

পরদিন বিকালে সতী আসিয়া পৌঁছিল, বন্দনা কলরবে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল মোটর হইতে অবতরণ করিতেছে শুধু মেজদি নয়, সঙ্গে আছেন শাশুড়ী—দয়াময়ী। উচ্ছ্বসিত আনন্দকলরোল নিবিয়া গেল, বন্দনা আড়ষ্টভাবে কোনমতে একটা প্রণাম সারিয়া লইয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইতেছিল; কিন্তু দয়াময়ী কাছে আসিয়া আজ তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছ ত মা?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া সায় দিল, ভাল আছি। মা, হঠাৎ আপনি এসে পড়লেন যে?

দয়াময়ী বলিলেন, না এসে কি করি বল ত? আমার একটি পাগলী মেয়ে রাগ করে না খেয়ে চলে এসেচে, তাকে শান্ত করে বাড়ী ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে নিজে শান্তি পাই কই মা?

বন্দনা কুণ্ঠিত হাস্যে কহিল, কি করে জানলেন আমি রাগ করে এসেচি?

দয়াময়ী বলিলেন, আগে ছেলে-মেয়ে হোক, আমার মত তাদের মানুষ করে বড় করে তোল, তখন আপনি বুঝবে মেয়ে রাগ করলে কি করে মায়ে জানতে পারে।

কথাগুলি তিনি এমন মিষ্ট করিয়া বলিলেন যে বন্দনা আর কোন জবাব না দিয়া হেঁট হইয়া এবার তাঁর পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বাবা বড় অসুস্থ মা।

অসুস্থ? কি হয়েচে তাঁর?

পায়ে আঘাত লেগে কাল থেকে শয্যাগত, উঠতে পারেন না। বলিয়া সে দুর্ঘটনার হেতু বিবৃত করিল।

দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি ত? চল ত কোন্ ঘরে তোমার বাবা আছেন আমাকে নিয়ে যাবে। আগে তাঁকে দেখে আসি গে, তারপর অন্য কাজ। এই বলিয়া তিনি সতীকে সঙ্গে করিয়া বন্দনার পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া রায়সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার পায়ের বেদনা বিশেষ ছিল না, ইঁহাদের দেখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিলেন।

দয়াময়ী হাত তুলিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বেইমশাই, পা ভাঙলো ক করে, কোথা ঢুকেছিলেন?

সতী ও বন্দনা উভয়েই অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, রায়সাহেব নিরীহ মানুষ, প্রতিবাদের সুরে বুঝাইতে লাগিলেন যে, কোথাও ঢুকিবার জন্য নয়, ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্মে বিনাদোষে এই দুর্গতি ঘটিয়াছে।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, যা হবার হয়েচে, এখন থাকুন দিন কতক মেয়েদের জিম্মায় ঘরে বন্ধ। পাছে একটা মেয়েতে শাসন করে না উঠতে পারে তাই আর একটিকে টেনে আনলুম বেয়াই। দুজনে পালা করে দিন কতক সেবা করুক।

রায়সাহেব তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং এই অনুগ্রহ ও সহানুভূতির জন্য বহু ধন্যবাদ দিলেন।

আবার দেখা হবে—যাই এখন হাত-পা ধুই গে, বলিয়া বিদায় লইয়া দয়াময়ী নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় মোটরে আসিয়া পৌঁছিল দ্বিজদাস ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র—বাসুদেব। মেজদির ছেলেকে বন্দনা সেদিন দেখিতে পায় নাই। সে ছিল পাঠশালায় এবং তাহার ছুটির পূর্ব্বেই বন্দনা বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। পিতামহীকে ছাড়িয়া বাসু থাকে না, তাই সঙ্গে আসিয়াছে এবং তাঁহারি সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া যাইবে।

কাকা পরিচয় করাইয়া দিলে বাসুদেব প্রণাম করিল। বন্দনার পায়ে জুতা দেখিয়া সে মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। আট-নয় বছরের ছেলে কিন্তু জানে সব।

বন্দনা সস্নেহে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে চিনতে পারলে না বাসু?

পেরেচি মাসিমা।

কিন্তু তুমি ত ছিলে তখন পাঁচ-ছ বছরের ছেলে—মনে থাকবার ত কথা নয় বাবা?

তবু মনে আছে মাসিমা, তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম। আমাদের বাড়ী থেকে তুমি রাগ করে চলে গেলে, আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে দেখতে পেলুম না।

রাগ করে চলে যাবার কথা তুমি কার কাছে শুনলে?

কাকাবাবু বলছিলেন ঠাকুরমাকে।

বন্দনা দ্বিজদাসের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাগ করার কথা আপনিই বা জানলেন কি করে?

দ্বিজদাস কহিল, শুধু আমিই নয়, বাড়ীর সবাই জানে। তা ছাড়া আপনি লুকোবার ত বিশেষ চেষ্টা করেননি।

বন্দনা বলিল, সবাই আমার রাগ করাটাই জানে, তার কারণটা কি জানে?

দ্বিজদাস বলিল, সবাই না জানুক আমি জানি। রায়সাহেবকে একলা টেবিলে খেতে দেওয়া হয়েছিল বলে।

বন্দনা বলিল, কারণটা যদি তাই-ই হয়, আমার রাগ করাটা আপনি উচিত বিবেচনা করেন?

দ্বিজদাস কহিল, করি। যদিচ তাঁদেরও আর কোন উপায় ছিল না।

আপনি আমার বাবার সঙ্গে বসে খেতে পারেন?

পারি। কিন্তু দাদা বারণ করলে পারিনে।

পারেন না! কিন্তু আপনাকে বারণ করার অধিকার দাদার আছে মনে করেন?

দ্বিজদাস বলিল, সে তাঁর ব্যাপার আমার নয়। আমার পক্ষে দাদার অবাধ্য হওয়া অনুচিত মনে করি।

বন্দনা কহিল, যা কর্ত্তব্য বলে বোঝেন তা করায় কি আপনার সাহস নেই?

দ্বিজদাস ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দেখুন এ ঠিক সাহস অ-সাহসের বিষয় নয়। স্বভাবতঃ আমি ভীতু লোক নই, কিন্তু দাদার প্রকাশ্য নিষেধ অবজ্ঞা করার কথা আমি ভাবতে পারিনে। ছেলে-বেলায় বাবার অনেক কথা আমি শুনিনি দণ্ডও পাইনি তা নয়, কিন্তু আমার দাদা অন্য প্রকৃতির মানুষ। তাঁকে কেউ কখন উপেক্ষা করে না।

উপেক্ষা করলে কি হয়?

কি হয় আমি জানিনে, কিন্তু আমাদের পরিবারে এ প্রশ্ন আজও ওঠেনি।

বন্দনা কহিল, মেজদির চিঠিতে জানি দেশের জন্যে আপনি অনেক কিছু করেন যা দাদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সে-সব করেন কি করে?

দ্বিজদাস কহিল, তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও তাঁর নিষেধের বিরুদ্ধে নয়। তা হলে পারতুম না।

বন্দনা মিনিট দুই-তিন নীরবে থাকিয়া কহিল, দিদির চিঠি থেকে আপনাকে যা ভেবেছিলুম তা আপনি ন'ন। এখন তাঁকে ভরসা দিতে পারব, তাঁদের ভয় নেই। আপনার স্বদেশ-সেবার অভিনয়ে মুখুয্যে বংশের বিপুল সম্পদের এক কণাও কোন-দিন লোকসান হবে না। দিদি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

দ্বিজদাস হাসিয়া বলিল, দিদির লোকসান হয় এই কি আপনি চান?

বন্দনা বিব্রত হইয়া কহিল, বাঃ—তা কেন চাইব। আমি চাই তাঁদের ভয় ঘুচুক, তাঁরা নির্ভয় হোন।

দ্বিজদাস কহিল, আপনার চিন্তা নেই, তাঁরা নির্ভয়েই আছেন। অন্ততঃ দাদার সম্বন্ধে একথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, ভয় বলে কোন বস্তু তিনি আজও জানেন না। ও তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, তার মানে ভয় জিনিসটা সবটুকু বাড়ীর সকলে মিলে আপনারাই ভাগ করে নিয়েচেন, তাঁর ভাগে আর কিছুই পড়েনি—এই ত?

শুনিয়া দ্বিজদাসও হাসিল, অনেকটা তাই বটে। তবে আপনাকেও বঞ্চিত করা হবে না, সামান্য যা অবশিষ্ট আছে সেটুকু আপনিও পাবেন। তিন-চারদিন একসঙ্গে আছেন এখনও তাঁকে চিনতে পারেননি?

বন্দনা কহিল, না। আপনার কাছ থেকে তাঁকে চিনতে শিখব আশা করে আছি।

দ্বিজদাস কহিল, তা হলে প্রথম পাঠ নিন। ঐ জুতো জোড়াটি খুলে ফেলুন।

চাকর আসিয়া বলিল, মা আপনাদের ওপরে ডাকচেন।

চলিতে চলিতে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ মা এসেচেন কেন?

দ্বিজদাস বলিল, প্রথম,—কৈলাস-যাত্রা সম্বন্ধে মামীদের সঙ্গে পরামর্শ করা, দ্বিতীয়,—আপনাকে বলরামপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। দেখবেন যেন না বলে বসবেন না।

বন্দনা বলিল, আচ্ছা তাই হবে।

দ্বিজদাস কহিল, মার সামনে আপনাকে মিস্ রায় বলা চলবে না। আপনি আমার বয়সে ছোট—বৌদিদির ছোট বোন—অতএব নাম ধরেই ডাকব। যেন রাগ করে আবার একটা কাণ্ড বাঁধাবেন না।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, না, রাগ করব কেন? আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন। কিন্তু আপনাকে ডাকবো কি বলে?

দ্বিজদাস বলিল, আমাকে দ্বিজবাবু বলেই ডাকবেন। কিন্তু দাদাকে মুখুয্যেমশাই বলা মানাবে না। তাঁকে সবাই বলে বড়দাদাবাবু—আপনাকে ডাকতে হবে বড়দাদা বলে। এই হ'ল আপনার দ্বিতীয় পাঠ।

কেন?

দ্বিজদাস বলিল; তর্ক করলে শেখা যায় না, মেনে নিতে হয়। পাঠ মুখস্থ হলে এর কারণ প্রকাশ করব, কিন্তু এখন নয়।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই কিন্তু নিজে আশ্চর্য্য হবেন।

দ্বিজদাস বলিল, হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু মা, বৌদিদি এরা বড় খুশী হবেন। এটা সত্যিই দরকার।

আচ্ছা তাই হবে।

সিঁড়ির একধারে জুতা খুলিয়া রাখিয়া বন্দনা দয়াময়ীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। পিছনে গেল দ্বিজদাস ও বাসুদেব। তিনি সিন্দুক খুলিয়া কি একটা করিতেছিলেন এবং কাছে দাঁড়াইয়া অন্নদা বোধ করি গৃহস্থালীর বিবরণ দিতেছিল। দয়াময়ী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া সহজ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গা ধোয়া, কাপড় ছাড়া হয়েচে মা?

হাঁ মা, হয়েচে।

তা হলে একবার রান্নাঘরে যাও মা। এতগুলি লোকের কি ব্যবস্থা বামুনঠাকুর করচে জানিনে — আমিও আহ্নিকটা সেরে যাচ্ছি।

বন্দনা নীরবে চাহিয়া রহিল, তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না, বলিলেন, দ্বিজুর শরীরটা ভালো নেই, সকালেও ও কিছু খেয়ে আসেনি। ওর খাবারটা যেন একটু শীগ্‌গির হয় মা। এই বলিয়া তিনি অন্নদাকে সঙ্গে করিয়া পূজার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন, বন্দনার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিলেন না।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ করল?

দ্বিজদাস কহিল, সামান্য একটু জ্বরের মত।

কি খাবেন এ বেলা?

দ্বিজদাস কহিল সাগু বার্লি ছাড়া যা দেবেন তাই।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, রান্নাঘরে যাব, শেষকালে কোন গোলযোগ ঘটবে না ত?

দ্বিজদাস বলিল, না। অন্নদাদিদি সেই পরিচয়ই বোধ হয় আপনার দিয়েচেন। ওঁর কথা মা কখন ঠেলতে পারবেন না—ভারি ভালবাসেন। ম্লেচ্ছ অপবাদটা বোধ করি আপনার কাটল।

বন্দনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, খুব আশ্চর্যের কথা।

দ্বিজদাস স্বীকার করিয়া বলিল, হাঁ। ইতিমধ্যে আপনি কি করেচেন, অন্নদা-দিদি কি কথা মাকে বলেচেন জানিনে কিন্তু আশ্চর্য হয়েচি আপনার চেয়েও ঢের বেশি আমি নিজে। কিন্তু আর দেরি করবেন না, যান, খাবার ব্যবস্থা করুন গে। আবার দেখা হবে। বলিয়া দুইজনে মায়ের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

কৈলাস তীর্থ-যাত্রায় পথের দুর্গমতার বিবরণ শুনিয়া মামীমা পিছাইয়াছেন, দয়াময়ীর নিজেরও বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না, তথাপি তাঁহার কলিকাতায় কাটিল পাঁচ-ছয়দিন দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট ও গঙ্গাস্নান করিয়া। কাজের লোকের হাতেই কাজের ভার পড়ে, এ-বাটীর প্রায় সমস্ত দায়িত্বই আসিয়া ঠেকিয়াছে বন্দনার কাছে। সতী কিছুই করে না, সকল ব্যাপারে বোনকে দেয় আগাইয়া, নিজে বেড়ায় শাশুড়ীর সঙ্গে ঘুরিয়া। তবু কোথাও বাহির হইতে হইলে তাহাকে ডাক দিয়া বলে, বন্দনা, আয় না ভাই আমাদের সঙ্গে। তুই সঙ্গে থাকলে কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে হয় না।

বিপ্রদাসেরও আজ-কাল করিয়া বাড়ী যাওয়া ঘটে নাই, মা কেবলি বাধা দিয়া বলেন, বিপিন চলিয়া গেলে তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবে কে? সেদিন সন্ধ্যায় তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, বিপ্রদাসকে ডাকাইয়া আনাইয়া উত্তেজনার সহিত বলিতে লাগিলেন, বিপিন, তুই যা বলিস্ বাবা, লেখা পড়া জানা মেয়েদের ধরণই আলাদা।

বিপ্রদাস বুঝিল, এ বন্দনার কথা। জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে মা?

দয়াময়ী বলিলেন, কি হয়েচে? আজ মস্ত একটা লালমুখো সার্জ্জেন এসে আমাদের গাড়ী আটকালে। ভাগ্যে মেয়েটা সঙ্গে ছিল, ইংরিজিতে কি দুকথা বুঝিয়ে বললে, সাহেব তক্ষণি গাড়ী ছেড়ে দিলে। নইলে কি হ'ত বল ত? হয়ত সহজে ছাড়ত না, নয়ত থানায় পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেত—কি বিভ্রাটই ঘটত। তোর নতুন পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা যেন জন্তু।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, কি করেছিলে তোমরা—ধাক্কা লাগিয়েছিলে?

বন্দনা আসিয়া দাঁড়াইল। দয়াময়ী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, তোমার কথা বিপিনকে তাই বলছিলুম মা, লেখা-পড়া জানা মেয়েদের ধরণই আলাদা! তুমি সঙ্গে না থাকলে সবাই আজ কি বিপদেই পড়তুম। কিন্তু সমস্ত দোষ সেই মেম বেটির। চালাতে জানে না তবু চালাবে। জানে না—তবু বাহাদুরি করবে।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, লেখা-পড়া জানা মেয়েদের ধরণই ঐ রকম মা। মেম-সাহেব নিশ্চয়ই লেখা-পড়া জানে।

মা ও বন্দনা দুজনেই হাসিলেন। বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই, সেটা মেমসাহেবের দোষ, লেখা-পড়ার নয়। মা, আমি রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসি গে। কাল দ্বিজুবাবুর আটার রুটি ঠাকুর শক্ত করে ফেলেছিল, তাঁর খাবার সুবিধে হয়নি। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দয়াময়ী স্নেহের চক্ষে সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, সকল দিকে দৃষ্টি আছে। কেবল লেখা-পড়াই নয় বিপিন, মেয়েটা জানে না এমন কাজ নেই। আর তেমনি মিষ্টি কথা। ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি—সংসারের কিচ্ছুটি চেয়ে দেখতে হয় না।

বিপ্রদাস কহিল, ম্লেচ্ছ বলে ঘেন্না কর না ত মা?

দয়াময়ী বলিলেন, তোর এক কথা! ম্লেচ্ছ হতে যাবে কিসের জন্যে—ওর মা একবার বিলেত গিয়েছিল বলেই লোকে মেমসাহেব বলে দুনাম রটালে। নইলে আমার মতই বাঙালী ঘরের মেয়ে। বন্দনা জুতো পরে—তা পরলেই বা। বিদেশে অমন সবাই পরে। লোকজনের সামনে বার হয়—তাতেই বা দোষ কি। বোম্বায়ে ত আর ঘোমটা দেওয়া নেই—ছেলে-বেলা থেকে যা শিখেচে তাই করে। আমার যেমন বৌমা তেমনি ও। বাপের সঙ্গে চলে যাবে বলচে—শুনলে মন কেমন করে বাবা।

বিপ্রদাস কহিল, মন কেমন করলে চলবে কেন মা? বন্দনা থাকতে আসেনি—দুদিন পরে ওকে যেতে ত হবেই।

দয়াময়ী কহিলেন, যাবে সত্যি, কিন্তু ছেড়ে দিতে মন চায় না—ইচ্ছে করে চিরকাল ধরে রেখে দিই।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, সে তো আর সত্যিই হবার যো নেই মা—পরের মেয়েকে অত জড়িও না। দুদিনের জন্যে এসেচে সেই ভালো। বলিয়া সে কিছু অন্যমনস্কের মত বাহিরে চলিয়া গেল।

কথাটা দয়াময়ীর বেশ মনঃপুত হইল না। কিন্তু সে ক্ষণকালের ব্যাপার মাত্র। বলরামপুরে ফিরিবার কেহ নাম করেন না, তাঁহাদের দিনগুলো কাটিতে লাগিল যেন উৎসবের মত—হাসিয়া গল্প করিয়া এবং চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া। সকলের সঙ্গেই হাস্য পরিহাসে এতটা হাল্কা হইতে দয়াময়ীকে ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই—তাঁহার অন্তরে কোথায় যেন একটা আনন্দের উৎস নিরন্তর প্রবাহিত হইতে-ছিল, তাঁহার বয়স ও প্রকৃতি-সিদ্ধ গাম্ভীর্য্যকে সেই স্রোত মাঝে মাঝে যেন

ভাসাইয়া দিতে চায়। সতীর সঙ্গে আভাস-ইঙ্গিতে প্রায়ই কি কথা হয়, তাহার অর্থ শুধু শাশুড়ী-বধূই বুঝে, আরও একজন হয়ত কিছু-একটা অনুমান করে সে অন্নদা। সস্ত্রীক পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টার সাহেব এতদিন থাকিয়া কাল বাড়ী গিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের নামই বসন্ত, এই লইয়া দয়াময়ী যাইবার সময়ে কৌতুক করিয়াছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছেন যে, কর্ম্মস্থলে ফিরিবার পূর্ব্বে আবার দেখা দিয়া যাইতে হইবে। হয় কলিকাতায়, নয় বলরামপুরে। রায়সাহেবের পা ভাল হইয়াছে, আগামী সপ্তাহে তিনি বোম্বাই যাত্রা করিবেন, দয়াময়ী নিজে দরবার করিয়া বন্দনার কিছু দিনের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন, সে যে বোম্বায়ের পরিবর্ত্তে বলরামপুরে গিয়া অন্ততঃ আরও একটা মাস দিদির কাছে অবস্থান করিবে এ ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে।

মুখুয্যেদের মামলা মকদ্দমা হাইকোর্টে লাগিয়াই থাকে, একটা বড়রকম মামলার তারিখ নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, তাই বিপ্রদাস স্থির করিল আর বাড়ী না গিয়া এই দিনটা পার করিয়া দিয়া সকলকে লইয়া দেশে ফিরিবে। নানা কাজে তাহাকে সর্ব্বদাই বাহিরে থাকিতে হয়, আজ ছিল রবিবার, দয়াময়ী আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, একটা মজার কথা শুনেচিস্ বিপিন?

বিপ্রদাস আদালতের কাগজ দেখিতেছিল, চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কি কথা মা?

দয়াময়ী বলিলেন, দ্বিজুদের কি-একটা হাঙ্গামার মিটিং ছিল আজ, পুলিশে হতে দেবে না, আর ওরা করবেই। লাঠালাঠি মাথা ফাটা-ফাটি হ'তই, শুনে ভয়ে মরি—

সে গেছে নাকি?

না। সেই কথাই ত তোকে বলতে এলুম। কারও মানা শুনবে না, এমন কি ওর বৌদিদির কথা পর্য্যন্ত না, শেষে শুনতে হ'ল বন্দনার কথা।

খবরটা যত মজারই হোক মায়ের সুপরিচিত মর্য্যাদার কোথায় যেন একটু ঘা দিল। বিপ্রদাস মনে মনে বিস্মিত হইয়াও মুখে শুধু বলিল, সত্যি নাকি?

দয়াময়ী হাসিয়া জবাব দিলেন, তাই ত হ'ল দেখলুম। কবে নাকি ওদের সর্ত্ত হয়েছিল এখানে একজন জুতো পরবে না, চাল-চলনে এ বাড়ীর নিয়ম লঙ্ঘন করবে না, আর তার বদলে অন্যজনকে তার অনুরোধ মেনে চলতে হবে। বন্দনা ওর ঘরে ঢুকে শুধু বললে, দ্বিজুবাবু, সর্ত্ত মনে আছে ত? আপনি কিছুতেই আজ যেতে পারবেন না। দ্বিজু স্বীকার করে বললে, বেশ তাই হবে, যাব না। শুনে আমার ভাবনা ঘুচল বিপিন। কি করে আসবে, কি ফ্যাসাদ বাধবে—কর্ত্তা বেঁচে নেই, কি ভয়ে ভয়েই যে ওকে নিয়ে থাকি তা বলতে পারিনে।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। মা বলিতে লাগিলেন, আগে তবু ওর ইস্কুল-কলেজ, পড়া-শুনা, একজামিন-পাশ করা ছিল, এখন সে বালাই ঘুচেচে, হাতে কাজ না থাকলে বাইরের কোন্ ঝঞ্ঝাট যে কখন ঘরে টেনে আনবে তা কেউ বলতে পারে না। ভাবি শেষ পর্য্যন্ত এত বড় বংশের ও একটা কলঙ্ক হয়ে না দাঁড়ায়।

বিপ্রদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কহিল, না, না, সে ভয় ক'র না, দ্বিজু কলঙ্কের কাজ কখন করবে না।

মা বলিলেন, ধর্ যদি হঠাৎ একটা জেল হয়েই যায়? সে আশঙ্কা কি নেই?

বিপ্রদাস কহিল, আশঙ্কা আছে জানি কিন্তু জেলের মধ্যে ত কলঙ্ক নেই মা, কলঙ্ক আছে কাজের মধ্যে। তেমন কাজ কোনদিন করবে না। ধর যদি আমারি কখন জেল হয়—হতেও ত পারে, তখন কি আমার জন্যে তুমি লজ্জা পাবে মা? বলবে কি বিপিন আমার বংশের কলঙ্ক?

কথাটা দয়াময়ীকে শূল বিদ্ধ করিল। কি জানি কোন নিহিত ইঙ্গিত নাই ত? এই ছেলেটিকে বুকে করিয়া এত বড় করিয়াছেন, বেশ জানিতেন, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য বিপ্রদাস পারে না এমন কাজ নাই। কোন বিপদ, কোন ফলাফলই সে গ্রাহ্য করে না অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে। যখন তাহার মাত্র আঠারো বৎসর বয়স তখন একটি মুসলমান-পরিবারের পক্ষ লইয়া সে একাকী এমন কাণ্ড করিয়াছিল যে কি করিয়া প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিল তাহা আজও দয়াময়ীর সমস্যার ব্যাপার। বন্দনার মুখে সেদিনকার ট্রেনের ঘটনা শুনিয়া তিনি শঙ্কায় একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিজুর জন্য তাঁহার উদ্বেগ আছে সত্য, কিন্তু অন্তরের ঢের বেশি ভয় আছে তাঁহার এই বড় ছেলেটির জন্য। মনে মনে ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিলেন। বিপ্রদাস কহিল, কেমন মা, কলঙ্কের দুর্ভাবনা গেল ত? জেল হঠাৎ একদিন আমারও হয়ে যেতে পারে যে!

দয়াময়ী অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, বালাই ষাট! ও-সব অলক্ষুণে কথা তুই বলিসনে বাবা। তার পরেই কহিলেন, জেল হবে তোর আমি বেঁচে থাকতে? এতদিন ঠাকুর-দেবতাকে ডেকেচি তবে কেন? এত সম্পত্তি রয়েচে কিসের জন্যে? তার আগে সর্ব্বস্ব বেচে ফেলব, তবু এ ঘটতে দেব না বিপিন।

বিপ্রদাস হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল। দয়াময়ী সহসা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, দ্বিজুর যা হয় তা হোক গে, কিন্তু তুই আমার চোখের আড়াল হলে আমি গঙ্গায় ডুবে মরব বিপিন! এ সইতে আমি পারব না, তা জেনে রাখিস্। বলিতে বলিতে কয়েক ফোঁটা জল তাঁহার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

মা এ-বেলা কি—, বলিতে বলিতে বন্দনা ঘরে ঢুকিল। দয়াময়ী তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন, বন্দনার বিস্মিত মুখের প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, ছেলেটাকে অনেকদিন বুকে করিনি তাই একটু সাধ হ'ল নিতে।

বন্দনা কহিল, বুড়ো ছেলে—আমি কিন্তু সকলকে বলে দেব।

দয়াময়ী প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, তা দিও কিন্তু বুড়ো কথাটি মুখে এনো না মা। এই ত সেদিনের কথা, বিয়ের কনে উঠানে এসে দাঁড়িয়েচি, আমার পিসশাশুড়ী তখনও বেঁচে, বিপিনকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার বড়ছেলে বৌমা। কাজ-কর্ম্মের ভিড়ে অনেকক্ষণ কিছু খেতে পায়নি—আগে খাইয়ে ওকে ঘুম পাড়াও গে, তার পর হবে অন্য কাজ। তিনি বোধ হয় দেখতে চাইলেন আমি পারি কি না—কি জানি পেরেচি কিনা। বলিয়া তিনি আবার হাসিলেন।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তখন কি করলেন মা?

দয়াময়ী বলিলেন, ঘোমটার ভেতর থেকে চেয়ে দেখি একতাল সোনা দিয়ে গড়া জ্যান্ত পুতুল, বড় বড় চোখ মেলে আশ্চর্য্য হয়ে আমার পানে তাকিয়ে আছে। বুকে করে নিয়ে দিলুম ছুট। আচার-অনুষ্ঠান তখন অনেক বাকি, সবাই হৈ চৈ করে উঠলো, আমি কিন্তু কান দিলুম না। কোথায় ঘর, কোথায় দোর চিনিনে—যে দাসীটি সঙ্গে দৌড়ে এসেছিল সে ঘর দেখিয়ে দিলে, তাকেই বললুম, আন ত ঝি আমার খোকার দুধের বাটি, ওকে না খাইয়ে আমি একপা নড়ব না। সেদিন পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েরা কেউ বললে বেহায়া, কেউ আর কত কি, আমি কিন্তু গ্রাহ্যই করলুম না। মনে মনে বললুম, বলুক গে ওরা। যে রত্ন কোলে পেলুম তাকে ত আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমার সেই ছেলেকে তুমি বল কিনা বুড়ো!

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা স্মরণ করিতে অশ্রুজল ও হাসিতে মিশিয়া মুখখানি তাঁহার বন্দনার চোখে অপূর্ব্ব হইয়া দেখা দিল, অকৃত্রিম স্নেহের সুগভীর তাৎপর্য্য এমন করিয়া উপলব্ধি করার সৌভাগ্য তাহার আর কখন ঘটে নাই। অভিভূত চক্ষে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সে আপনাকে সামলাইয়া লইল, হাসিয়া বলিল, মা, আপনার দুটি ছেলের মধ্যে কোন্‌টিকে বেশি ভালবাসেন সত্যি করে বলুন ত?

শুনিয়া দয়াময়ীও হাসিলেন, বলিলেন, অসম্ভব সত্যি হলেও বলতে নেই মা, শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

বন্দনা বাইরের লোক, সবে মাত্র পরিচয় হইয়াছে, ইহার সুমুখে এই সকল পূর্ব্ব কথার আলোচনায় বিপ্রদাস অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, কহিল, বললেও তুমি বুঝবে না বন্দনা, তোমার কলেজের ইংরিজি পুঁথির মধ্যে এ-সব তত্ত্ব নেই; তার সঙ্গে

মিলিয়ে যাচাই করতে গিয়ে মায়ের কথা তোমার ভারি অদ্ভুত ঠেকবে। এ আলোচনা থাক।

শুনিয়া বন্দনা খুশী হইল না, কহিল, ইংরিজি পুঁথি আপনিও ত কম পড়েননি মুখুয্যেমশাই, আপনিই বা তবে বোঝেন কি করে?

বিপ্রদাস বলিল, কে বললে মাকে আমরা বুঝি বন্দনা—বুঝিনে। এ-সব তত্ত্ব শুধু আমার এই মায়ের পুঁথিতেই লেখা আছে—তার ভাষা আলাদা, অক্ষর আলাদা, ব্যাকরণ আলাদা। সে কেবল উনি নিজেই বোঝেন—আর কেউ না। হাঁ মা, যা বলতে এসেছিলে সে ত এখন বললে না?

বন্দনা বুঝিল এ ইঙ্গিত তাহাকে। কহিল, মা, এ-বেলার রান্নার কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম—আমি যাই, কিন্তু আপনিও একটু শীঘ্র করে আসুন। সব ভুলে গিয়ে আবার যেন ছেলে কোলে করে বসে থাকবেন না। বলিয়া বিপ্রদাসকে সে একটু কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে দয়াময়ীর মুখের 'পরে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধার কণ্ঠে কহিলেন, বিপিন তুই ত খুব ধার্ম্মিক, জানিস্ ত বাবা, মাকে কখনও ঠকাতে নেই।

বিপ্রদাস বলিল, দোহাই মা, অমন করে তুমি ভূমিকা ক'র না। কি জিজ্ঞাসা করবে কর।

দয়াময়ী কহিলেন, তুই হঠাৎ আজ ও-কথা বললি কেন যে তোরও জেল হতে পারে? কৈলাসে যাবার সঙ্কল্প এখনও ত্যাগ করিনি বটে, কিন্তু আর ত আমি এক পাও নড়তে পারব না বিপিন।

বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কৈলাসে পাঠাতে আমিও ব্যস্ত নই মা, কিন্তু সে দোষ আমার ঘাড়ে শেষকালে যেন চাপিও না। ওটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত—দ্বিজুর কথায় তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলুম যে কেবল জেলে যাবার জন্যই কারও বংশে কলঙ্ক পড়ে না।

দয়াময়ী মাথা নাড়িলেন—ওতে আমি ভুলব না বিপিন। এলোমেলো কথা বলার লোক তুই নয়—হয় কি করেচিস্, নয় কি-একটা করার মতলবে আছিস্, আমাকে সত্যি করে বল্।

বিপ্রদাস কহিল, তোমাকে সত্যি করেই বলচি আমি কিছুই করিনি। কিন্তু মানুষের মধ্যে কত রকমের মতলব আনাগোনা করে তার কি কোন সঠিক নির্দ্দেশ দেওয়া চলে মা?

দয়াময়ী পূর্ব্বের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তাও না। নইলে তোকে দেখলেই কেন আজকাল আমার এমন মন-কেমন করে? তোকে মানুষ করেচি, আমি বেঁচে থাকতেই শেষকালে এতবড় নেমকহারামি করবি বাবা? বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চোখ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বিপ্রদাস বিপন্ন হইয়া বলিল, অমঙ্গল কল্পনা করে যদি তুমি মিথ্যে ভয় পাও মা, আমি তার কি প্রতিকার করতে পারি বল? তুমি ত জান তোমার অমতে কখন একটা কাজও আমি করিনে।

দয়াময়ী বলিলেন, কর না সত্যি, কিন্তু কাল দ্বিজুকে ডেকে পাঠিয়ে কেন বলেচ কাজ-কর্ম্ম সমস্ত বুঝে নিতে?

বড় হল, আমাকে সাহায্য করবে না?

দয়াময়ী রাগ করিয়া বলিলেন, ওর কতটুকু শক্তি? আমাকে ভোলাসনে বিপিন, তুই আজ এত ক্লান্ত যে তোর প্রয়োজন হ'ল ওর সাহায্য নেবার? কি তোর মনে আছে আমাকে খুলে বল্?

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল, এ কথা বলিল না যে. তিনি নিজেই এইমাত্র দ্বিজদাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে তাহাকে বলিতেছেন। কিন্তু ইহারই আভাস পাওয়া গেল দয়াময়ীর পরবর্ত্তী কথায়। বলিতে লাগিলেন, আমাদের এ পুণ্যের সংসার, ধর্ম্মের পরিবার, এখানে অনাচার সয় না। আমাদের বাড়ী নিয়মের কড়াকড়িতে বাঁধা। তোর বিয়ে দিয়েছিলুম আমি সতেরো বছর বয়সে—সে তোর মত নিয়ে নয়-- আমাদের সাধ হয়েছিল বলে। কিন্তু দ্বিজু বলে সে বিয়ে করবে না। ও এম. এ. পাশ করেচে, ওর ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি হয়েচে, ওর ওপর কারও জোর খাটবে না। সে যদি সংসারী না হয় তাকে আমার বিশ্বাস নেই, আমার শ্বশুরের বিষয় সম্পত্তিতে সে যেন হাত দিতে না আসে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজু কবে বললে সে বিয়ে করবে না?

প্রায়ই ত বলে, বিয়ে করবার লোক অনেক আছে তারা করুক। ও করবে শুধু দেশের কাজ। তোরা ভাবিস্ এখানে এসে পর্য্যন্ত আমি দিনরাত ঘুরে বেড়াই—খুব মনের সুখে আছি। কিন্তু সুখে নেই। এর ওপর তুই দিলি আজ জেলের দৃষ্টান্ত—যেন আমাকে বোঝাবার আর কোন দৃষ্টান্তই তোর হাতে ছিল না। একদিন কিন্তু টের পাবি বিপিন।

বিপ্রদাস কহিল, ওর বৌদিদিকে হুকুম করতে বল না মা?

তার কথাও সে শুনবে না।

শুনবে মা, শুনবে। সময় হলেই শুনবে। একটু হাসিয়া কহিল, আর যদি আমাকে আদেশ কর ত তার পাত্রীর সন্ধান করতে পারি।

বন্দনা হাসিয়া ঘরে ঢুকিল, অনুযোগের সুরে কহিল, কৈ এলেন না ত? আমি কতক্ষণ ধরে বসে আছি মা।

চল মা, যাচ্ছি।

বিপ্রদাস কহিল, আমাদের অক্ষয়বাবুর সেই মেয়েটিকে তোমার মনে আছে মা? এখন সে বড় হয়েচে। মেয়েটি যেমন রূপে তেমনি গুণে। আমাদের স্ব-ঘর, বল ত গিয়ে দেখে আসি, কথাবার্তা বলি। আমার বিশ্বাস দ্বিজুর অপছন্দ হবে না।

না না, সে এখন থাক্, বলিয়া দয়াময়ী পলকের জন্য একবার বন্দনার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, সতীর হচ্ছে না - না বিপিন, বৌমাকে জিজ্ঞেসা না করে সেসব কিছু করে কাজ নেই।

বন্দনা কথা কহিল। সুন্দর শান্ত চোখে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তাকে দোষ কি মা? এই ত কলকাতায়, চলুন না, দিদিকে নিয়ে আমরা গিয়ে দেখে আসি গে।

শুনিয়া দয়াময়ী বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কি যে জবাব দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

বিপ্রদাস কহিল, এ উত্তম প্রস্তাব মা। অক্ষয়বাবু স্বধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতের অধ্যাপক। মেয়েকে ইস্কুল কলেজ থেকে পাশ করাননি বটে, কিন্তু যত্ন করে শিখিয়েচেন অনেক। একদিন এঁদের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, সেদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেছিলুম আমি অনেক কথা। মনে হয়েছিল, বাপ সাধ করে মেয়ের নামটি যে রেখেছিলেন মৈত্রেয়ী তা অসার্থক হয়নি। যাও না মা, গিয়ে একবার তাকে দেখে আসবে তোমার বড়বৌ অন্ততঃ মনে মনে স্বীকার করবেন তিনি ছাড়াও সংসারে রূপসী মেয়ে আছে।

মা হাসিতে চাহিলেন, কিন্তু হাসি আসিল না, মুখে কথাও যোগাইল না—বন্দনা পুনশ্চ অনুরোধ করিল, চলুন না মা, আমরা গিয়ে একবার মৈত্রেয়ীকে দেখে আসি গে? বেশি দূর ত নয়।

দয়াময়ী চাহিয়া দেখিলেন বন্দনার মুখের পরে এখন সে লাবণ্য আর নাই, যেন ছায়ায় ঢাকা দিয়াছে। এইবার এতক্ষণে তিনি জবাব খুঁজিয়া পাইলেন, কহিলেন, না মা, দূর বেশি নয় জানি, কিন্তু সে সময় আমার নেই। চল আমরা যাই,—এ বেলায় কি রান্না হবে দেখি গে। বলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহিরে গেলেন।

১৩

সন্ধ্যা-বন্দনা সারিয়া বিপ্রদাস এইমাত্র নিজের লাইব্রেরী-ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। সকালের ডাকে যে-সকল দলিলপত্র বাড়ী হইতে আসিয়াছে সেগুলা দেখা প্রয়োজন, এমনি সময়ে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন—হাঁ রে বিপিন, তুই কি বাড়িয়েই বলতে পারিস!

বিপ্রদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কিসের মা?

অক্ষয়বাবুর মেয়ে মৈত্রেয়ীকে আমরা যে দেখে এলুম।

মেয়েটি কি মন্দ?

দয়াময়ী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, না মন্দ বলিনে—সচরাচর এমন মেয়ে চোখে পড়ে না সে সত্যি, কিন্তু তাই বলে আমার বৌমার সঙ্গে তার তুলনা করলি? বৌমার কথা থাক্, কিন্তু রূপে বন্দনার কাছেই কি দাঁড়াতে পারে?

বিপ্রদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তবে বুঝি তোমরা আর কাউকে দেখে এসেচ। সে মৈত্রেয়ী নয়।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, তাই বটে! আমাদের সঙ্গে তার কত কথা হ'লো, কি যত্ন করেই না সে বৌমাদের খাওয়ালে—তার পরে কত বই, কত লেখা-পড়ার কথা-বার্তা বন্দনার সঙ্গে তার হ'লো, আর তুই বলিস আমরা আর কাকে দেখে এসেছি!

বিপ্রদাস বলিল, বন্দনার সব প্রশ্নের সে হয়ত জবাব দিতে পারেনি, কিন্তু মা লেখা-পড়ায় বন্দনা ইস্কুল কলেজে কত বই পড়ে কতগুলো পরীক্ষা পাশ করেচে, আর তার শুধু বাপের কাছে ঘরে বসে শেখা। এই যেমন আমার সঙ্গে তোমার ছোটছেলের তফাৎ!

শুনিয়া দয়াময়ীর দুই চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল—চুপ কর্ বিপিন, চুপ কর্। দ্বিজু ও-ঘরে আছে, শুনতে পেলে লজ্জায় বাড়ী ছেড়ে পালাবে। একটু থামিয়া বলিলেন, তোর মা মুখ্যু বলে কি এতই মুখ্যু যে কলেজের পাশ করাকেই চতুর্ব্বর্গ ভাববে? তা নয় রে, বরঞ্চ ছোট ছোট কথায় মিষ্টি করে সে বন্দনার সকল কথারই জবাব দিয়েচে। গাড়ীতে আসতে আসতে মেয়েটির কত প্রশংসাই বন্দনা করলে। কিন্তু আমি বলি আমাদের গেরস্ত-ঘরে দরকার কি বাপু অত লেখা-পড়ায়? আমার একটা

বৌ যেমন হয়েচে আর একটি তেমনি হলেই আমার চলে যাবে। নইলে বিদ্যের গুমোরে সে যে মনে মনে গুরুজনদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে সে হবে না।

বিপ্রদাস বুঝিল জেরার জবাবটা মায়ের এলো-মেলো হইয়া যাইতেছে, হাসিয়া কহিল, সে ভয় ক'রো না মা। বিদ্যা যাদের কম, গুমোর হয় তাদেরই বেশি, ও বাপের কাছে সত্যি সত্যিই যদি কিছু শিখে থাকে আচার-আচরণে সকলের নিচু হয়েই থাকবে তুমি দেখ।

যুক্তিটা মা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, বলিলেন, একথা তোর সত্যি, কিন্তু আগে থেকে জানব কি করে বল? তা ছাড়া, আমাদের পাড়াগাঁয়ে বিদ্যের কমবেশী কেউ যাচাই করতে আসে না, কিন্তু বৌ দেখতে এসে সকলে যে নাক তুলে বলবে বুড়ো-মাগীর কি চোখ ছিল না যে অমন বৌয়ের পাশে এই বৌ এনে দাঁড় করালে। এ আমার সইবে না বাবা।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু অক্ষয়বাবুকে ত একটা জবাব দিতে হবে মা। সেদিন তাঁকে ভরসা দিয়েছিলুম, আমার মায়ের বোধ হয় অমত হবে না।

শুনিয়া দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ও কথা না বললেই ভাল হ'ত বিপিন। তা সে যাই হোক, বৌমার মত কি হচ্ছে আগে শুনি, তার পরে তাঁকে বললেই হবে।

বিপ্রদাস কহিল, অক্ষয়বাবু আমাদের নিতান্ত পর নয়। এতদিন পরিচয় ছিল না বলেই তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আত্মীয়তার জন্যেও বলিনে, কিন্তু তোমার আর এক ছেলের যখন বিয়ে দিয়েছিলে, নিজের ইচ্ছেতেই দিয়েছিলে, অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতে যাওনি। আর এর বেলাতেই কি যত মত-জানাজানির দরকার হ'ল মা?

তর্কে হারিয়া দয়াময়ী হাসিমুখে বলিলেন, কিন্তু এখন যে বুড়ো হয়েচি বাবা, আর কতকাল বাঁচব বল ত? কিন্তু চিরকাল যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে তার মত না নিয়ে বিয়ে দিতে পারি? না না, দু'দিন আমাদের তুই ভাবতে সময় দে! বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়া দয়াময়ী নিজের ঘরের দিকে না গিয়া বেহাইয়ের ঘরের উদ্দেশে চলিলেন। এই কয়েক দিনের ঘনিষ্ঠতায় বন্দনার পিতার কাছে তাঁহার অনেকটা সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছিল, প্রায়ই নিজে আসিয়া তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেন—এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, আহ্নিকে বসিলে শীঘ্র উঠিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন—কেমন আছেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। ঘরের অপর প্রান্তে বসিয়া একটি সুদর্শন যুবক বন্দনার সহিত মৃদুকণ্ঠে গল্প করিতেছিল, নিখুঁত সাহেবি পোষাকের এই অপরিচিত

লোকটির সম্মুখে হঠাৎ আসিয়া পড়ায় দয়াময়ী সলজ্জে পিছাইয়া যাইবার উপক্রমেই রায়সাহেব বলিয়া উঠিলেন, কোথায় পালাচ্চেন বেয়ান, ও যে আমাদের সুধীর। ওকে লজ্জা কিসের? ও ত বিপ্রদাস দ্বিজদাসের মতই আপনার ছেলে। আমার অসুখের খবর পেয়ে মাদ্রাজ থেকে দেখতে এসেচে। সুধীর, ইনি বন্দনার দিদির শাশুড়ী - বিপ্রদাসের মা, এঁকে প্রণাম কর।

সুধীরের প্রণাম করার অভ্যাস নাই, ও পোষাকে করাও কঠিন, সে কাছে আসিয়া মাথা নোয়াইয়া কোনমতে আদেশ পালন করিল।

এই ছেলেটির সহিত দয়াময়ীর সন্তান-সম্বন্ধ যে কি সূত্রে হইল তাহা বুঝাইবার জন্য রায়সাহেব বলিতে লাগিলেন, ওর বাপ আর আমি এক সঙ্গে বিলাতে পড়েছিলুম বেয়ান, তখন থেকেই আমার পরম বন্ধু। সুধীর নিজেও বিলাতে অনেকগুলো পাশ করে মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগের ভাল চাকরি পেয়েচে। কথা আছে ওদের বিয়ের পরে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ও বন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে আবার বিলেতে বেড়াতে যাবে, সেখানে ইচ্ছে হয় বন্দনা কলেজে ভর্ত্তি হবে, না হয় দেশ দেখেই দুজনে ফিরে আসবে। ভাখো সুধীর, তোমরা যদি এই আগষ্ট সেপ্টেম্বরেই যাওয়া স্থির করতে পার আমিও না হয় মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে একবার ঘুরে আসি। কি বলিস্ রে বুড়ি, ভাল হয় না?

বন্দনা সেখান হইতেই আস্তে আস্তে বলিল, কেন হবে না বাবা, তুমি সঙ্গে থাকলে ত ভালই হয়।

রায়সাহেব উৎসাহ-ভরে কহিলেন, তাতে আরও একটা সুবিধে এই হবে যে, তোদের বিয়ের পরেও মাস-খানেক সময় পাওয়া যাবে, কোনরকম তাড়া-হুড়ো করতে হবে না। বুঝলে না সুধীর সুবিধেটা?

ইহাতে সুধীর ও বন্দনা উভয়েই মাথা নাড়িয়া সায় দিল। দয়াময়ী এতক্ষণে বুঝিলেন এই ছেলেটি রায়সাহেবের ভাবী জামাতা। অতএব তাঁহারও পুত্র-স্থানীয়। বুকের ভিতরটায় হঠাৎ একবার তোলপাড় করিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি বিপ্রদাসের মা, বলরামপুরের বহুখ্যাত মুখুয্যে পরিবারের কর্ত্রী, মুহূর্ত্তে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুধীর, তোমাদের বাড়ী কোথায় বাবা?

সুধীর কহিল, এখন বোম্বায়ে। কিন্তু বাবার মুখে শুনেচি আগে ছিল দুর্গাপুরে, কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানে বোধ করি আমাদের আর কিছু নেই।

কোন দুর্গাপুর সুধীর? বর্দ্ধমান জেলার?

সুধীর বলিল, হাঁ, বাবার মুখে তাই শুনেচি। কালনার কাছে কোন্ একটি ছোট্ট গ্রাম, এখন নাকি সে দেশ ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

দয়াময়ী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার বাবার নামটি কি ?

সুধীর বলিল, আমার বাবার নাম শ্রীরামচন্দ্র বসু।

দয়াময়ী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতামহর নাম কি ছিল হরিহর বসু ?

প্রশ্ন শুনিয়া রায়সাহেব পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বলিলেন, আপনি কি ওদের জানেন নাকি ?

হাঁ, জানি। দুর্গাপুরে আমার বাড়ী। ছেলে-বেলায় দিদিমার কাছে মানুষ হয়েচি বলে ও-গ্রামের প্রায় সকলকেই চিনি। ওঁদের বাড়ী ছিল আমাদের পাড়ায়। কিন্তু এখন আর কথা কইবার সময় নেই সুধীর, আমার আহ্নিকের দেরি হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু কিছু না খেয়েই যেন তুমি চলে যেও না—আমি এখনি সমস্ত ঠিক করে দিতে বলচি।

সুধীর সহাস্যে কহিল, তার আর বাকি নেই, বিপ্রদাসবাবু আগেই সে কাজ সমাধা করে দিয়েছেন।

দিয়েচে ? আচ্ছা তা হলে এখন আমি আসি, বলিয়া দয়াময়ী বাহির হইয়া গেলেন। বন্দনার প্রতি একবার চাহিলেন না, একটা কথাও বলিলেন না।

পর'দন সকালে স্নান-আহ্নিক সারিয়া বিপ্রদাস প্রতিদিনের অভ্যাসমত মায়ের পদধূলির জন্ত আজও তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল তাঁহার জিনিষ-পত্র বাঁধা-ছাঁদা হইতেছে।

এ কি মা, কোথাও যাবে নাকি ?

দয়াময়ী বলিলেন, তোকে খুঁজে পেলুম না, তাই দত্তমশাইকে জিজ্ঞেসা করে জানলুম সাড়ে নটার গাড়িতে বার হতে পারলে সন্ধ্যার আগেই বাড়ী পৌছতে পারব। কিন্তু পরশু তোর মকদ্দমার দিন, তুই ত সঙ্গে যেতে পারবিনে, দ্বিজুকে বলে দে, ও আমাদের পৌছে দিয়ে আসুক।

বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল মায়ের দুই চোখ রাঙা, মুখ শুষ্ক, দেখিলে মনে হয় সারারাত্রি তাঁহার উপর দিয়া একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

বিপ্রদাস সভয়ে প্রশ্ন করিল, হঠাৎ কি কোন দরকার পড়েছে মা ?

মা বলিলেন, দুদিনের জন্যে এসে আট-দশদিন কেটে গেল, ওদিকে ঠাকুর-সেবার কি হচ্চে জানিনে, পাঁচ-ছয়টি গরুর প্রসব হবার সময় হয়েচে দেখে এসেচি, তাদের কি হল খবর পাইনি; বাসুর পাঠশালা কামাই হচ্ছে—আর ত দেরি করা চলে না বিপিন।

এ-সকল ব্যাপার দয়াময়ীর কাছে তুচ্ছ নয় সত্য, কিন্তু আসল কারণটা তিনি প্রকাশ করিলেন না, বিপ্রদাস তাহা বুঝিয়াই বলিল, তবু কি আজ না গেলে নয় মা?

না বাবা, তুই আমাকে বাধা দিসনে। দ্বিজুকে সঙ্গে যেতে বলে দে, না হয় আর কেউ আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।

তাই হবে মা, বলিয়া বিপ্রদাস পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া গেল। নিজের শোবার ঘরে আসিয়া দেখিল সতী অত্যন্ত ব্যস্ত এবং কাছে বসিয়া অন্নদা সন্দেশের হাঁড়ি, ফল-মূল ও ছেলের দুধের ঘটি গুছাইয়া ঝুড়িতে তুলিতেছে।

সতী মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাস বলিল, অন্নদাদিদি, ব্যাপার কি জান?

না দাদা, কিছুই জানিনে। সকালে মা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন ছেলে-বৌয়ের গাড়ীতে খাবার কষ্ট না হয়, তিনি নটার ট্রেনে বাড়ী যাবেন।

বিপ্রদাস সতীকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সেও মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে কিছুই জানে না।

শুনিয়া বিপ্রদাস স্তব্ধ হইয়া রহিল। অন্নদা না জানিতেও পারে, কিন্তু বৌ জানে না শাশুড়ীর কথা এমন বিষয় কি আছে? কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়াইয়া সে নীচে চলিয়া গেল, উদ্বেগের সহিত ইহাই ভাবিতে ভাবিতে গেল, এ-সকল মায়ের একান্ত স্বভাব-বিরুদ্ধ। কি জানি কোন্ গভীর দুঃখ তাঁহার এই বিপর্য্যস্ত আচরণের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিল যাহা কাহারও কাছে তিনি প্রকাশ করিলেন না।

দয়াময়ী যাত্রা করিয়া যখন নীচে নামিলেন, তখন ট্রেনের অনেক সময় বাকি, কিন্তু কিছুতেই আজ তাঁহার বিলম্ব সহে না, কোনমতে বাহির হইতে পারিলেই বাঁচেন। সম্মুখে মোটর প্রস্তুত, আর একটায় জিনিষ-পত্র চাপাইয়া চাকরেরা উঠিয়া বসিয়াছে, ব্যাগ-হাতে বিপ্রদাসকে আসিতে দেখিয়া তিনি বিস্ময়কর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, দ্বিজু কই?

বিপ্রদাস কহিল, সে যাবে না মা, আমিই তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব।

কেন, যেতে রাজি হ'ল না বুঝি?

বিপ্রদাস সবিনয়ে কহিল, তাকে এমন কথা তোমার বলা উচিত নয় মা। তুমি হুকুম করলে সে সত্যিই হবে অবাধ্য হয়েছে বল ত?

তবে হ'ল কি? গেল না কেন?

আমিই যেতে বলিনি মা, বলিয়া বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল, যে জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েচ তোমার সেই ঠাকুর, তোমার গরুর পাল, তাদের সত্যিই কি অবস্থা ঘটল নিজের চোখে দেখব বলেই সঙ্গে যাচ্ছি। অন্য কিছুই নয় মা।

আর কোন সময়ে দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া হয়ত কত কথাই ছেলেকে বলিতেন, কিন্তু এখন চুপ করিয়া রহিলেন।

অন্নদা বন্দনাকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে এইমাত্র স্নান করিয়া পিতার ঘরে যাইতেছিল, অন্নদার আহ্বানে দ্রুতপদে নীচে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। দয়াময়ী কহিলেন, আজ আমরা বাড়ী যাচ্ছি বন্দনা!

বাড়ী? সেখানে কি হয়েচে মা?

না, হয়নি কিছু। কিন্তু দুদিনের জন্যে এসে দশ-বারো দিন দেরী হয়ে গেল, আর বাড়ী ছেড়ে থাকা চলে না। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হ'লো না—এখনো ওঠেননি—আমার ত্রুটি যেন বেহাই মার্জ্জনা করেন। দ্বিজু রইল, অন্নদা রইল, তুমি দেখো তাঁর যেন অযত্ন না হয়। এসো বৌমা, আর দেরি ক'রো না, এই বলিয়া তিনি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

সতী পিছনে ছিল, সে কাছে আসিয়া বোনের হাত ধরিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল—আমরা চললুম ভাই—আর কিছু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, চোখ মুছিতে মুছিতে গাড়ীতে তাহার শাশুড়ীর পাশে গিয়া বসিল।

বন্দনা স্তব্ধ-বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দাঁড়াইয়া—যেন পাথরের মূর্ত্তি, অকস্মাৎ একি হইল!

বাসু আসিয়া যখন তাহার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল, আমি যাচ্ছি মাসীমা, তখনই তাহার চৈতন্য হইল, তাহারও এখনো কাহাকেও প্রণাম করা হয় নাই। তাড়াতাড়ি বাসুর কপালে একটা চুমা দিয়া সে গাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দয়াময়ী ও মেজদির পায়ের ধূলা লইল। সতী নীরবে তাহার চিবুক স্পর্শ করিল, মা অস্ফুটে আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু কি বলিলেন, বুঝা গেল না। মোটর ছাড়িয়া দিল।

অন্নদা কহিল, চল দিদি, আমরা ওপরে যাই।

তাহার স্নেহের কণ্ঠস্বরে বন্দনা লজ্জা পাইল, ক্ষণকালের বিহ্বলতা সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি যাও অন্নদা, আমি রান্নাঘরের কাজগুলো সেরে নিয়ে যাচ্ছি। এই বলিয়া সেই দিকে চলিয়া গেল।

কাল বিকালেও কথা হইয়াছিল রায়সাহেব বোম্বাই রওনা হইলে সকলে একত্রে বলরামপুর যাত্রা করিবেন। কিন্তু তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত নয়, সুদূর ভবিষ্যতে কোন একদিনের মৌখিক আহ্বান পর্য্যন্ত নয়।

ঘণ্টা-খানেক পরে নিজের হাতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বন্দনা পিতার ঘরে গেলে তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ-সহকারে বলিয়া উঠিলেন, বেহানরা চলে গেলেন, সকালে উঠতে পারিনি মা, ছি ছি, কি না-জানি আমাকে তাঁরা মনে করে গেলেন।

বন্দনা বলিল, বাবা, আমরা কবে বোম্বায়ে যাব?

বাবা বলিলেন, তোমার যে বলরামপুরে যাবার কথা ছিল মা, গেলে না কেন?

মেয়ে বলিল, তোমাকে একলা ফেলে রেখে কি করে যাব বাবা, তুমি যে আজও ভাল হতে পারনি।

ভাল ত হয়েছি মা। তোমাকে কথা দেওয়া হয়েচে তুমি যাবে, না হয় যাবার পথে আমি তোমাকে বলরামপুরে নামিয়ে দিয়ে যাব। কি বল মা?

না বাবা, সে হবে না। তোমাকে এতটা পথ একলা যেতে আমি দিতে পারব না।

কন্যার কথা শুনিয়া পিতা পুলকিত চিত্তে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, দূর বুড়ী। দেখা হলে কোন লোক ঠাট্টা করে বলবে, বুড়ো বাপটাকে মেয়েটা চোখের আড়াল করতে পারে না। ছি ছি—

তুমি খাও বাবা, আমি আসচি, বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া গেল।

১৪

সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, বন্দনা আসিয়া দ্বিজদাসের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, একবার আসতে পারি দ্বিজবাবু? ভিতর হইতে সাড়া আসিল, পার। একবার নয়, শত সহস্র অসংখ্যবার পার।

বন্দনা দরজার পাল্লা দুটা শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিল এবং ঘরের সব কয়টা আলো জ্বালিয়া দিয়া খোলা দরজার সম্মুখে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

দ্বিজদাস হাতের বইটা একপাশে উপুড় করিয়া রাখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি হুকুম?

কি পড়ছিলেন?

ভূতের গল্প।

অতিথি বড় না ভূতের গল্প বড়?

ভূতের গল্প বড়।

বন্দনা বিরক্ত হইয়া বলিল, সকল সময়েই তামাসা ভাল নয়। আমরা যে আপনার বাড়ীতে অতিথি এ জ্ঞান আপনার আছে?

দ্বিজদাস কহিল, তোমরা যে দাদার বাড়ীতে অতিথি এ জ্ঞান আমার পূর্ণ মাত্রায়

আছে। এবং বাড়ী-আলা আদেশ দিয়ে গেছেন তোমাদের যত্নের যেন না ত্রুটি হয়। নিশ্চয় হ'ত না, কিন্তু এই ভূতের গল্পটায় আত্ম-বিস্মৃত হয়ে কর্ত্তব্যে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ঘটেচে। অতএব অতিথির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সমস্ত দিনটা আমার কত কষ্টে কেটেচে জানেন?

নিশ্চয় জানি।

নিশ্চয় জানেন? অথচ প্রতিকারের কি কোন উপায় করেচেন?

দ্বিজদাস কহিল, না করার প্রথম কারণ পূর্ব্বেই নিবেদন করেচি। দ্বিতীয় কারণ, এ প্রতিকার আমার সাধ্যাতীত।

কেন?

সে আমার বলা উচিত নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মা এবং মেজদি এমন হঠাৎ বাড়ী চলে গেলেন কেন?

মেজদি গেলেন প্রবলপরাক্রান্ত শাশুড়ীর হুকুম বলে। নইলে তিনি নির্দ্দোষ।

কিন্তু মা গেলেন কেন?

মা-ই জানেন।

আপনি জানেন না?

দ্বিজদাস কহিল, একেবারেই জানিনে বললে মিথ্যা বলা হবে। কারণ বৌদি কিঞ্চিৎ অনুমান করেচেন এবং আমি তার যৎসামান্য একটু অংশ লাভ করেচি।

বন্দনা বলিল, সেই যৎসামান্য অংশটুকুই আমাকে আপনার বলতে হবে।

দ্বিজদাস এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তবেই বিপদে ফেললে বন্দনা। একথা কি তোমার না শুনলেই চলে না?

না, সে হবে না, আপনাকে বলতেই হবে।

না-ই বা শুনলে!

বন্দনা বলিল, দেখুন দ্বিজবাবু, আমাদের সর্ত্ত হয়েছিল, এ-বাড়ীতে আপনার সমস্ত কথা আমি শুনব এবং আপনিও আমার সমস্ত কথা শুনবেন। আপনি জানেন আপনার একটি আদেশও আমি লঙ্ঘন করিনি। বলিতে গিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল আর একদিকে চাহিয়া তাহা কোনমতে সামলাইয়া লইল।

দ্বিজদাস ব্যথিত হইয়া বলিল, নিতান্ত অর্থহীন ব্যাপার তাই বলার আমার ইচ্ছে ছিল না। মা তোমার 'পরেই রাগ করে চলে গেছেন বটে, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নেই। সমস্ত দোষ মার নিজের। বৌদিদিরও কিঞ্চিৎ আছে, কারণ প্রত্যক্ষে

না হলেও পরোক্ষে চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন বলেই আমার সন্দেহ। কিন্তু সবচেয়ে নিরপরাধ বেচারা দ্বিজদাস নিজে।

বন্দনা অধীর হইয়া উঠিল -বলুন না শীগ্‌গির চক্রান্তটা কিসের?

দ্বিজদাস বলিল, চক্রান্ত শব্দটা বোধ হয় সঙ্গত নয়। কিন্তু মা করেছিলেন মনে মনে স্বর্ণলঙ্কা-ভাগ। কিন্তু হিসেবের ভুলে ভাগ্যে পড়ল যখন শূন্য তখন সমস্ত সংসারের উপর গেলেন চটে। চটাও ঠিক নয়, অনেকটা আশাভঙ্গের ক্ষুব্ধ অভিমান।

বন্দনা নীরবে চাহিয়া রহিল, দ্বিজদাস বলিতে লাগিল, জানো নিশ্চয়ই যে একদিন তোমার প্রতি ছিল তাঁর যত বড় বিতৃষ্ণা আর একদিন জন্মালো তাঁর তেমনি গভীর স্নেহ। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কাজে-কর্মে, দয়া মায়ায় এক বৌদি ছাড়া মার কাছে কেউ তোমার আর জোড়া রইলো না। তোমাকে ম্লেচ্ছ বলে সাধ্য কার? তখনি মা কোমর বেঁধে প্রমাণ করতে বসতেন এত বড় নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-তনয়া সমস্ত ভারতবর্ষ হাতড়ালে খুঁজে মিলবে না। এই বলিয়া দ্বিজদাস নিজের রসিকতার আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

এ হাস বন্দনার অত্যন্ত খারাপ লাগিলেও সে নিজেও হাসিয়া ফেলিল।

দ্বিজদাস বলিল, হাসচ কি বন্দনা, আসলে সেই ত হয়েচে সকলের বিপদ।

বন্দনা কহিল, এতে বিপদ কিসের জন্যে?

দ্বিজদাস বলিল, তবে অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। দয়াময়ীর দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের প্রতি যেমন অগাধ আশা ও ভরসা, কনিষ্ঠের প্রতি তেমনি অপরিসীম সন্দেহ ও ভয়। তাঁহার ধারণা অপদার্থতায় পৃথিবীতে কনিষ্ঠের সমকক্ষ কেউ নেই। কিন্তু মা ত! গর্ভে ধারণ করে সন্তানকে সহজে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না, অতএব মনে মনে পুত্রের সদ্গতির উপায় নির্দ্ধারণ করলেন—তোমার স্কন্ধে, তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে সংসার-মরুভূমি নির্ভয়ে উত্তীর্ণ করে দেবেন। কিন্তু বিধাতা বিরূপ, অকস্মাৎ কাল সন্ধ্যায় আবিষ্কৃত হ'ল বন্দনার স্কন্ধদেশে স্থান নাই, ছোট সে তরী —অর্থাৎ কি না দয়াময়ীর সকল সঙ্কল্প, সকল স্বপ্নজাল ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে কে এক সুধীরচন্দ্র তথায় পূর্ব্বাহ্নেই সমারূঢ়, তাঁকে নাড়ায় সাধ্য কার! এই বলিয়া সে আর এক দফা উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিল।

বন্দনা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, এ-রকম বিকট হাসির কারণটা আপনার কি? মা অপদস্থ হয়েচেন তাই, না আপনি নিজে অব্যাহতি পেলেন তারই আনন্দোচ্ছ্বাস? কোনটা?

দ্বিজদাস স্মিতমুখে বলিল, যদিচ এর কোনটাই নয়, তথাপি কবুল করতে বাধা নেই যে অকস্মাৎ পদস্খলনে মা জননীর এই ধরাশায়িনী মূর্ত্তিতে দর্শক হিসাবে আমি কিঞ্চিৎ অনাবিল আনন্দ-রস উপভোগ করেচি। তবে, ক্ষতি তাঁর বিশেষ হবে না যদি এর থেকে তিনি অন্ততঃ এটুকু শিক্ষা লাভ করে থাকেন যে, সংসারে বুদ্ধি পদার্থটা তাঁরই নিজস্ব নয়, ওতে অপরেরও দাবি থাকতে পারে। কারণ, আমাকে না হোক দাদাকেও মা যদি তাঁর ষড়যন্ত্রের আভাস দিতেন, আর কিছু না ঘটুক, এ কর্ম্মভোগ থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিতে পারা যেত। দাদা এবং আমি উভয়েই জানতুম তুমি অন্যের বাক্‌দত্তা বধূ, পরস্পর প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ, অতএব এ অবস্থার অন্যথা ঘটা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কার কাছে কবে শুনলেন?

দ্বিজদাস বলিল, তোমার বাবার কাছে। এখানে আমাদের আসার দিনই রায়সাহেব তোমাদের ভালবাসা, বাক্‌দান ও আশু বিবাহের মনোজ্ঞ আলোচনায় আমাদের দুভায়ের দুজোড়া কানেই সুধাবর্ষণ করেছিলেন। না, না, রাগ ক'রো না বন্দনা, সাধা-সিধে নিরীহ মানুষ, চিত্তের প্রফুল্লতায় সুসংবাদ আত্মীয়-স্বজনের কাছে চেপে রাখবার প্রয়োজনই মনে করেননি।

বন্দনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, এই জন্যেই কি মুখুয্যেমশাই মৈত্রেয়ীকে দেখতে আমাদের পাঠিয়েছিলেন?

দ্বিজদাস বলিল, সে ঠিক জানিনে। কারণ, দাদার সমস্ত মনের কথা দেবতারও অজ্ঞাত। শুধু এটুকু জানি তাঁর মনে মৈত্রেয়ী দেবী সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যা। বলরামপুরের ধনী ও মহামাননীয় মুখুয্যে পরিবারের অযোগ্যা নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মৈত্রেয়ী দেবী সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা কি?

দ্বিজদাস বলিল, এ-বাড়ীতে ও প্রশ্ন অবৈধ। আমি তৃতীয় পক্ষ। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ মা ও দাদা যে কোন নারীর গলদেশে আমাকে বন্ধন করে দেবেন তাঁরই কণ্ঠলগ্ন হয়ে আমি পরমানন্দে ঝুলতে থাকব। এ গৃহের সনাতন রীতি, এর পরিবর্ত্তন নেই।

তাহার বলবার ভঙ্গীতে বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আর ধরুন, মৈত্রেয়ীর পরিবর্ত্তে বন্দনার গলদেশেই যদি তাঁরা আপনাকে বেঁধে দেন?

দ্বিজদাস ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, হায় বন্দনা, সে আশা বৃথা! দুষ্ট রাহু পূর্ণচন্দ্র ভক্ষণ করেচে, কোথাকার সুধীরচন্দ্র লাফ মেরে এসে প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিলে, দ্বিজদাসের স্বর্ণলঙ্কা চোখের সম্মুখে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গ বন্ধ করো কল্যাণি, অভাগার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

তাহার নাটকীয় উক্তিতে বন্দনা আর একবার হাসিয়া বলিল, সোনার লঙ্কার সবটা ত পোড়েনি দ্বিজুবাবু, অশোক-কাননটা রক্ষে পেয়েছিল। হৃদয় বিদীর্ণ না হতেও পারে।

দ্বিজদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, সে আশ্বাস বৃথা, শ্রীরামচন্দ্রের বরাতের জোর ছিল, কিন্তু আমি সর্ব্ববাদিসম্মত হতভাগ্য দ্বিজদাস। আমার দগ্ধ অদৃষ্টে সমস্ত আশাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—কিছুই অবশিষ্ট নেই।

না যায়নি।

কি যায়নি?

বন্দনা জোর দিয়া বলিল, কিছুই যায়নি। দ্বিজদাস হতভাগ্য বলে বন্দনা হতভাগিনী নয়। আমার অদৃষ্টকে পুড়িয়ে ছাই করে এ সাধ্য সুধীরের নেই। সংসারে কারও নেই, মায়েরও না, আপনার দাদারও না।

তাহার শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বরে দ্বিজদাস অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

চুপ করে রইলেন যে? আমার মনের কথা আপনি টের পাননি? আজ কি এই ছলনা করতে চান?

না, ছলনা করতে চাইনে বন্দনা, অনুমান করেছিলুম তা মানি। কিন্তু সন্দেহও ছিল প্রচুর।

বন্দনা কহিল, সে সন্দেহ যেন আজ থেকে যায়। ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু সন্দেহ আমার ত ছিল না। সেই প্রথম দিন থেকেই না। বাড়ী থেকে রাগ করে চলে এলুম, একলা উপরের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে ইঙ্গিতে আমাকে বিদায় দিলেন, মাত্র একটি বেলার পরিচয়, তবু কি অর্থ তার আমার কাছে এতটুকু অস্পষ্ট ছিল ভাবেন?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া বন্দনা বলিল, গেল সন্দেহ?

দ্বিজদাস বলিল, বোধ হয় একটু তাড়া দিলেই যাবে। কিন্তু ভাবচি, আমার সংশয়-নিরসনে এই পদ্ধতিই কি চিরকাল চালাবে?

বন্দনা বলিল, চিরকালের ব্যবস্থা আগে ত আসুক। কিন্তু সমস্ত জেনেও যে তাচ্ছিল্যের অভিনয় করে তাকে বোঝাবার আর কোন পথ নেই।

কিন্তু সে আমি নয়, মা। তাকে বোঝাবে কি করে?

বন্দনা বলিল, মা আপনি বুঝবেন। আমাকে তিনি মেয়ের মতো ভালবাসেন। আজ হঠাৎ যত চঞ্চল হয়েই যান, যা জেনে গেছেন সে যে সত্যি নয় একথা মাকেই যদি না বোঝাতে পারি আমি কিসের আশা করি বলুন ত! আমার কোন ভাবনা

নেই দ্বিজুবাবু, একদিন-না-একদিন সমস্ত কথা তাঁকে আমি বোঝাবই বোঝাব বলিতে গিয়া শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলা ভাঙ্গিয়া দুই চোখ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সত্য ও মিথ্যার দ্বিধা দ্বিজদাসের ঘুচিয়াও ঘুচিতেছিল না, কিন্তু এই চোখের জল ও কণ্ঠস্বরের নিগূঢ় পরিবর্ত্তনে তাহার সকল সংশয় ঘুচিল—এ ত শুধু পরিহাস নয়। বিস্ময় ও ব্যথায় আলোড়িত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, এ কি বন্দনা, তুমি কাঁদচ যে?

প্রত্যুত্তরে বন্দনা কথা কহিল না, কেবল অশ্রু মুছিয়া আর একদিকে চাহিয়া রহিল।

দ্বিজদাস নিজেও বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, সুধীর ত তোমার কাছে কোনও দোষ করেনি বন্দনা।

বন্দনা মুখ ফিরিয়া চাহিল না, শুধু বলিল, দোষের বিচার কিসের জন্যে বলুন ত? আমি কি তাঁর অপরাধের প্রতিশোধ নিতে বসেচি?

দ্বিজদাস এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না, বুঝিল প্রশ্নটা একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, কিন্তু সুধীর তোমাদের আপন সমাজের—অথচ শিক্ষায়, সংস্কারে, অভ্যাসে, আচরণে মুখুয্যেদের সঙ্গে তোমার কোথাও মিল হবে না। তবে কিসের জন্য এদের কারাগারে এসে চিরকালের জন্যে তুমি ঢুকতে যাবে বন্দনা? আমার জন্যে? আজ হয়ত তুমি বুঝবে না, কিন্তু একদিন যদি এ ভুল ধরা পড়ে তখন পরিতাপের অবধি থাকবে না। আমাকে তুমি কিভাবে বুঝেচ জানিনে, কিন্তু বৌদি, মা, দাদা, আমাদের ঠাকুর, আমাদের অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, আমি এঁদেরই একজন। আমাকে আলাদা করে ত তুমি কোনদিনই পাবে না। দীর্ঘকাল এ কি তোমার সইবে?

বন্দনা বলিল, না সইলে মানুষের মরার পথ ত চিরকাল খোলা রয়েচে দ্বিজুবাবু, কোন কয়েদখানাই তা বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু আমাকে আপনারা কি বুঝেচেন জানিনে, কিন্তু আমার শাশুড়ী, আমার জা, আমার ভাশুর, আমাদের ঠাকুর, অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন-সমাজ, এর থেকে আলাদা করে আমার স্বামীকে আমি একদিনও পেতে চাইনে। তিনি সকলের সঙ্গে এক হয়েই যেন আমার থাকেন।

দ্বিজদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, এ-সব ধারণা ত তোমাদের নয়, এ তুমি কার কাছে শিখলে বন্দনা?

বন্দনা কহিল, কেউ আমাকে শেখায়নি দ্বিজুবাবু, কিন্তু মার কাছ থেকে, মুখুয্যে-মশাইকে দেখে এ-সব আমার আপনিই মনে হয়েচে। এ-বাড়ীতে সকল ব্যাপারে সকলের বড় মা, তার পরে মুখুয্যেমশাই, তার পরে দিদি, তার পরে আপনি, এখানে

অন্নদারও একটা বিশেষ স্থান আছে। এ-বাড়ীতে জায়গা যদি কখনো পাই এদের ছোট হয়েই পাবো, কিন্তু সে আমার একটুও অসঙ্গত মনে হবে না।

শুনিয়া দ্বিজদাসের যেমন ভাল লাগিল তেমনি মন ব্যথায় ভরিয়া গেল। কিন্তু বন্দনার মনের কথা এমনি করিয়া জানিয়া লওয়া অন্যায়,—এ আলোচনা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। জোর করিয়া নিজেকে সে কঠিন করিয়া বলিল, কিন্তু মাকে আমাদের এই সব কথা জানিয়ে কোন লাভ নেই। তিনি তোমাকে মেয়ের মতো ভালবাসেন এ আমি জানি তাই তাঁর মনের একান্ত আশা ছিল তুমি হবে এ-বাড়ীর ছোট বৌ, তোমাদের দুই বোনের হাতে তাঁর দুই ছেলেকে সঁপে দিয়ে যাবেন তিনি কৈলাসে, ফিরতে যদি আর না পারেন, সেই দুর্গম পথেই যদি আসে পরকালের ডাক, এই কথাটা মনে নিয়ে তখন নিশ্চিত নির্ভয়ে যাত্রা করতে পারবেন। তাঁর বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব হস্তান্তরে আর কোন দিকে ফাঁক নেই। কিন্তু সে হবার আর যো নেই, তাঁর মতে বাক্‌দান মানেই সম্প্রদান। ভালোবেসে যাকে সম্মতি দিয়েচো সে-ই তোমার স্বামী। বিয়ের মন্ত্র পড়া হয়নি বলে তাঁকে ত্যাগ করতেও তুমি পার, কিন্তু সেই শূন্য আসন জুড়ে দয়াময়ীর ছেলে গিয়ে বসতে পারবে না।

শুনিয়া বেদনায় বন্দনার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, মা কি এইসব বলে গেছেন দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস কহিল, অন্ততঃ বলা অসম্ভব মনে করিনে বন্দনা। বৌদি বলছিলেন, মায়ের সবচেয়ে বেজেচে এই ব্যথাটা যে সুধীর আমাদের জাত নয়,—আসলে তোমরা জাত মানো না। এত বড় বিভেদ যে, কিছু দিয়েই এ ফাঁক ভরানো যাবে না।

আপনিও কি এই কথাই বলেন?

আমি ত তৃতীয় পক্ষ বন্দনা, আমার বলায় কি আসে যায়।

রায়সাহেবের আহারের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছিল, বন্দনা উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইবার পূর্ব্বে কহিল, বাবার ছুটি শেষ হয়েচে, কাল তিনি চলে যাবেন। আমিও কি তাঁর সঙ্গে চলে যাবো দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস কহিল, এ-ও কি আমার বলবার বন্দনা? যদি যাও আমাকে তুমি ভুল বুঝে যেও না। তুমি যাবার পরে তোমার হয়ে মাকে তোমার সমস্ত কথা জানাবো, লজ্জা করবো না। তারপরে রইল আমাদের আজকের সন্ধ্যাবেলাকার স্মৃতি, আর রইল আমাদের বন্দেমাতরমের মন্ত্র।

বন্দনা ইহার কোন উত্তর দিল না, নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৫

নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বন্দনার অত্যন্ত গ্লানি বোধ হইতে লাগিল। সে কি নেশা করিয়াছে যে, নির্লজ্জ উপযাচিকার ন্যায় আপন হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া সমস্ত আত্ম-মর্য্যাদার জলাঞ্জলি দিয়া আসিল? অথচ দ্বিজদাস পুরুষ হইয়াও যেমন রহস্যাবৃত ছিল তেমনি রহিল। তাহার মুখের ভাবে না ছিল অগ্রাহ্য, না ছিল উল্লাস, সে না দিল আশা, না দিল সান্ত্বনা, বরঞ্চ পরিহাসচ্ছলে এই কথাটাই বার বার বলিয়া জানাইল যে সে তৃতীয় পক্ষ। তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা এ-বাড়ীতে অবান্তর বিষয়। শুধু কি এই! মা রাগ করিয়া বলিল, বাক্‌দান মানেই সম্প্রদান, বলিল, নিরপরাধ সুধীরের শূন্য আসনে গিয়া দয়াময়ীর ছেলে বসিবে না। কিন্তু অপমানের পাত্র ইহাতেও পূর্ণ হইল না, তাহার চোখে জল দেখিয়া সে অবশেষে দয়ার্দ্রচিত্তে মাত্র এইটুকু কথা দিয়াছে যে বন্দনার এই বেহায়া-পনার কাহিনী মায়ের কাছে সে উল্লেখ করিবে।

আবার এইখানেই কি শেষ! দ্বিজদাসের কথার উত্তরে সে যাচিয়া বলিয়াছিল, এই পরিবারের যেখানে যে-কেহ আছে, সকলের ছোট হইয়াই সে আসিতে চায়। আর সে ভাবিতে পারিল না, সেইখানে স্তব্ধভাবে বসিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, প্রকৃত সে অত্যন্ত ছোট হইয়া গেছে - এত ছোট যে আত্মঘাতী হইলেও এ হীনতার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

বাহির হইতে কে আসিয়া জানাইল রায়সাহেব তাহাকে ডাকিতেছেন। উঠিয়া সে পিতার ঘরে গেল, সেখানে তাহাকে বারংবার জিদ করিয়া সম্মত করাইল, কালই তাঁহাদের বোম্বায়ে রওনা হইতে হইবে। অথচ, কথা ছিল বিপ্রদাস ফিরিয়া আসিলে রাত্রের ট্রেনে তাঁহারা যাত্রা করিবেন। হঠাৎ এইভাবে চলিয়া যাওয়াটা যে ভালো হইবে না ইহাতে সাহেবের সন্দেহ ছিল না – ছুটিও ছিল, স্বচ্ছন্দে থাকাও চলিত, তথাপি কন্যার প্রস্তাবে তাঁহাকে রাজি হইতে হইল।

বিছানায় শুইয়া বন্দনার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তার পরে এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া সে নিজের এবং বাপের জিনিষ-পত্র সমস্ত গুছাইয়া ফেলিল, ফোন করিয়া গাড়ী রিজার্ভ করিল এবং বোম্বায়ে তার করিয়া দিল। সন্ধ্যায় ট্রেন, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার বিলম্ব সহে না।

বেলা তখন ন'টা বাজিয়াছে, অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—এ কি কাণ্ড?

বন্দনা ময়লা কাপড়গুলা ভাঁজ করিয়া একটা তোরঙ্গে তুলিতেছিল, কহিল, আজ আমরা যাবো।

সে তো আজ নয় দিদিমণি। যাবার কথা যে কাল।

না, আজই যাওয়া হবে! এই কথা বলিয়া সে কাজ করিতে লাগিল, মুখ তুলিল না!

অন্নদা এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি উঠুন, আমি গুছিয়ে দিচ্ছি। আপনার কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট দেখবার দরকার নেই, নিজের কাজে যাও তুমি। এ-বাড়ীর সমস্ত লোকের প্রতি যেন তাহার ঘৃণা ধরিয়া গেছে।

হেতু না জানিলেও একটা যে রাগারাগির পালা চলিতেছে অন্নদা তাহা জানিত। হঠাৎ মা কাল বাড়ী চলিয়া গেলেন, আজ বন্দনাও তেমনি হঠাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত। কিন্তু রাগের বদলে রাগ করা অন্নদার প্রকৃতি নয়, সে যেমন সহিষ্ণু তেমনি ভদ্র, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, আমার দোষ হয়ে গেছে দিদিমণি, আজ সময়ে আমি উঠতে পারিনি।

বন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, আমি ত তার কৈফিয়ৎ চাইনি অন্নদা, দরকার হয় তোমার মনিবকে দিও। দ্বিজুবাবু তাঁর ঘরেই আছেন, তাঁকে বলোগে। এই বলিয়া সে পুনরায় কাজে মন দিল।

বন্দনাও পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া একটুখানি বেশী আদরেই প্রতিপালিত। সহ্য করার শক্তিটা তাহার কম। কিন্তু তাই বলিয়া কটু কথা বলার কুশিক্ষাও তাহার হয় নাই এবং হয়ত এত বড় কঠোর বাক্যও সে জীবনে কাহাকেও বলে নাই। তাই বলিয়া ফেলিয়াই সে মনে মনে লজ্জা বোধ করিতেছিল এমনি সময়ে অন্নদাই সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিতে লাগিল, ডাক্তাররা চলে গেলেন, ফর্সা হয়েচে দেখে ভাবলুম আর শোবো না, শুইনিও, কিন্তু দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসতে কি করে চোখ জড়িয়ে এলো, কোথা দিয়ে বেলা হয়ে গেল টের পেলুম না। মনিবের কথা বলচেন দিদিমণি, কিন্তু আপনিও কি আমার মনিব ন'ন? বলুন ত, এ অপরাধ আর কখনও কি আমার হয়েছে? উঠুন আমি গুছিয়ে দিই।

শেষের দিকে কথাগুলো বোধ হয় বন্দনার কানে যায় নাই, অন্নদার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, ডাক্তাররা চলে গেলেন মানে?

অন্নদা কহিল, কাল রাত্তিরে দ্বিজুর ভারি অসুখ গেছে। এখানে এসে পর্য্যন্ত ওর শরীর খারাপ, কিন্তু গ্রাহ্য করে না। কাল মা'দের নিয়ে বাড়ী যাবার কথায় আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললে. মা যেন না জানতে পারেন, কিন্তু দাদাকে বলে আমার যাওয়াটি মাপ করে দাও অন্নদিদি, আজ যেন আমি উঠতে পারচিনে এমনি দুর্ব্বল।

ওকে মানুষ করেছি, ওর সব কথা আমার সঙ্গে। ভয় পেয়ে বললুম, সেকি কথা, শরীর খারাপ ত লুকোচ্চো কেন! ওর স্বভাবই হ'লো হেসে উড়িয়ে দেওয়া, তা সে যত গুরুতরই হোক। তেমনি একটুখানি হেসে বললে, তুমি ওদের বিদেয় করো না দিদি. তার পরে আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠবো। ভাবলুম, মার সঙ্গে ওর বনে না, কোথাও সঙ্গে যেতে চায় না, এ বুঝি তারই একটা ফন্দি। তাই কিছু আর বললুম না। বড়দাদাবাবু ওঁদের নিয়ে চলে গেলেন। তার পরে সমস্ত দিনটা ও শুয়ে কাটালে, কিছু খেলে না; দুপুরবেলা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, দ্বিজু, কেমন আছ? বললে, ভাল আছি। কিন্তু ওর চেহারা দেখে তা মনে হ'লো না! ডাক্তার আনতে চাইলুম, দ্বিজু কিছুতে দিলে না, বললে, কেন মিছে দাদার অর্থদণ্ড করাবে দিদি, তোমার অপব্যয়ের কথা শুনলে গিন্নী রাগ করবেন। মায়ের উপর এ অভিমান ওর আর গেল না। সমস্ত দিন খেলে না, বিছানায় শুয়ে কাটালে, বিকেলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, দ্বিজু, শরীর যদি সত্যই খারাপ নেই তবে সমস্ত দিন শুয়ে কাটাচ্ছোই বা কেন? ও তেমনি হেসে বললে, অন্নদিদি, শাস্ত্রে লেখা আছে শুয়ে থাকার মত পুণ্য কাজ জগতে নেই, এতে কৈবল্য মেলে। একটু পারিত্রিক মঙ্গলের চেষ্টায় আছি। তোমার ভয় নেই। সব তাতেই ওর তামাসা, কথায় পারবার জো নেই, রাগ করে চলে এলুম, কিন্তু ভয় ঘুচলো না। ও একখানা বই টেনে পড়তে শুরু করে দিলে।

অন্নদা একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, রাত্রি বোধ করি তখন বারোটা, আমার দোরে ঘা পড়ল। কে রে? বাইরে থেকে জবাব এলো, অন্নদিদি আমি। দোর খোলো। এত রাত্রে দ্বিজু ডাকে কেন, ব্যস্ত হয়ে দোর খুলে বেরিয়ে এলুম,—দ্বিজু, এ কি মূর্ত্তি! চোখ কোটরে ঢুকেচে, গলা ভাঙা, শরীর কাঁপচে, কিন্তু তবু হাসি। বললে, দিদি, মানুষ করেছিলে তাই তোমার ঘুম ভাঙালুম। যদি চোখ বুজতেই হয় তোমার কোলেই মাথা রেখে বুজবো। এই বলিয়া অন্নদা ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কান্না যেন থামিতে চাহে না এমনি ভিতরের অদম্য আবেগ। আপনাকে সামলাইতে তাহার অনেকক্ষণ লাগিল, তারপর কহিল, বুকে করে তাকে ঘরে নিয়ে গেলুম, কিন্তু যেমন কাঠ বমি তেমনি পেটের যন্ত্রণা—মনে হ'লো রাত বুঝি আর পোহাবে না, কখন নিশ্বাসটুকু বা বন্ধ হয়ে যায়! ডাক্তারদের খবর দেওয়া হ'লো.

তাঁরা সব এসে পড়লেন, ফুঁড়ে ওষুধ দিলেন, গরম জলের তাপ সেক চলতে লাগলো—চাকররা সব জেগে বসে—ভোরবেলায় দ্বিজু ঘুমিয়ে পড়লে। ডাক্তাররা বললে আর ভয় নেই। কিন্তু কিভাবে যে রাতটা কেটেচে দিদিমণি, ভাবলে মনে হয় বুঝি দুঃস্বপ্ন দেখেচি—ওসব কিছুই হয়নি! এই বলিয়া অন্নদা আবার আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

বন্দনা আস্তে আস্তে বলিল, আমি কিছুই জানতে পারিনি, আমাকে তুললে না কেন অন্নদা?

অন্নদা কহিল, সকালে ঐ একটা অশান্তি গেলো, আর তোমাকে ব্যস্ত করলুম না দিদিমণি। নইলে দ্বিজু বলেছিল।

বন্দনা এ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিল, কহিল, দ্বিজুবাবু এখন কেমন আছেন?

অন্নদা কহিল, ভালো আছে, ঘুমুচ্চে। ডাক্তাররা বলে গেছেন হয়ত সন্ধ্যার আগে আর ঘুম ভাঙবে না। বড়বাবু এসে পড়লে বাঁচি দিদি।

তাঁকে কি খবর দেওয়া হয়েচে?

না। দত্তমশাই বললেন তার আবশ্যক নেই, তিনি আপনিই আসবেন।

ও ঘরে লোক আছে ত?

হাঁ দিদিমণি, দু'জন বসে আছে।

ডাক্তার আবার কখন আসবে।

সন্ধ্যার আগেই আসবেন। বলে গেছেন আর ভয় নেই।

চিকিৎসকেরা অভয় দিয়ে গেছেন বন্দনার এইটুকু সান্ত্বনা। এছাড়া তাহার কি-ই বা করিবার আছে।

বন্দনা গিয়া পিতাকে দ্বিজদাসের পীড়ার সংবাদ দিল, কিন্তু বেশি বলিল না।

তিনি সেইটুকু শুনিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কৈ আমি ত কিছুই জানতে পারিনি!

না, আমাদের ঘুম ভাঙানো কেউ উচিত মনে করেনি।

কিন্তু সেটা ত ভালো হয়নি!

বন্দনা চুপ করিয়া রহিল, তিনি ক্ষণেক পরে বলিলেন, টিকিট কিনতে পাঠা হয়েচে, গাড়ী রিজার্ভ হয়ে গেছে, আমাদের যাওয়ায় ত দেখচি একটু বিঘ্ন ঘটল।

বন্দনা বলিল, কেন বিঘ্ন হবে বাবা, আমরা থেকেই বা তাঁদের কি উপকার করবো?

না, উপকার নয়, কিন্তু তবু—

না বাবা, এমনি করে কেবলই দেরি হয়ে যাচ্চে, তুমি মত বদ্‌লো না। এই বলিয় বন্দনা বাহির হইয়া আসিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, বন্দনার ঘরে ঢুকিয়া অন্নদা মেঝের উপর বসিল। তাঁহাদের যাত্রা করিতে তখনও ঘন্টা-দুয়েক দেরি। বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজুবাবু ভাল আছে ?

হাঁ দিদি, ভাল আছে, ঘুমুচ্চে।

বন্দনা কহিল, আমাদের যাবার সময়ে কারও সঙ্গে দেখা হলো না। একজনের তখনো হয়ত ঘুম ভাঙবে না, আর একজন যখন বাড়ী এসে পৌঁছাবেন তখন আমরা অনেক দূরে চলে গেছি !

অন্নদা সায় দিয়া বলিল, হাঁ, বড়দাদাবাবু আসবেন প্রায় ন'টা রাত্তিরে। একটু পরে কহিল, তিনি এসে পড়লে সবাই বাঁচি। সকলের ভয় ঘোচে।

কিন্তু ভয় ত কিছু নেই অন্নদা !

অন্নদা বলিল, নেই সত্যি, কিন্তু বড়দাদাবাবুর বাড়ীতে থাকাই আলাদা জিনিস দিদি। তখন কারও আর কোন দায়িত্ব নেই, সব তাঁর। যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিবেচনা, তেমনি সাহস, আর তেমনি গাম্ভীর্য্য। সকলের মনে হয় যেন বটগাছের ছায়ায় বসে আছি।

সেই পুরাতন কথা, সেই বিশেষণের ঘটা ! মনিবের সম্বন্ধে এ যেন ইহাদের মজ্জাগত হইয়াছে। অন্য সময় হইলে বন্দনা খোঁটা দিতে ছাড়িত না, কিন্তু এখন চুপ করিয়া রহিল।

অন্নদা বলিতে লাগিল, আর এই দ্বিজু ! দুই ভায়ে যেন পৃথিবীর এ-পিঠ ও-পিঠ !

বন্দনা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন ?

অন্নদা বলিল, তা বইকি দিদি। না আছে দায়িত্ব-বোধ, না আছে ঝঞ্ঝাট, না আছে গাম্ভীর্য্য। বৌদি বলেন, ও হচ্চে শরতের মেঘ, না আছে বিদ্যুত, না আছে জল। উড়ে উড়ে বেড়ায়, ব্যাপার যত গুরুতর হোক হেসে-খেলে ও কাটাবেই কাটাবে। না গৃহী না বৈরাগী, কত খাতক যে ওর কাছে 'বুঝিয়া পাইলাম' লিখিয়ে নিয়ে পরিত্রাণ পেয়েচে তার হিসেব নেই।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই রাগ করেন না ?

করেন না। খুব করেন। বিশেষ মা। কিন্তু ওকে পাওয়া যাবে কোথায় ? কিছুদিনের মতো এমন নিরুদ্দেশ হয় যে বৌদি কান্নাকাটি সুরু করে দেন, তখন সবাই মিলে খুঁজে ধরে আনে। কিন্তু এমন করেও ত চিরদিন কাটতে পারে না দিদি, ওরও বিয়ে দিতে হবে, ছেলে-পুলে হবে, তখন যে এ অবস্থায় দেউলে হতে হবে !

বন্দনা কহিল, একথা তোমরা ওকে বলো না কেন ?

অন্নদা কহিল, ঢের বলা হয়েচে, কিন্তু ও কান দেয় না। বলে, তোমাদের ভাবনা কেন? দেউলেই যদি হই বৌদিদি ত আর দেউলে হবে না, তখন সকলে মিলে ওঁর ঘাড়ে গিয়ে চাপবো।

বন্দনা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি কি বলেন?

অন্নদা কহিল, দেওরের উপর তাঁর আদরের শেষ নেই। বলেন আমরা খাবো আর দ্বিজু উপোস করবে নাকি? আমার পাঁচশো টাকা তো আর কেউ ঘুচোতে পারবে না, আমাদের গরিবী-চালে তাতেই চলে যাবে। বড়বাবু তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে সুখে থাকুন আমরা চাইতে যাবো না।

শুনিয়া বন্দনার কি যে ভালো লাগিল তাহার সীমা নাই। যে বলিয়াছে সে তাহারই বোন! অথচ যে সমাজে যে আবহাওয়ার মধ্যে সে নিজে মানুষ সেখানে এ কথা কেহ বলে না, হয়ত ভাবিতেও পারে না। বলার কখনো প্রয়োজন হয় কি না তাই বা কে জানে।

কিন্তু অন্নদা যাহা বলিতেছিল সে যেন পুরাকালের একটা গল্প। ইহারা একান্নবর্ত্তী পরিবার কেবল বাহিরের আকৃতিতে নয় ভিতরের প্রকৃতিতে। অন্নদা এখানে শুধু দাসী নয়, দ্বিজদাসের সে দিদি। কেবল মৌখিক নয়, আজও সকল কথা তাহার ইহারই কাছে। এই অন্নদার বাবা এই পরিবারের কর্ম্মে গত হইয়াছে, তাহার ছেলে এখানে মানুষ হইয়া এখানেই কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। অন্নদার অভাব নাই, তবু মায়া কাটাইয়া তাহার যাইবার যো নাই। এই সমৃদ্ধ বৃহৎ পরিবারে অনুবিদ্ধ এমন কতজনের পুরুষানুক্রমের ইতিহাস মিলে। দয়াময়ীর অবাধ্য সন্তান দ্বিজদাসও কাল বলিয়াছিল, তাহার মা, দাদা, বৌদি, তাহাদের গৃহদেবতা, অতিথিশালা সমস্ত লইয়াই সে,—তাহাদের হইতে পৃথক করিয়া বন্দনার কোনদিন তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা নাই। তখন বন্দনা অস্বীকার করে নাই বটে, তবু আজই এ কথার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিল।

কথা শেষ হয় নাই, অনেক কিছু জানিবার আগ্রহ তাহার প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু বাধা পড়িল। চাকর আসিয়া জানাইল রায়সাহেব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ছ'টা বাজিয়াছে। যাত্রা করিবার সময় একঘণ্টার বেশি নাই। প্রস্তুত হইবার জন্য বন্দনাকে উঠিতে হইল।

যথাসময়ে রায়সাহেব নীচে নামিলেন, নামিতে নামিতে মেয়ের নাম ধরিয়া একটা হাঁক দিলেন, বন্দনার কানে আসিয়া তাহা পৌঁছিল। অন্যায় যত বড় হোক অনিচ্ছা যত কঠিন হোক যাইতেই হইবে। বারংবার জিদ করিয়া যে ব্যবস্থা নিজে ঘটাইয়াছে

৬

তাহার পরিবর্তন চলিবে না। ঘর হইতে যখন বাহির হইল এই কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে হইল, ভবিষ্যতে যতদূর দৃষ্টি যায় কোনদিন কোন ছলেই এখানে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাহার অনেক সুখের স্বপ্ন দিয়া এই ঘরখানি যে পূর্ণ হইয়া রহিল তাহা কোনকালে ভুলিতে পারিবে না। সোজা পথ ছাড়িয়া দ্বিজদাসের পাশের বারান্দা ঘুরিয়া নামিবার সময়ে সে ঘরের মধ্যে একবার চোখ ফিরাইল। কিন্তু যে জানালাটা খোলা ছিল তাহা দিয়া দ্বিজদাসকে দেখা গেল না।

মোটরের কাছে দাঁড়াইয়া দত্তমশাই, রায়সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া ভৃত্যদের দেবার জন্য অনেকগুলো টাকা হাতে দিলেন এবং হঠাৎ যাবার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া দ্বিজদাসের খবরটা তাঁহাকে অতি শীঘ্র জানাইবার অনুরোধ করিলেন।

গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে বন্দনা অন্নদাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া বলিল, দ্বিজবাবুর তুমি দিদি,—তাঁকে মানুষ করেচ—এই আংটিটি তোমার বৌমাকে দিও অনুদিদি, সে যেন পরে, এই বলিয়া হাতের আঙটি খুলিয়া তাহার হাতে দিয়াই বাবার পাশে গিয়া বসিল।

মোটর ছাড়িয়া দিল। এখানে-ওখানে দাঁড়াইয়া কয়েকজন ভৃত্য ও দত্তমশাই নমস্কার করিল।

বন্দনা নিজের অজ্ঞাতসারেই উপরে চোখ তুলিল, কিন্তু আজ সেখানে আর একদিনের মত সকলের অগোচরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে সংকেত বিদায় দিতে দ্বিজদাস দাঁড়াইয়া নাই। আজ সে পীড়িত,—আজ সে নিদ্রায় অচেতন।

১৬

দয়াময়ীর আচরণে বন্দনার প্রতি যে প্রচ্ছন্ন লাঞ্ছনা ও অব্যক্ত গঞ্জনা ছিল সতীকে তাহা গভীরভাবে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু শাশুড়ীকে কিছু বলা সহজ নয়, তাই সে একখানি চিঠি লিখিয়া বোনের হাতে দিবার জন্য স্বামীকে ঘরে ডাকিয়া পাঠাইল। দুপুরের ট্রেনে বিপ্রদাস কলকাতায় ফিরিবে। এমন সময় দয়াময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এরূপ তিনি কখন করেন না—ছেলে এবং বৌ উভয়েই বিস্মিত হইল—সতী মাথার আঁচল টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, শাশুড়ী নিষেধ করিয়া কহিলেন, না বৌমা, যেও না। তোমার অসাক্ষাতে তোমার বোনের নিন্দে করবো না, একটু দাঁড়াও। বিপিন, জানিস্ তুই, কেন এত ব্যস্ত হয়ে আমি বাড়ী চলে এলুম?

বিপ্রদাস বলিল, ঠিক জানিনে মা, কিন্তু কোথায় কি-একটা গোলযোগ ঘটেচে এইটুকুই আন্দাজ করেচি।

মা কহিলেন, গোলযোগ ঘটেনি কিন্তু ঘটতে পারত। এর থেকে মা দুর্গা আমাকে রক্ষে করেচেন। কাল বেহাই-মশাই বোম্বায়ে চলে যাবেন, কথা ছিল তার পরে বন্দনা এসে কিছুদিন থাকবে ওর মেজদিদির কাছে। কিন্তু মেয়েটার মাথায় যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে ত এখানে সে আর আসতে চাইবে না, বাপের সঙ্গে সোজা বোম্বায়ে চলে যাবে। যদি না যায় যেতে বলে দিস্। বৌমা, মনে কিছু দুঃখ ক'রো না মা, অমন বোনকে বনবাসে দেওয়া চলে, কিন্তু ঘরে এনে তোলা চলে না।

বিপ্রদাস নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল, তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। দয়াময়ী বলিতে লাগিলেন, আমার পোড়াকপাল যে ওকে ভালবাসতে গিয়েছিলুম, মনে করেছিলুম ও আমাদেরই একজন। ওর চাল-চলনে গলদ আছে,—ভেবেছিলুম, সে সব ইস্কুল-কলেজে পড়ার ফল,—চাঁদের গায়ে উড়ো মেঘের মত, বাতাস লাগলে উড়ে যাবে—থাকবে না। হাজার হোক সতীর বোন তো বটে! কিন্তু ও বর বেছে নিলে কায়েতের ঘর থেকে, কে জানত বিপিন, বামুনের বংশে জন্মে ওরা এত অধঃপাতে গেছে।

বিপ্রদাস কহিল,—ও এই কথা। কিন্তু ওরা যে জাত মানে না এ খবর তুমি ত শুনেছিলে মা?

দয়াময়ী বলিলেন, শুনেছিলুম, কিন্তু চোখে দেখিনি, বোধ হয় মনে বুঝতেও পারিনি। রূপকথার গল্পের মতো। কিন্তু চোখে দেখলে যে কারো 'পরে কারো এত বেতেষ্টা জন্মায় তা সত্যিই জানতুম না বাবা। বলিতে বলিতে ঘৃণায় যেন তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, মরুকগে। যা ইচ্ছে হয় করুক, কে আর আমার ও—কিন্তু আমার বাড়িতে আর না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া আছে দেখিয়া বলিলেন, কই জবাব দিলিনে যে বিপিন?

জবাব ত তুমি চাওনি মা! হুকুম দিলে বন্দনা যেন না আসে,—তাই হবে।

তাহার কথা শুনিয়া দয়াময়ী দ্বিধায় পড়িলেন, হুকুমটা কি অন্যায় দিচ্ছি তোর মনে হয়?

হয় বই কি মা। বন্দনা অন্যায় কিছু করেনি, সামাজিক আচার-ব্যবহারে আমাদের সঙ্গে তাদের মেলে না, তারা জাত মানে না, একথা জেনেই তাকে তুমি আদর আহ্বান করেছিলে, ভালোও বেসেছিলে। তোমার মনে হয়ত আশা ছিল তারা মুখেই বলে কাজে করে না,—এইখানেই তোমার হয়েচে ভুল, আঘাতও পেয়েচো

দয়াময়ী বলিলেন, সে হয়ত সত্যি, কিন্তু ওর বিয়ের ব্যাপারটা শুনলে তোরই কি ঘেন্না হয় না বিপিন ? তুই বলিস্ কি বল্ তো।

বিপ্রদাস স্মিতমুখে কহিল, তার বিয়ে এখনো হয়নি, কিন্তু হলেও আমার রাগ করা উচিত নয় মা। বরঞ্চ এই ভেবে শ্রদ্ধাই করবো যে ওদের বিশ্বাস সত্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলে, ওরা ঠকালে না কাউকে। কিন্তু কলকাতায় অনেককে দেখেচি যারা বাক্যের আড়ম্বরে মানে না কিছুই, জাতি-ভেদ বিশ্বাসও করে না, গালও দেয় প্রচুর, কিন্তু কাজের বেলাতেই গা-ঢাকা দেয়,—আর তাদের খুঁজে মেলে না। তাদেরই অশ্রদ্ধা করি আমি সবচেয়ে বেশি। রাগ ক'রো না মা, তোমার দ্বিজুটি হ'লো এই জাতের।

শুনিয়া দয়াময়ী মনে মনে যে অখুশী হইলেন তা নয়। দ্বিজুর সম্বন্ধে বলিলেন, ওটা ঐ রকম ফাঁকিবাজ। কিন্তু, আচ্ছা বিপিন, বন্দনাকে যদি তুই ঘৃণাই করিসনে তবে তার ছোঁয়া কিছু খাস্‌নে কেন ? ওকে রান্নাঘরে পাঠাতুম বলে তুই সে-ঘরে খাওয়াই ছেড়ে দিলি, খেতে লাগলি আমার ঘরে। আর কেউ না বুঝুক, আমিও বুঝতে পারিনি ভাবিস্ ?

বিপ্রদাস বলিল, তুমি বুঝবে না ত মা হয়েছিলে কেন ? কিন্তু আমি যে সত্যিই জাত মানি মা, আমি ত তার ছোঁয়া খেতে পারিনে। যেদিন মানবো না সেদিন প্রকাশ্যেই তার হাতে খাবো, একটুও লুকোচুরি করবো না।

দয়াময়ী বলিলেন, তুই জানিস্‌নে বিপিন, কি করে আমি তার কাছ থেকে এইটি ঢেকে বেড়াতুম। মেয়েটা এখানে আসুক না আসুক, দেখিস্ যেন একথা কখনো সে টের না পায়। তার ভারি লাগবে। তোকে সে বড় ভক্তি করে। তাঁহার শেষের কথাগুলি যেন সহসা স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, আমাকে সে ভক্তি করে কি না জানিনে মা, কিন্তু তার ছোঁয়া যে খাইনে এ সে জানে।

অমন অভিমানী মেয়ে এ জেনেও তোকে অত ভক্তি করতো ? তার মানে ?

ভক্তি করার কথা তোমরাই জানো মা, কিন্তু আমি জানি সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, —তোমাদের সমস্ত ঢাকা-ঢাকিই সেখানে নিষ্ফল হয়েচে।

দয়াময়ী ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিলেন, তার পরে বলিলেন, তাই বুঝি সে অতো করে পীড়াপীড়ি করতো ?

কিসের পীড়াপীড়ি মা ?

দয়াময়ী বলিতে লাগিলেন, আমি বিধবা মানুষ, আমার ভাতে-ভাত

কিন্তু সে তা কিছুতেই দেবে না। মার্কেট থেকে নানা নতুন তরকারী আনাবে, নিজে কুটে বেছে দেবে, বামুনপিসিকে দিয়ে দশখানা তরকারী জোর করে রাঁধিয়ে নিয়ে তবে ছাড়বে। ও জানতো সামনে এসে যায় দেওয়া চলে না তাকে পরের হাত দিয়ে ঘুষ পাঠাতে হয়। কেন, খেয়েও কি বুঝতে পারিসনি বিপিন, অমন রান্না দিদি তার বাপের জন্মেও রাঁধতে জানে না?

বিপ্রদাস সহাস্যে উত্তর দিল, না মা, অত লক্ষ্য করিনি। শুধু মাঝে মাঝে সন্দেহ হ'তো তোমার অতিথিদের সে-রান্নাঘরের বিপুল আয়োজনের টুকরা-টাকরা হয়ত আমাদের এ-রান্নাঘরেও ছিটকে এসে পড়েচে। কিন্তু সে যে দৈবকৃত নয় এক জনের ইচ্ছাকৃত এ খবর আনন্দের। কিন্তু তোমার শেষ আদেশ জানিয়ে দাও মা। ট্রেনের সময় হয়ে এলো, আমাকে এখনি ছুটতে হবে,—তার নিমন্ত্রণ তুমি রাখলে না প্রত্যাহার করলে তাই বলো।

দয়াময়ী সতীকে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলো বৌমা?

ছেলেবেলায় সতী শাশুড়ীর সম্মুখে স্বামীর সহিত কথা কহিত, কিন্তু এখন আর বলে না। প্রায়ই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, নয় নিরুত্তরে থাকে। কিন্তু আজ কথা কহিল, আস্তে আস্তে বলিল, থাকুগে মা, এখানে তার আর এসে কাজ নেই।

জবাব শুনিয়া শাশুড়ী খুশী হইতে পারিলেন না। তাঁহার অভিলাষ ছিল অন্য প্রকার, অথচ নিজের মুখে প্রকাশ করাও চলে না। বলিলেন, বড়-মানুষের মেয়ের অভিমান হলো বুঝি?

না মা, অভিমান নয়, কিন্তু যা করে আমরা চলে এসেচি তার পরে আর তাকে এখানে ডাকা চলে না।

কেন চলবে না বৌমা, একটা অন্যায় যদি হয়েই থাকে তার কি আর সংশোধন নেই?

নেই বলিনে, কিন্তু দরকার কি। আগেও অনেকবার সে আসতে চেয়েচে, কিন্তু কখনো আমরা রাজি হতে পারিনি, এখনো সমস্ত বাধা তেমনি আছে। সে ঢুকতো বলে উনি রান্নাঘরের সম্পর্ক ছেড়েছিলেন, কাজ কি তাকে এখানে এনে?

বিপ্রদাস কহিল, সে নালিশ তার, তোমার নয়। বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তবু বন্দনা আমাকে প্রচণ্ড ভক্তি করে, স্বয়ং মা তার সাক্ষী।

সতী মুখ তুলিয়া চাহিল, বোধ হয় হঠাৎ ভুলিয়া গেল, শাশুড়ী আছেন, বলিল, শুধু মা কেন, আমিও তার সাক্ষী। মেয়েরা ভক্তি যখন করে তখন নালিশ আর করে না। [illegible] কম পীড়ন করেন না, তবু পূজো বন্ধ না করে বলে দুঃখ দিয়েচেন

তিনি ভালোর জন্যেই। শাশুড়ীকে বলিল, তোমাকেও বন্দনা কম ভক্তি করেনি মা, কম ভালোবাসেনি। তোমার ধারণা তোমার ঘরে সে খাবার আয়োজন করে দিত কেবল ওঁর জন্যে? তা নয়, করত সে তোমাদের দু'জনের জন্যেই,—তোমাদের দু জনকেই ভালোবাসে। তার 'পরে দিয়েছিলে তুমি রান্নাঘরের 'ভার- সকলকে খেতে দেবার কাজ, কিন্তু তোমাকে অবহেলা করে সে আর সকলকে পোলাও-কালিয়া খাওয়াতে পারত না মা, ভাতে-ভাত সবাইকেই গিলতে হ'তো। কিন্তু আর কেন তাকে টানাটানি করা? আমরা যা চেয়েছিলুম সে আশা ঘুচেচে—আর সে ফিরবে না মা। এই বলিয়া সতী দ্রুত প্রস্থান করিল।

দারুণ বিস্ময়ে উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। সতীর স্বভাবে এরূপ উক্তি, এরূপ আচরণ এমনি সৃষ্টিছাড়া যে ভাবাই যায় না সে প্রকৃতিস্থ আছে। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার মা?

দয়াময়ী কহিলেন, জানিনে ত বাবা!

কিসের জন্যে বন্দনাকে তোমরা চেয়েছিলে মা? কিসের আশা ঘুচলো?

দয়াময়ী মনে মনে লজ্জায় মরিয়া গেলেন, কিছুতে মুখে আনিতে পারিলেন না কি তাঁর সঙ্কল্প ছিল। শুধু বলিলেন, সে-সব কথা আর একদিন হবে বিপিন, আজ না!

মা, অক্ষয়বাবুর মেয়ের সম্বন্ধে কি কিছু স্থির করলে? তাঁদের ত একটা জবাব দেওয়া চাই।

আমার আপত্তি নেই বিপিন, তোদের মত হলেই হবে। দ্বিজুকেও জিজ্ঞাসা করিস্ সে কি বলে। এই বলিয়া তিনি ওঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিপ্রদাস সংশয়ে পড়িল। স্পষ্ট বিশেষ হইল না, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া লইবারও সময় আর ছিল না।

বিপ্রদাস কলিকাতায় আসিয়া দেখিল বাড়ী খালি। বন্দনা ও তাহার পিতা ঘণ্টা কয়েক পূর্ব্বে চলিয়া গেছেন। এ সংশয় যে তাহার একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু এতটাও আশঙ্কা করে নাই। অন্নদা কারণ জানে না, শুধু এইটুকু জানে যে যাবার ইচ্ছা রায়সাহেবের তেমন ছিল না, কেবল কন্যাই জিদ করিয়া পিতাকে টানিয়া লইয়া গেছে। বন্দনার পরে দাবী কিছুই নাই, তাহার দায়িত্বও তাহার নয়, এখানে সে অতিথি মাত্র, তবু সে যে দেখা না করিয়া পীড়িত দ্বিজদাসকে অচেতন ফেলিয়া রাখিয়া অকারণ ব্যস্ততায় চলিয়া গেছে মনে করিতে তাহার ক্লেশ বোধ হইল। অনেকটা রাগের মতো—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া যেন শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রকাশ করা তাহার প্রকৃতি নয়, সে-ভাব তাহার [illegible] রহিয়া গেল।

দিন চারেক পরে বিপ্রদাস হাইকোর্ট হইতে ফিরিল প্রবল জ্বর লইয়া। হয়ত ম্যালেরিয়া, হয়ত বা আর কিছু। চোখ রাঙা, মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত বেশি, অন্নদা কাছে আসিলে বলিল, অন্নদি, অসুখ ত কখন হয় না, বহুকাল জরাসুর দৈত্যটাকে ফাঁকি দিয়ে এসেচি, এবার বুঝিবা সে সুদে, আসলে উসুল করে। মনে হচ্চে কিছু ভোগাবে, সহজে নিষ্কৃতি দেবে না।

অবস্থা দেখিয়া অন্নদা চিন্তিত হইল, কিন্তু নির্ভয়ের সুরে সাহস দিয়া বলিল, না দাদা, তোমার পুণ্যের দেহ, এতে দৈত্য-দানার বিক্রম চলবে না, তুমি দু'দিনেই ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিই—আমি তাচ্ছিল্য করতে পারবো না।

তাই দাও দিদি, বলিয়া বিপ্রদাস শয্যা গ্রহণ করিল।

অন্নদা বিপদে পড়িল। ওদিকে হঠাৎ বাসুদেবের অসুখের সংবাদে কাল দ্বিজদাস বাড়ী গেছে, দত্তমশাই সহরে নাই—মনিবের কাজে তিনিও ঢাকায়। একাকী কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সকালে আসিয়া বলিল, বিপিন, একটা কথা বলব ভাই রাগ করবে না ত?

তোমার কথায় কখনো রাগ করেচি অন্নদি?

অন্নদা পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, প্রাণ দিয়ে রোগের সেবা করতেই পারি, কিন্তু মুখ্যু মেয়েমানুষ জানিনে ত কিছু, বাড়ীতেও খবর পাঠাতে পারচিনে, ছেলের অসুখ—ফেলে রেখে বৌ আসবে কি করে—কিন্তু বন্দনাদিদিকে একটা খবর দিলে হয় না?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, বোম্বাই কি এ-পাড়া ও-পাড়া দিদি, যে, খবর পেয়ে সে দেখতে আসবে। হয়ত তার নুন আনতেই এদিকের পান্তা ফুরিয়ে যাবে। তাতে কাজ নেই।

অন্নদা জিভ কাটিয়া বলিল, বালাই ষাট, এমন কথা মুখে আনতে নেই ভাই। বন্দনাদিদি কলকাতায় আছে, এখনো তার বোম্বায়ে যাওয়া হয়নি।

বন্দনা কলকাতায় আছে?

হাঁ, তার মাসীর বাড়ীতে বালিগঞ্জে। মেসো পাঞ্জাবের বড় ডাক্তার, মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে এসেচেন। হঠাৎ হাওড়ার ইষ্টিশানে দেখা, তাঁরাও নাবচেন গাড়ী থেকে, এঁরাও যাচ্চেন বোম্বায়ে। মাসী জোর করে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, বললেন, দৈবাৎ যখন পাওয়া গেল তখন মেয়ের বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কিছুতে ছেড়ে দেবেন না। শুধু একদিন আটকে রেখে ওর বাপকে তাঁরা যেতে দিলে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, মাসীটি কি চেনা?

হাঁ, আপনার বড় মাসী। দূরে-দূরে থাকে। সর্ব্বদা দেখা-শুনা হয় না, সত্যি, কিন্তু আপনার লোক বটে।

তুমি এত কথা জানলে কি করে অন্নদি?

কাল এসেছিলেন তাঁরা বেড়াতে, দ্বিজুর খবর নিতে। দুপুরবেলায় ওপরের বারান্দায় বসে নাতির জন্যে কাঁথা সেলাই করচি, দেখি বাইরের উঠানে দু-গাড়ী লোক এসে উপস্থিত। মেয়ে পুরুষে অনেকগুলি। কে এঁরা? উঁকি মেরে দেখি আমাদের বন্দনাদিদি। কিন্তু সাজ সজ্জায় এমনি বদলেচে যে হঠাৎ চেনা যায় না, যেন সে মেয়ে নয়। কি করি কোথায় বসাই,—ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। খানিকপরে দিদি এলেন ওপরে, সকলের খবর নিলেন, খবর দিলেন—তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পেলুম অন্ততঃ মাসখানেক কলকাতায় থাকা হবে। বললেন, বেশ আছি। থিয়েটার, সিনেমা, চড়িভাতী, বাগান-বাড়ী—আমোদের শেষ নেই। নিত্য নতুন ঘটা।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, বাসুর অসুখের খবর তাকে দিয়েছিলে?

হাঁ, দিলুম বই কি। শুনে বললেন, ও কিছু না,—সেরে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, তাকে খবর দিয়ে কি হবে অন্নদি, আমিও সেরে যাবো। সে ক'টা দিন তুমি একলা পারবে না আমাকে দেখতে?

অন্নদা জোর করিয়া কহিল, পারবো বই কি ভাই, কিন্তু তবু মনে হয় একবার জানানো উচিত, নইলে বউ হয়ত দুঃখ করবে। হাজার হোক বোন ত।

ঠিকানা জানো?

আমাদের শোফার জানে। ওদের পৌছে দিয়ে এসেছিল।

বিপ্রদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা দাও একটা খবর। কিন্তু অতো আমোদ আহ্লাদ ছেড়ে কি সে আসতে পারে? মনে ত হয় না দিদি।

অন্নদা বলিল, মনে আমারও বড়ো হয় না ভাই। তার সাজ-গোজের কথাই কেবল চোখে পড়ে। তবুও একবার বলে পাঠাই।

বিপ্রদাস নিরুৎসুক ক্লান্ত কণ্ঠে শুধু বলিল, পাঠাও দিদি, তাই যখন তোমার ইচ্ছে।

১৭

হঠাৎ বড় মাসীর সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে বন্দনার যখন দেখা হইয়া গেল তখন বোম্বাই যাওয়া বন্ধ করিয়া তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনা মাসীর কষ্টসাধ্য

না। তিনি মেয়ের বিবাহ-উপলক্ষে স্বামীর কর্মস্থল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে দেশে আসিতেছিলেন। মাসীর প্রস্তাবে রাজি হওয়ার আসল কারণটা ছাড়া আরও একটা হেতু ছিল, এখানে তাহা প্রকাশ করা প্রয়োজন। বন্দনার ছেলেবেলা হইতে এতকাল সুদূর প্রবাসেই দিন কাটিয়াছে, তার শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই সে-দিকের, অথচ, যে সমাজের অন্তর্গত সে, তাহার বৃহত্তর অংশটাই আছে কলিকাতায়, ইহার সহিত আজও তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। সামান্য পরিচয় যেটুকু সে শুধু খবরের কাগজ, মাসিকপত্র ও সাধারণ সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের সহযোগে। কলিকাতায় সর্ব্বদা আনাগোনা যাহাদের, তাহাদের মুখে মুখে অনেক তথ্য মাঝে মাঝে তাহার কানে আসে—অ্যানিটা চ্যাটার্জি এম. এ, বিনীতা ব্যানার্জি বি. এ, অনসূয়া, চিত্রলেখা, প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি বহু জমকালো নাম ও চমকানো কাহিনী— বিংশ শতাব্দের অত্যাধুনিক মনোভাব ও রোমাঞ্চকর জীবন-যাত্রার বিবরণ—কিন্তু ইহার কতটা যে যথার্থ ও কতটা বানানো দূর হইতে নিঃসংশয়ে অনুমান করা ছিল তাহার পক্ষে কঠিন। তাই আপন সমাজের কোন চিত্রটা ছিল তাহার মনের মধ্যে অতিরঞ্জিত ঘোরালো, কোনটা বা ছিল অস্বাভাবিক রকমের ফিকা, এই ছবিগুলিই প্রত্যক্ষ পরিচয়ে স্পষ্ট ও সত্য করিয়া লইবার সুযোগ মাসীমার মেয়ে প্রকৃতির বিবাহ উপলক্ষে যখন মিলিল তখন বন্দনা উপেক্ষা করিতে পারিল না, সহজেই সম্মত হইয়া তাঁহার বালিগঞ্জের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। আপন দলের বহুজনের সঙ্গে তাঁহাদের জানা-শুনা, বিশেষতঃ প্রকৃতি এখানকার স্কুল-কলেজে পড়িয়াই বি. এ. পাশ করিয়াছে, তাহার নিজের বন্ধুবান্ধবীর সংখ্যাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। আসিয়া পর্য্যন্ত এই দলের মাঝখানেই বন্দনার এই কয়দিন কাটিল। পিতা অনাথ রায় বোম্বায়ে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু সুধীর রহিল কলিকাতায়। আসন্ন বিবাহের আনন্দোৎসব নিত্যই চলিয়াছে, সেদিন বেলঘরের একটা বাগানে পিকনিক সারিয়া সদলবলে বাড়ী ফিরবার পথেই সে দ্বিজদাসের সংবাদ লইতে এ-বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। এই খবরটাই অন্নদা সেদিন বিপ্রদাসকে দিয়াছিল।

মাসীর বাড়ীতে দলের লোকের আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, সলা-পরামর্শের কামাই নাই, আজও ছিল অনেকের চায়ের নিমন্ত্রণ। অতিথিগণ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, উপরের ঘরে মহাসমারোহে চলিয়াছে চা খাওয়া। এমন সময়ে বিপ্রদাসের প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যের দল অবহিত হইয়া উঠিল, কিন্তু শোফার দরজা খুলিয়া দিতে যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি অবতরণ করিল তাঁহার পোষাকের সামান্যতায় ও স্বল্পতায় সকলে বিস্মিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল।

মোটরের সঙ্গে মানুষটির সামঞ্জস্য নাই। অন্নদার পরণে ছিল সাদা থান, তেমনি একটা শাদা মোটা চাদর গায়ে জড়ানো, পা খালি, হাত খালি মাথায় আঁচলটা কপালের অর্দ্ধেকটা চাপা দিয়াছে—সে নিজেও যেন সলজ্জ সঙ্কোচে কিছু জড়সড়ো। ভৃত্য-বেহারাদের চাপকান-পাগড়ীর সাজ সজ্জায় বুঝা কঠিন কে কোন দেশের, তথাপি সম্মুখের লোকটাকে বাঙালী আন্দাজ করিয়া অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা দিদি আছেন?

সে বাঙালীই বটে, কহিল, হাঁ, আছেন। তাঁরা উপরে চা খাচ্চেন, আপনি ভেতরে এসে বসুন।

না, আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে একটু খবর দিতে পারবে না?

পারবো। কি বলতে হবে?

বলোগে বিপ্রদাসবাবুর বাড়ী থেকে অন্নদা এসেচে।

বেহারা চলিয়া গেল, অনতিবিলম্বে বন্দনা নীচে আসিয়া অন্নদার হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া বসাইল। এমন সে কখনও করে নাই, ভুলিয়া গেল সামাজিক পর্য্যায়ে এই বিধবা তাহার কাছে অনেক ছোট—ও-বাড়ীর দাসী মাত্র। অকারণে তাহার চোখ সজল হইয়া উঠিল, বলিল, অনুদি, তুমি যে আমার খবর নিতে আসবে এ আমি মনে করিনি। ভেবে ছিলুম আমাকে তোমরা ভুলে গেছো।

ভুলবো কেন দিদি, ভুলিনি। বড়বাবু আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বলতে—

না অনুদি, আমাকে আপনি বলে ডাকলে আর আমি জবাব দেবো না।

অন্নদা আপত্তি করিল না, শুধু হাসিয়া বলিল, ওদের মানুষ করেচি বলেই 'তুমি' বলে ডাকি, নইলে ও-বাড়ীর আমি দাসী বইত নয়!

বন্দনা বলিল, তা হোক। কিন্তু মুখুয্যেমশাই ত এসেচেন পাঁচ-ছ দিন হোল কলকাতায়, নিজে বুঝি একবার আসতে পারতেন না? তিনি ত জানেন আমি বোম্বায়ে যাইনি।

হাঁ, আমার মুখে এ খবর তিনি শুনেচেন। কিন্তু জানো ত দিদি তাঁর কত কাজ; এতটুকু সময় ছিল না।

একথা শুনিয়া বন্দনা খুশী হইল না, বলিল, কাজ সকলেরই আছে অনুদি। আমরা গিয়েছিলুম বলেই ভদ্রতারক্ষার ছলনায় তোমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, নইলে মনেও করতেন না। তাঁকে বোলো গিয়ে আমার মাসীমার তাঁদের মতো ঐশ্বর্য্য নেই বটে, তবু একবার আমার খোঁজ নিতে এ-বাড়ীতে পা দিলে তাঁর জাত যেতো না, মর্য্যাদারও লাঘব হ'তো না।

এ সকল অনুযোগের উত্তর অন্নদার দিবার নয়। সে ও বাটীতে যাইবার অনুরোধ করিতে গেল, কিন্তু শুনিবার ধৈর্য্য বন্দনার নাই, অন্নদার অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, না অনুদি সে হবে না। কোথাও যাবার আমার সময় নেই। কাল বাদে পরশু আমার বোনের বিয়ে।

পরশু?

হাঁ পরশু।

এ সময় অসুখের সংবাদ দেওয়া উচিত কি না অন্নদা ভাবিতেছিল, কিন্তু সে তখনি প্রশ্ন করিয়া উঠিল, আমাকে যাবার হুকুমটা দিলে কে? ছোটবাবু ত নেই জানি, বড়বাবু বোধ করি? কিন্তু তাঁকে বোলো গিয়ে হুকুম চালিয়ে তাঁর অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। আমি খাতকও নই, তাঁর জমিদারীর আমলাও নই। আমাকে অনুরোধ করতে হয় নিজে এসে। মেজদি ভাল আছেন?

হাঁ আছেন।

আর সকলে?

অন্নদা বলিল, খবর এসেচে ছেলের অসুখ।

কার অসুখ—বাসুর? কি হয়েচে তার?

সে আমি ঠিক জানিনে দিদি।

বন্দনা চিন্তিত মুখে বলিল, ছেলের অসুখ তবু নিজে না গিয়ে মুখুয্যেমশাই এখানে বসে আছেন যে বড়ো? মামলা-মকদ্দমা আর টাকা-কড়ির টানটাই কি হ'লো তাঁর বেশি অনুদি? একটা হিতাহিত বোধ থাকা উচিৎ।

অন্নদা বলিল, টাকার টান নয় দিদি, আজ দুদিন থেকে তিনি নিজেও শয্যাগত। ছেলের অসুখে সেখানে তারা বিব্রত, খবর দেওয়াও যায় না, অথচ এখানে দত্তমশাই পর্য্যন্ত নেই—তিনি গেছেন ঢাকায়, একা আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ কিছুই বুঝিনে, ভয় হয় পাছে শক্ত হয়ে ওঠে। বিপিনের কখনো কিছু হয় না বলেই ভাবনা। বিয়েটা চুকে গেলে একবার পারবে না যেতে দিদি?

শঙ্কায় বন্দনার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল—ডাক্তার এসেচেন? কি বলেন তিনি?

বললেন, ভয় নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য ডাক্তার ডাকতেও বলে গেলেন। অন্নদার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বন্দনার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, এ দু'টো দিন যেমন করে হোক কাটাবো, কিন্তু বিয়ে চুকে গেলেও যাবে না? আমাদের ওপর রাগ করেই থাকবে? তোমাদের কোথায় কি ঘটেচে আমার জানবার কথা নয়, জানিওনে,

কিন্তু এ জানি আর যে-ই দোষ করে থাক্ বিপিন কখনো করেনি। তাকে না জানলে হয়ত ভুল হয়, কিন্তু জানলে এ ভুল হবে না দিদি।

বন্দনা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, চলো আমি যাচ্ছি।

এখুনি যাবে ?

হ্যাঁ, এখুনি বই কি।

বাড়িতে বলে যাবে না ? এঁরা ভাববেন যে।

বলতে গেলে দেরি হবে অন্নদি, তুমি এসো। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মোটরে গিয়া বসিল। বেহারাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বলিয়া দিল, মাসীমাকে জানাইতে সে মেজদির বাড়িতে চলিল, সেখানে বিপ্রদাসবাবুর অসুখ!

বন্দনা আসিয়া যখন বিপ্রদাসের ঘরে প্রবেশ করিল তখন বেলা গেছে কিন্তু আলো জ্বালার সময় হয় নাই। বিপ্রদাস বালিশগুলা জড়ো করিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া বিছানায় বসিয়া, মুখ দেখিয়া মনে হয় না যে অসুখ গুরুতর। মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, নমস্কার করি। মেজদি উপস্থিত থাকলে রাগ করতেন, বলতেন, গুরুজনের পায়ের ধুলো নিয়েই প্রণাম করতে। কিন্তু ছুতে ভয় করে পাছে ছোঁয়া স্নান।

বিপ্রদাস কিছুই না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। বন্দনা বলিল, ডেকে পাঠিয়েছেন কেন,—সেবা করতে ? অন্নদি বলছিলো, ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েচে। কিন্তু একি ব্যাপার। ডাক্তারি ওষুধের শিশি যে! কবরেজের বড়ি কই ? ডাক্তার ডাকার বুদ্ধি দিলে কে আপনাকে ?

বিপ্রদাস কহিল, আমাদের চলতি ভাষায় ডেঁপো বলে একটা কথা আছে তার মানে জানো বন্দনা ?

বন্দনা বলিল, জানি মশাই জানি। মানুষ হয়ে যারা মানুষকে ঘেন্না করে, ছোঁয় না তাদের বলে। তাদের চেয়ে ডেঁপো সংসারে আর কেউ আছে না কি ?

বিপ্রদাস বলিল, আছে। (যাদের সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবার ধৈর্য্য নেই, অকারণে নির্দ্দোষীকে হুল ফুটিয়ে যারা বাহাদুরি করে তারা, তাদের দলের মস্ত বড় পাণ্ডা তুমি নিজে।)

অকারণে কোন্ নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে হুল ফুটিয়েচি আপনি বলে দিন ত শুনি ?

আমাকে বলে দিতে হবে না বন্দনা, সময় এলে নিজেই টের পাবে।

আচ্ছা. সেই দিনের প্রতীক্ষা করে রইলুম, এই বলিয়া বন্দনা খাটের কাছে একটা চৌকি আনিয়া লইয়া বসিল, বলিল, এখন বলুন নিজে কেমন আছেন ?

ভালো আছি, কিন্তু জ্বরটা রয়েচে। রাত্রে আর একটু বাড়বে বলে মনে হয়।

কিন্তু আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন? আমাকে আপনার কিসের দরকার?

দরকার আমার নয়, অন্নুদিদির, সেই বড় ভয় পেয়েচে। তার মুখ শুনলাম পরশু তোমার বোনের বিয়ে, চুকে গেলে একদিন এসো। আমার জবানি তোমার মেজদি কিছু খবর পাঠিয়েছেন সেগুলো তোমায় শোনোবো।

আজ পারেন না?

না, আজ নয়।

বন্দনা মিনিট-দুই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার পরে কহিল, মুখুয্যেমশাই অসুখ আপনার বেশি নয়, দু' দনেই সেরে উঠবেন। আমি জানি আমাকে প্রয়োজন নেই, তবুও আপনার সেবার ভাণ করেই আমি থাকবো, সেখানে ফিরে যাবো না। আমার তোরঙ্গটা আনতে লোক পাঠিয়ে দিয়েচি, আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, কিসের আপত্তি বন্দনা, তোমার থাকার? কিন্তু বোনের বিয়ে যে!

বিয়ে ত আমার সঙ্গে নয়—আমি না গেলেও বোনের বিয়ে আটকাবে না।

সত্যি থাকবে না বিয়েতে?

না।

কিন্তু এরই জন্যে যে কলকাতায় রয়ে গেলে?

বন্দনা কহিল, যাচ্ছিলুম বোম্বায়ে, ষ্টেশন থেকে ফিরে এলুম, কিন্তু ঠিক এই জন্যেই নয়। দূরে থাকি, আপন সমাজের প্রায় কাউকে চিনিনে, মুখে মুখে কত কথা শুনি, গল্প-উপন্যাসে কত-কি পড়ি, তাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারিনে—মনে হয় বুঝিবা আমরা সমাজ-ছাড়া এক-ঘরে। মাসীমা ডাকলেন, ভাবলুম প্রকৃতির বিয়ের উপলক্ষে দৈবাৎ যে সুযোগ মিললো, এমন আর পাবো না। তাই ফিরে এলুম মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, কিন্তু সেই বিয়েটাই যে বাকি এখনো। দলের লোকদের চেনবার সুযোগ পেলে কই?

সুযোগ পুরো পাইনি সত্যি, কিন্তু যতটা পেয়েচি সে-ই আমার যথেষ্ট।

নিজের সঙ্গে এঁদের কতখানি মিললো বন্দনা? শুনতে পারি কি?

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আপনি সেরে উঠুন তার পরে বিস্তারিত করে শোনাবো।

চাকর আলো জালিয়া দিয়া গেল। শিয়রের জানালাটা বন্ধ করিয়া বন্দনা ঔষধ খাওয়াইল, কহিল, আর বসে নয়, এবার আপনাকে শুতে হবে। এই বলিয়া এলো-মেলো বিছানাটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া বালিশগুলো ঠিক করিয়া দিল, বিপ্রদাস শুইয়া পড়িলে পা হইতে বুক পর্য্যন্ত চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিয়া বলিল, সেরে উঠে নিজেকে শুদ্ধ শুচি করে তুলতে না জানি কত গোবর-গঙ্গাজলই না আপনার লাগবে!

বিপ্রদাস দুই হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, এত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেবাযত্ন করতেও একটু জানো দেখচি।

জানি একটু? না মুখুয্যেমশাই, এ চলবে না। আমাদের সম্বন্ধে আপনাকে আরো একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে।

অর্থাৎ—

অর্থাৎ আমাদের নিন্দেই যদি করেন সজ্ঞানে করতে হবে। এমনধারা চোখ বুজে যা-তা বলতে দেবো না। বিপ্রদাসের মুখে পরিহাসের চাপা হাসি, কহিল, এই আমাদেরটা কারা বন্দনা? কাদের সম্বন্ধে আরও একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে? যাদের থেকে এইমাত্র পালিয়ে এলে তাদের?

কে বললে আমি পালিয়ে এলুম?

আমি বলচি।

জানলেন কি করে?

জানলুম তোমার মুখ দেখে।

বন্দনা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দ্বিজুবাবু একদিন বলেছিলেন দাদার চোখে কিছুই এড়ায় না। কথাটা যে কতখানি সত্যি আমি বিশ্বাস করিনি। আপনার অসুখ আমি চাইনে, কিন্তু এ আমাকে সত্যিই উদ্ধার করেচে। সত্যিই পালিয়ে এসে আমি বেঁচে গেছি। যে ক'টা দিন আপনি অসুস্থ আমি আপনার কাছেই থাকবো, তার পরে সোজা বাবার কাছে চলে যাবো— মাসীর বাড়িতে আর ফিরবো না। দূর থেকে যাদের দেখতে চেয়েছিলুম তাদের দেখা পেয়ে গেছি এমন ইচ্ছে আর নেই যে একটা দিনের জন্যেও ওদের মধ্যে গিয়ে কাটিয়ে আসি।

বিপ্রদাস নীরবে চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, ওদের শুধু শাড়ী গাড়ী আর মিথ্যে ভালোবাসার গল্প। কোথায় নৈনি আর কোথায় মুসৌরির হোটেল আমি জানিওনে, কিন্তু ওদের মুখে মুখে তার কি-যে নোঙরা চাপা ইঙ্গিত,—শুনতে শুনতে ইচ্ছে হ'তো, কোথাও যেন ছুটে পালিয়ে যাই। আজ এই ঘরের মধ্যে বসে

মনে হচ্ছে যেন এই ক'টা দিন অবিশ্রাম এলো-মেলো ধুলোবালির ঘূর্ণি-ঝড়ের মধ্যে আমার দিন-রাত কেটেচে। এর ভেতর ওরা বাঁচে কি করে মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস বলিল, সে রহস্য আমার জানার কথা নয়। মরুভূমির মধ্যে কবরগুলো যেমন টিকে থাকে বোধ করি তেমনি করে।

বন্দনা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুঃখের জীবন। ওদের না আছে শান্তি না আছে কোন ধর্ম্মের বালাই। কিছু বিশ্বাস করে না, কেবলি করে তর্ক। একটু থামিয়া বলিল, খবরের কাগজ পড়ে, ওরা জানে অনেক। পৃথিবীর কোথায় কি নিত্য ঘটচে কিছুই ওদের অজানা নয়। কিন্তু আমি ত ও-সব পড়তে পারিনে, তাই অর্দ্ধেক কথা বুঝতেই পারতুম না। শুনতে শুনতে যখন অরুচি ধরে যেতো তখন আর কোথাও সরে গিয়ে নিশ্বেস ফেলে বাঁচতুম। কিন্তু তাদের ত ক্লান্তি নেই, তারা বকতে বকতে সবাই যেন মেতে উঠতো।

কিন্তু তোমার বাবা কাছে থাকলে সুবিধে হ'ত বন্দনা। খবরের কাগজের সব খবর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই টের পেতে—ওদের কাছে ঠকতে হ'তো না।

বন্দনা হাসিমুখে সায় দিয়া বলিল, হাঁ, বাবার সে বাতিক আছে। সমস্ত খবর খুঁটিয়ে না পড়ে তাঁর তৃপ্তি নেই। কিন্তু আমাদের মেয়েদের তাতে দরকার কি বলুন ত? কি হবে জেনে পৃথিবীর কোথায় কি দিন-রাত ঘটচে?

এ কথা তোমার মেজদির মুখে শোভা পায় বন্দনা, তোমার মুখে নয়। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

বন্দনা বলিল, তারা কি আমার মেজদির চেয়ে বেশি জানে মনে করেচেন? একটুও না। শূন্য কলসী বলেই মুখ দিয়ে তাদের এত আওয়াজ বার হয়। তাদের আর কিছু না জেনে থাকি এ খবরটা জেনে নিয়েচি মুখুয্যেমশাই।

কিন্তু জ্ঞান ত চাই।

না চাইনে! জ্ঞানের আস্ফালনে মুখের মধু তাদের বিষ হয়ে উঠেচে। জানে তারা আমার মেজদির মতো সবাইকে ভালবাসতে? জানে না। পারে তারা মেজদির মতো ভক্তি করতে? পারে না। ওদের বন্ধুই কি কেউ আছে? মনে হয় কেউ নেই, এমনি পরস্পরের বিদ্বেষ। তাদের অভাবটাই কি কম? বাইরের জাঁক-জমকে বোঝাই যাবে না ভেতরটা ওদের এত ফোঁপরা। কিসের জন্যে ওদের নিয়ে এত মাতামাতি? সমস্ত ভেতরটা যে একেবারে ঘুণে ঝাঁঝরা করে দিয়েচে।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, হয়েচে কি বন্দনা, এত রাগ কিসের? কেউ টাকা ঠকিয়ে নেয়নি ত?

না, ঠকিয়ে নেয়নি, ধার নিয়েচে।

কত ?

বেশি না চার-পাঁচশ।

তাদের নাম জানো ত ?

জানতুম কিন্তু ভুলে গেছি। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, ছি ছি এত অল্প পরিচয়েও যে কেউ কারও কাছে টাকা চাইতে পারে আমি ভাবতেও পারিনে। বলতে মুখে বাধে না, লজ্জার ছায়া এতটুকু চোখে পড়ে না, এ যেন তাদের প্রতিদিনের ব্যাপার। এ কি করে সম্ভব হয় মুখুয্যেমশাই ?

বিপ্রদাসের মুখ গম্ভীর হইল, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, তোমার মনটাকে তারা বড় বিষিয়ে দিয়েচে বন্দনা, কিন্তু সবাই এমনি নয়, ঐ মাসীমার দলটাই তোমাদের সমস্ত দল নয়। যারা বাইরে রয়ে গেল, খুঁজলে হয়ত তাদেরও একদিন দেখা পাবে।

বন্দনা বলিল, পাই ভালোই। তখন ধারণা আমার সংশোধন করবো, কিন্তু যাদের দেখতে পেলুম তারা সবাই শিক্ষিত, সবাই পদস্থ লোকের আত্মীয়। গল্প-উপন্যাসের রঙ করা ভাষায় সজ্জিত হয়ে এরা দূর থেকে আমার চোখে কি আশ্চর্য্য অপরূপ হয়েই না দেখা দিত। মনে গর্ব্বের সীমা ছিল না, ভাবতুম আমাদের মেয়েদের পেয়েচি, পড়ার দুর্নাম এবার ঘুচলো। আমার সেই ভুল এবার ভেঙেচে মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, ভুল কিসের ? এঁরা যে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন এ তো মিথ্যে নয়।

শুনিয়া বন্দনা হাসিল, বলিল, না মিথ্যে হবে কেন, সাঁচাই। তবু আমার সান্ত্বনা এই যে সংখ্যায় এঁরা অত্যন্ত স্বল্প,—এঁদেরই গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের ডগায় ঠেলে তুলে হট্টগোল বাধানো যেমন নিষ্ফল তেমনি হাস্যকর।

বিপ্রদাস বলিল, এ হচ্চে তোমার আর এক ধরণের গোঁড়ামি। স্বধর্ম্মত্যাগের বিপদ আছে বন্দনা—সাবধান।

বন্দনা এ-কথায় কান দিল না, বলিতে লাগিল, এই নগণ্য দলের বাইরে রয়েচে বাঙলার প্রকাণ্ড নারী-সমাজ। এদের আমি আজও দেখিনি, বাইরে থেকে বোধ করি দেখাও মেলে না, তবু মনে হয় বাতাসের মতো এরাই আছে বাঙলার নিশ্বাসে মিশে। জানি, এদের মধ্যে আছে ছোট, আছে বড়,—বড়র দৃষ্টান্ত রয়েছে আমার মেজদিতে তাঁর শাশুড়ীতে—এবার কলকাতায় আসা আমার সার্থক হ'লো মুখুয্যে-মশাই। আপনি হাসচেন যে ?

ভাবছি, টাকার শোকটা মানুষকে কি রকম বক্তা করে তোলে। এ দোষটা আমারও আছে কিনা।

কোন্ টাকার শোক,—সেই পাঁচ শ'র?

তাই ত মনে হচ্চে।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, টাকার জন্যে আর ভাবনা নেই। আপনাকে সেবা করার মজুরী হিসাবে ডবল আদায় করে ছাড়বো। আপনি না দেন মায়ের কাছে আদায় হবে।

অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আটটা বাজে, বিপিনের খাবার সময় হ'লো।

বন্দনা ব্যস্ত হইয়া বলিল, চলো অনুদি যাচ্চি। কেমন, যাই মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, যাও। কিন্তু সেবার ত্রুটি হলে মজুরী কাটা যাবে।

ত্রুটি হবে না মশাই, হবে না। বলিয়া সেও হাসি-মুখে বাহির হইয়া গেল।

১৮

বন্দনা বলিল, খাবার হয়ে গেছে নিয়ে আসি?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তোমার কেবলি চেষ্টা হচ্চে আমার জাত মারার। কিন্তু সন্ধ্যে-আহ্নিক এখনো করিনি, আগে তার উদ্যোগ করিয়ে দাও।

আমি নিজে করে দেবো মুখুয্যেমশাই?

নইলে কে আর আছে এখানে যে করে দেবে? কিন্তু মার পূজোর ঘরে যেতে পারবো না—গায়ে জোর নেই,—এই ঘরে দিতে হবে। আগে দেখবো কেমন আয়োজন করো, খুঁত ধরবার কিছু থাকে কি না, তখন বুঝে দেখবো খাবার তুমি আনবে না আমাদের বামুনঠাকুর আনবে।

শুনিয়া বন্দনা পুলকে ভরিয়া গেল, বলিল; আমি এই সর্ত্তেই রাজি। কিন্তু একজামিনে পাশ যদি হই তখন কিন্তু মিথ্যে ছলনায় ফেল করাতে পারবেন না। কথা দিন।

দিলুম কথা। কিন্তু আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে কি তোমার এত লাভ?

তা আমি বলবো না, এই বলিয়া বন্দনা দ্রুত প্রস্থান করিল।

মিনিট-দশেকের মধ্যে সে স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া একটি জলপূর্ণ ঘটি লইয়া প্রবেশ করিল। ঘরের যে দিকটায় খোলা জানালা দিয়া পুবের রোদ আসিয়া পড়িয়াছে-সেই স্থানটি জল দিয়া ভাল করিয়া মার্জ্জনা করিয়া নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া লইল, পূজার ঘর হইতে আসন কোশাকুশি প্রভৃতি আনিয়া সাজাইল, ধূপদানি

আনিয়া ধূপ জ্বালাইল, তারপরে বিপ্রদাসের ধুতি গামছা এবং হাত-মুখ ধোবার পাত্র আনিয়া কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, আজ সময় নেই ফুল তুলে এনে মালা গেঁথে দেবার, নইলে দিতুম, কাল এ ক্রটি হবে না। কিন্তু আধ ঘণ্টা সময় দিলুম, এর বেশি নয়। এখন বেজেছে ন'টা— ঠিক সাড়ে ন'টায় আবার আসবো। এর মধ্যে আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না, আমি চললুম। এই বলিয়া সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

বিপ্রদাস কোন কথা না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। আধ ঘণ্টা পরে বন্দনা যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া বিপ্রদাস একটা আরাম-চৌকিতে হেলান দিয়া বসিয়াছে।

পাশ না ফেল মখুয্যেমশাই?

পাশ ফার্ষ্ট ডিভিসনে। আমার মাকেও হার মানিয়েচ। কার সাধ্য বলে তোমাকে ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছদের ইস্কুল-কলেজে পড়ে বি এ., পাশ করেচ।

এবার তা হলে খাবার আনি?

আনো। কিন্তু তার আগে এগুলো রেখে এসোগে, বলিয়া বিপ্রদাস কোশাকুশি প্রভৃতি দেখাইয়া দিল।

এ আর আমাকে বলে দিতে হবে না মশাই জানি, বলিয়া পূজার পাত্রগুলি সে হাতে তুলিয়া লইয়াছে এমন সময়ে ঘরের বাহিরে বারান্দায় অনেকগুলি উঁচুগোড়ালি জুতার খুট্ খুট্ শব্দ একসঙ্গে কানে আসিয়া পৌছিল, এবং পরক্ষণে অন্নদা দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া বলিল, বন্দনাদিদি, তোমার মাসীমা—

মাসী এবং আরও দুই তিনটি অল্প-বয়সী মেয়ে একেবারে ভিতরে আসিয়া পড়িলেন, বিপ্রদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল, আসুন।

মাসী বলিলেন, নীচ থেকেই খবর পেলুম বিপ্রদাসবাবু ভালো আছেন—

বিপ্রদাস কহিল, হাঁ, আমি ভাল আছি।

আগন্তুক মেয়েরা বন্দনাকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, ভিজা চুলে গরদের শাড়ী ভিজিয়াছে। এলো, কালো চুলের রাশি পিঠের 'পরে ছড়ানো, দুই হাতে পূজোর জিনিষ পত্র, তাহার এ মূর্ত্তি তাহাদের শুধু অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত নয়, অভাবনীয়। বন্দনা বলিল, আপনারা দোর ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ান, এগুলি রেখে আসিগে।

একটি মেয়ে বলিল ছোঁয়া যাবে বুঝি?

হাঁ, বলিয়া বন্দনা চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পরে সে সেই বেশেই ফিরিয়া আসিয়া বিপ্রদাসের চেয়ারের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। মাসী বলিলেন, আমাদের না জানিয়ে তুমি চলে এলে সেজন্যে রাগ করিনে, কিন্তু আজ তোমার বোনের বিয়ে—তোমাকে যেতে হবে।

মেয়ে দু'টি বলিল, আমরা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেচি।

বন্দনা বলিল, না মাসীমা, আমার যাওয়া হবে না।

সে কি কথা বন্দনা! না গেলে প্রকৃতি কত দুঃখ করবে জানো?

জানি, তবু আমি যেতে পারবো না।

শুনিয়া মাসী বিস্ময় ও ক্ষোভে অধীর হইয়া বলিলেন, কিন্তু এই জন্যেই তোমার বোম্বায়ে যাওয়া হ'ল না—এই জন্যেই তোমার বাবা আমার কাছে তোমাকে রেখে গেলেন। তিনি শুনলে কি বলবেন বলো ত?

সেই মেয়েটি বলিল, তা ছাড়া সুধীরবাবু—মিষ্টার ডাটা ভারি রাগ করেচেন। আপনার চলে আসাটা তিনি মোটে পছন্দ করেননি।

বন্দনা তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু জবাব দিল মাসীকে, বলিল, আমি না গেলে প্রকৃতির বিয়ে আটকাবে না, কিন্তু গেলে মুখুয্যেমশায়ের সেবার ত্রুটি হবে। ওঁকে দেখবার কেউ নেই।

কিন্তু উনি ত ভাল হয়ে গেছেন। তোমাকে যেতে বলা ওঁর উচিত। এই বলিয়া মাসী বিপ্রদাসের দিকে চাহিলেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক কথা। আমার যেতে বলাও উচিত, বন্দনার যাওয়াও উচিত। বরঞ্চ না গেলেই অন্যায় হবে।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া কহিল, না—অন্যায় হবে আমি মনে করিনে। বেশ আপনি বলচেন যেতে আমি যাবো। কিন্তু রাত্রেই চলে আসবো, সেখানে থাকতে পারবো না। এ অনুমতি মাসীমাকে দিতে হবে।

একটা রাতও থাকতে পারবে না?

না।

আচ্ছা তাই হবে, বলিয়া মাসী মনে মনে রাগ করিয়া দলবল লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিপ্রদাস বলিল, দেখলে তো তোমার মাসীমা রাগ করে চলে গেলেন; কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল হ'লো কেন?

বন্দনা বলিল, রাগ করে গেলেন জানি, কিন্তু শুধু খেয়ালের বশেই যেতে চাইচিনে তা নয়। ওদের যা-কিছু সমস্তর উপরেই আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। তাই ওখানে আর যেতে চাইনে মুখুয্যেমশাই।

এটা একটু বাড়াবাড়ি বন্দনা।

সত্যই বাড়াবাড়ি কিনা বলা শক্ত। আমি সর্ব্বদাই নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করি, অথচ বেশ বুঝতে পারি ওদের মধ্যে গিয়ে আমার না থাকে সুখ, না থাকে স্বস্তি। একবার বোম্বায়ে একটা কাপড়ের কলের কারখানা দেখতে গিয়েছিলুম, কেবলি আমার সেই কথা মনে হতে থাকে—তার কত কল কত চাকা আশে পাশে সামনে পিছনে অবিশ্রাম ঘুরচে—একটু অসাবধান হলেই যেন ঘাড় মুখ গুঁজড়ে তার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। ওসব দেখতে যে ভাল লাগে তা নয়, তবু মনে হয় বেরুতে পারলে বাঁচি; কিন্তু আর দেরী করবো না, আপনার খাবার আনিগে, বলিয়া বাহির হইতে গিয়াই চোখ পড়িল দ্বারের সম্মুখে পায়ের ধূলা, জুতোর দাগ; থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খাবার আনা হ'ল না মুখুয্যেমশাই, একটু সবুর করতে হবে। চাকর দিয়ে এগুলো আগে ধুইয়ে ফেলি, এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, বিপ্রদাস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, এত খুঁটিনাটি তুমি শিখলে কার কাছে বন্দনা?

শুনিয়া বন্দনা নিজেও আশ্চর্য্য হইল, বলিল, কে শেখালে আমার মনে নেই মুখুয্যেমশাই, বলিয়া একটু চুপ করিয়া কহিল, বোধ হয় কেউ শেখায়নি। আমার আপনিই মনে হচ্চে, আপনাকে সেবা করার এসব অপরিহার্য্য অঙ্গ, না করলেই ত্রুটি হবে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিকালের দিকে অভ্যস্ত এবং যথোচিত সাজ-সজ্জা করিয়া বন্দনা বিপ্রদাসের ঘরের খোলা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, চললুম বোনের বিয়ে দেখতে। মাসী ছাড়লেন না বলেই যেতে হচ্চে।

বিপ্রদাস কহিল, আশীর্ব্বাদ করি তুমিও যেন শীঘ্র এই অত্যাচারের শোধ নিতে পারো। তখন ঐ মাসাকে পাঞ্জাব থেকে হিঁচড়ে বোম্বায়ে টেনে নিয়ে যেও।

মাসীর ওপর রাগ নেই, কিন্তু আপনাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবো। ভয় নেই গাড়ী-ভাড়া আমরাই দেবো, আপনার নিজের লাগবে না। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া কহিল, ফিরতে আমার রাত হবে, কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থা করে গেলুম, অন্যথা হলে এসে রাগ করবো।

করবে বই কি! না করলেই সকলে আশ্চর্য্য হবে। ভাববে, শরীর ভালো নেই, বিয়ে-বাড়ীতে খেয়ে বোধ হয় অসুখ করেচে।

বন্দনা হাসি-মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, হয়েচে আমার গুণ-ব্যাখ্যা করা; কিন্তু সে কথা থাক, আপনি সন্ধ্যে-আহ্নিক করতে নীচে যাবেন না যেন। অনুদি এই ঘরেই সব

এনে দেবে। তার আধ ঘণ্টা পরেই ঠাকুর দিয়ে যাবে খাবার, এক ঘণ্টা পরে ঝড়ু ওষুধ দিয়ে আলো নিবিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে চলে যাবে। এই হুকুম সকলকে দিয়ে গেলুম। বুঝলেন?

হাঁ বুঝেছি।

তবে চললুম।

যাও। কিন্তু চমৎকার মানিয়েচে তোমাকে বন্দনা, এ কথা স্বীকার করবোই। কারণ, যে-পোষাকটা পরেচো এইটেই হ'লো তোমার স্বাভাবিক, যেটা এখানে পরে থাকো সেটা কৃত্রিম।

সে কি কথা মুখুয্যেমশাই,—ওরা বলে মেয়েদের জুতো পরা আপনি দেখতে পারেন না?

ওরা ভুল বলে, যেমন বলে তোমার হাতে আমি খেতে পারিনে।

বন্দনা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ভুল হবে কেন মুখুয্যেমশাই, আমার হাতে খেতে সত্যিই ত আপনার আপত্তি ছিল।

বিপ্রদাস বলিল, আপত্তি ছিল, কিন্তু আপত্তিটা সত্যিকারের হলে সে আজও থাকতো, খেতো না।

কথাটা বন্দনা বুঝিল না, কিন্তু বিপ্রদাসের উক্তি অসত্য বলিয়া মনে করাও কঠিন, বলিল, দ্বিজুবাবু একদিন বলেছিলেন দাদার মনের কথা কেউ জানতে পারে না, যেটা শুধু বাইরের তাই কেবল লোকে টের পায়; কিন্তু যা অন্তরের তা অন্তরেই চাপা থাকে, মুখুয্যেমশাই এ কি সত্যি?

উত্তরে বিপ্রদাস শুধু একটু হাসিল, তারপরে বলিল, বন্দনা, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। যদি সত্যিই থাকতে সেখানে ইচ্ছা না হয় থেকো না—চলে এসো।

চলেই আসবো মুখুয্যেমশাই, থাকতে সেখানে পারবো না। এই বলিয়া বন্দনা আর বিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

পরদিন সকালে দেখা হইলে বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, বোনের বিয়ে নির্বিঘ্নে সমাধা হলো?

হাঁ হ'লো—বিঘ্ন কিছু ঘটেনি।

নিজের জিদই বজায় রইলো, মাসীর অনুরোধ রাখলে না? কত রাতে ফিরলে?

রাত্রি তখন তিনটে। মাসীর কথা রাখা চলল না, রাত্রেই ফিরতে হ'লো। একটুখানি থামিয়া বোধ হয় বন্দনা ভাবিয়া লইল বলা উচিত কি-না, তার পরেই সে

বলিতে লাগিল, মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিলুম কিন্তু করে এসেচি অনেক। এক বছরে করতে পারিনি মিনিট পাঁচ-ছয়েই তা হয়ে গেল। সুধীরের সঙ্গে শেষ করে এলুম।

বিপ্রদাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, বলো কি!

হ্যাঁ, তাই। কিন্তু ওকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে আসিনি। আজ সকালে। মেয়েটিকে দেখেছিলেন তার নাম হেম। হেমনলিনী রায়। ওর জিম্মাতেই সুধীরে দিয়ে এলুম। আবার আমার সেই বোম্বায়ের কলের কথাই মনে পড়ে, তার মতো ওদে ওখানেও ভালবাসার টানা-পোড়েন দেখতে দেখতে মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। আবা ভাঙেও তেমনি।

বিপ্রদাস তেমনি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপারটা হ'লো কি? সুধীরের স হঠাৎ শেষ করে আসার মানে?

বন্দনা কহিল, শেষ করার মানে শেষ করা। কিন্তু তাই বলে ওখানে হঠা বলেও কিছু নেই। ওদের তাল অসম্ভব দ্রুত বলেই বাইরে থেকে 'হঠাৎ' বলে ভ্র হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। সুধীর আমাকে ডেকে বললে আমার অত্যন্ত অন্যা হয়েচে। বললুম, কি অন্যায় হয়েচে সুধীর? সে বললে, কাউকে না বলে—অর্থা তাকে না জানিয়ে—অকস্মাৎ এ-বাড়ীতে চলে আসা আমার খুব গর্হিত কাজ হয়েচে বিশেষতঃ সেখানে বিপ্রদাসবাবু ছাড়া আর কেউ নেই যখন। বললুম, সেখানে অন্নদাদিদি আছে। সুধীর বললে, কিন্তু সে দাসী ছাড়া আর কিছুই নয়। আ বললুম, ও-বাড়ীতে তাঁকে দিদি বলে সবাই ডাকে। শুনে সেই হেম মেয়েটি মু টিপে একটু হেসে বললে, পাড়াগাঁয়ে ও-রকম ডাকার রীতি আছে শুনেচি, তাতে দাসী-চাকরের অহঙ্কার বাড়ে, আর কিছু বাড়ে না। তারা নিজেরাও বড় হয়ে ও না। সুধীর বললে, এঁদের কাছে তুমি বলেচো যে এখানে থাকতে পারবে না রায়েই ফিরে যাবে; কিন্তু সে-বাড়ীতে তোমার একলা থাকাটা আমরা কেউ পছন্দ করিনে। তোমার বাবা শুনলেই বা কি বলবেন? বললুম, বাবা কি বলবেন সে ভাবনা তোমার নয় আমার। কিন্তু আরও যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁদের মধ্যে কি তুমি নিজেও আছ? হেম বললে, নিশ্চয়ই আছেন। সকলকে ছাড়া ত উনি নন এই মেয়েটার গায়ে-পড়া মন্তব্যের উত্তর দিতে ইচ্ছে হ'ল না, তাই সুধীরকে বললুম তোমার এ কথার জবাবে আমিও বলতে পারতুম যে অনর্থক ছুটি নিয়ে তোমার কলকাতায় থাকাটা আমিও পছন্দ করিনে, কিন্তু সে কথা আমি বলব না। তুমি যে নোংরা ইঙ্গিত করলে তা ইতর সমাজেই চলে, কিন্তু তোমাদের বড়-দলেও যে সে সমান সচল এ আমি জানতুম না, কিন্তু আর আমার সময় নেই, গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েচে

আমি চললুম। সেই মেয়েটা বলে উঠলো, যা অশোভন, যা অনুচিত তার আলোচনা ছোট বড় সকল দলেই চলে জানবেন। বললুম, আপনারা যত খুশি আলোচনা চালান আপত্তি নেই। আমি উঠলুম। সুধীর হঠাৎ কেমনধারা যেন হয়ে গেল,—মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল,—নিজেকে সামলে বললে, তোমার মাসীমাকেও জানিয়ে যাবে না? বললুম, তাঁকে জানানোই আছে বিয়ে হয়ে গেলেই আমি চলে যাবো যত রাত্রই হোক। সুধীর বললে, কাল তোমার সঙ্গে কি একবার দেখা হতে পারবে? বললুম, না। সে বললে, পরশু? বললুম, পরশুও না।

তার পরের দিন?

না তার পরের দিনও নয়।

কবে তোমার সময় হবে?

সময় আমার হবে না।

কিন্তু আমার যে একটা বিশেষ জরুরি কথা আলোচনা করবার আছে?

তোমার হয়ত আছে কিন্তু আমার নেই। এই বলে উঠে পড়লুম।

সুধীর আমাকে যে চেনে না, তা নয়, সঙ্গে এগিয়ে আসতে সাহস করলে না, সেই-খানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি গাড়ীতে এসে বসলুম।

বিপ্রদাস ঈষৎ হাসিয়া কহিল, এর মানে কি শেষ করে দেওয়া বন্দনা? একটু-খানি কলহ। সন্দেহ যদি থাকে দেখা হলে তোমার মেজদিকে জিজ্ঞেস করে নিও।

বন্দনা হাসিল না, গম্ভীর হইয়া বলিল, কাউকে জিজ্ঞেসা করার প্রয়োজন নেই মুখুয্যেমশাই, আমি জানি আমাদের শেষ হয়ে গেছে, এ আর ফিরবে না।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বিপ্রদাস হতবুদ্ধি হইয়া রহিল,—বলো কি বন্দনা, এত বড় জিনিষ কি কখনও এত অল্পেই শেষ হতে পারে? সুধীরের আঘাতটাই একবার ভেবে দেখো দিকি।

বন্দনা বলিল, ভেবে দেখেছি মুখুয্যেমশাই। এ আঘাত সামলাতে সুধীরের বেশী দিন লাগবে না, আমি জানি ঐ হেম মেয়েটিই তাকে পথ দেখিয়ে দেবে; কিন্তু আমি নিজের কথা ভাবছিলুম। শুধু যে গাড়ীতে বসেই ভেবেচি তা নয়, কাল বিছানায় শুয়ে সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। অস্বস্তি বোধ করেচি সত্যি, কিন্তু কষ্ট আমি পাইনি।

কষ্ট পাবে রাগ পড়ে গেলে। তখন এই সুধীরের জন্যেই আবার পথ চেয়ে থাকবে, বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

এ হাসিতেও বন্দনা যোগ দিল না, শান্তভাবে বলিল, রাগ আমার নেই। কেবল

এই অনুতাপ হয় যে, চলে আসার সময় যদি কঠিন কথা আমার মুখ দিয়ে বার না হতো। দেখিয়ে এলুম যেন দোষ তাঁর,—জানিয়ে এলুম মর্ম্মাহত হয়ে আমি বিদায় নিলুম। কিন্তু তাতো সত্যি নয়, এই মিথ্যে আচরণের জন্তেই শুধু লজ্জা বোধ করি মুখুয্যেমশাই, আর কিছুর জন্তেই নয়। তাহার কথার শেষের দিকে চোখ যেন সজল হইয়া আসিল।

বিপ্রদাসের মনের বিস্ময় বহুগুণে বাড়িয়া গেল, এ যে ছলনা নয় এতক্ষণে সে বুঝিল। বলিল, সুধীরকে তুমি কি সত্যিই আর ভালবাসো না?

না।

এতদিন ত বাসতে! এত সহজে এ ভালবাসা গেল কি করে?

এত সহজে গেল বলেই এত সহজে এর উত্তর পেলুম। নইলে আপনার কাছে মিথ্যে বলতে হোত। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি জানতে চাইলেন কোনদিন সুধীরকে ভালোবেসেছিলুম কি-না! সেদিন ভাবতুম সত্যিই ভালোবাসি; কিন্তু তার পরেই আর একজন পড়লো চোখে—সুধীর গেল মিলিয়ে! এখন দেখি সেও গেছে মিলিয়ে। শুনে হয়ত আপনার ঘৃণা হবে, মনে হবে এমন তরল মন ত দেখিনি। আমি জানি মেয়েদের এ লজ্জার কথা,— কোন মেয়েই এ স্বীকার করতে চায় না—এ যেন তাদের চরিত্রকেই কলুষিত করে দেয়? হয়ত আমিও কারো কাছে মানতে পারতুম না, কিন্তু কেন জানিনে আপনার কাছে কোন কথা বলতেই আমার লজ্জা করে না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, হয়ত এই আমার স্বভাব, হয়ত এ আমার বয়সের স্বধর্ম্ম, অন্তর শূন্য থাকতে চায় না, হাতড়ে বেড়ায় চারিদিকে। কিংবা এমনই হয়ত সকল মেয়েরই প্রকৃতি, ভালোবাসার পাত্র যে কে সমস্ত জীবনে খুঁজেই পায় না। এই বলিয়া স্থির হইয়া মনে মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তার পরেই বলিয়া উঠিল, কিংবা হয়ত খুঁজে পাবার জিনিষ নয় মুখুয্যেমশাই—ওটা মরীচিকা।

বিপ্রদাস তেমনই মৌন হইয়া রহিল। বন্দনার যেন মনের আগল খুলিয়া গেছে, বলিতে লাগিল, এই সুধীরের সঙ্গেই এক বছর পূর্ব্বে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছিল, শুধু তার মায়ের অসুখ বলেই হতে পারেনি। কাল ঘরে ফিরে এসে ভাবছিলুম বিয়ে যদি সেদিন হয়ে যেতো, আজ কি মন আমার এমনি করে তাকে ঠেলে ফেলে দিতো? মনকে শাসনে রাখতুম কি দিয়ে? ধর্ম্মবুদ্ধি দিয়ে? সংস্কার দিয়ে? কিন্তু অবাধ্য মন শাসন মানতে যদি না চাইতো কি হতো তখন? যাদের

মধ্যে এই কটা দিন কাটিয়ে এলুম ঠিক কি তাদের মতন ? এমনি ষড়যন্ত্র আর লুকোচুরিতে মন পরিপূর্ণ করে শুকনো হাসি মুখে টেনে টেনে লোক ভুলিয়ে বেড়াতুম ? এমনি পরস্পরের নিন্দে করে, হিংসে করে, শত্রুতা করে ? কিন্তু আপনি কথা কইচেন না কেন মুখুয্যেমশাই ?

বিপ্রদাস বলিল, তোমার মনের মধ্যে যে ঝড় বইচে তার ভয়ানক বেগের সঙ্গে আমি চলতে পারবো কেন বন্দনা, কাজেই চুপ করে আছি।

বন্দনা বলিল, না সে হবে না, এমন করে এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবো না। জবাব দিন !

কিন্তু শান্ত না হলে জবাব দিয়ে লাভ কি ? তোমার আজকের অবস্থা যে স্বাভাবিক নয় একথা তুমি বুঝতে পারবে কেন ?

কেন পারবো না মুখুয্যেমশাই, বুদ্ধি ত আমার যায়নি।

যায়নি কিন্তু ঘুলিয়ে আছে। এখন থাক্। সন্ধ্যের পর সমস্ত কাজকর্ম্ম সেরে আমার কাছে এসে যখন স্থির হয়ে বসবে তখন বলবো। পারি তখনি এর জবাব দেবো।

তবে সেই ভালো, এখন আমারও যে সময় নেই—এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া গেল। বস্তুতঃ তাহার কাজের অবধি নাই। সকালে ছুটি লইয়া অন্নদা কালীঘাটে গেছে, সে কাজগুলোও আজ তাহারই কাঁধে পড়িয়াছে। কত চাকর-বাকর, কত ছেলে এখানে থাকিয়া স্কুল-কলেজে পড়ে,—তাহাদের কত রকমের প্রয়োজন। কাজের ভিড়ে তাহার মনেও পড়িল না যে রাত্রি ঘুমায় নাই, সে আজ ভারি ক্লান্ত।

সন্ধ্যার পর বিপ্রদাসের রাত্রির খাওয়া সাঙ্গ হইল, নীচের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া বন্দনা তাহার শয্যার কাছে আসিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিল, বলিল, মুখুয্যে-মশাই, একটা কথার সত্যি জবাব দেবেন ?

বিপ্রদাস বলিল, সচরাচর তাইত দিয়ে থাকি। প্রশ্নটা কি ?

বন্দনা বলিল, মেজদিদিকে আপনি কি সত্যই ভালবাসেন ? ছেলেবেলায় আপনাদের বিয়ে হয়েচে—সে কতদিনের কথা—কখন কি এর অন্যথা ঘটে নি ?

বিপ্রদাস অবাক হইয়া গেল। এমন কথা যে কাহারও মনে আসিতে পারে সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, তোমার মেজ-দিদিকেই বরঞ্চ এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করো।

বন্দনা বলিল, তিনি জানবেন কি করে ? আপনার আসল মনের কথা ত শুনেচি কেউ জানতে পারে না। না বলতে চান বলবেন না, আমি একরকম করে বুঝে নেবো, কিন্তু বললে সত্যি কথাই আপনাকে বলতে হবে।

সত্যি কথাই বলবো, কিন্তু আমাকে কি তোমার সন্দেহ হয় ?

হয়। আপনি অনেক বড় মানুষ, কিন্তু তবুও মানুষ। মনে হয় কোথায় যেন আপনি ভারি একলা, সেখানে আপনার কেউ সঙ্গী নেই। এ কথা কি সত্যি নয় ?

বিপ্রদাস এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিল না, বলিল, স্ত্রীকে ভালবাসা যে আমার ধর্ম্ম বন্দনা।

বন্দনা বলিল, ধর্ম্ম যতদূর প্রসারিত ততদূর আপনি খাঁটি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কি সংসারে কিছু নেই ?

দেখতে ত পাইনে বন্দনা।

বন্দনা বলিল, আমি দেখতে পাই মুখুয্যেমশাই। বলবো সে কথা।

বিপ্রদাসের মুখ সহসা যেন পাণ্ডুর হইয়া উঠিল,—বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ মুখে যেন রক্তের লেশ নাই, দুই হাত সম্মুখে বাড়াইয়া বলিল, না, একটি কথাও নয় বন্দনা। আজ তোমার ঘরে যাও,—কাল হোক, পরশু হোক,—আবার যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে আলোচনার বুদ্ধি ফিরে পাবে তখন এর জবাব দেবো। কিংবা হয়তো আপনিই তখন বুঝবে ঐ যারা তোমার মাসীর বাড়ীতে বুদ্ধিকে তোমার আচ্ছন্ন করেচে তারাই সব নয়। ধর্ম্ম যাদের কাছে অত্যাজ্য তারাও আছে, জগতে তারাও বাস করে। না না, আর তর্ক নয়,—তুমি যাও।

বন্দনা বুঝিল এ আদেশ অবহেলার নয়। এই হয়ত সেই বস্তু যাহাকে বাড়াশুদ্ধ সকলে ভয় করে। বন্দনা নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৯

পরদিন বিকালের দিকে বন্দনা আসিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, আবার চললুম মাসীমার বাড়ীতে। এবার আর ঘণ্টা-কয়েকের জন্য নয়, এবার যতদিন না মাসী আমাকে বোম্বায়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন ততদিন।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ আরজেণ্ট টেলিগ্রামে এসেচে বাবার হুকুম। কাল সকালবেলা মাসী গাড়ী পাঠাবেন আমাকে নিতে।

বিপ্রদাস কহিল, অর্থাৎ বোঝা গেল তোমার মাসীর প্রতিশোধ নেবার অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি আছে। এ বোধ হয় তাঁরই প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব। কই দেখি কাগজটা ?

না, সে আপনাকে দেখাতে পারবো না।

শুনিয়া বিপ্রদাস ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ভগবান যে কারো দর্প রাখেন না এ তারই নমুনা। এতদিন ধারণা ছিল আমাকে জড়ানো যায় না, কিন্তু দেখচি যায়। অন্ততঃ তেমন লোকও আছে। তোমার মাসীর মাথায় এ ফন্দিও খেলেচে। দাও না পড়ে দেখি অভিযোগটা কতখানি গুরুতর, বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

এবার বন্দনা কাগজখানা তাঁহার হাতে দিল। রায়সাহেবের সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম সমস্তটা আগাগোড়া পড়িয়া সেটা ফিরাইয়া দিয়া বিপ্রদাস বলিল, মোটের ওপর তোমার বাবা অসঙ্গত কিছুই লেখেননি। নিঃস্বার্থ পরোপকারের বিপদ আছে, অসুস্থ আত্মীয়কে সেবা করতে আসাটাও সংসারে সহজ কাজ নয়।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, আমাকে কি আপনি মাসীর বাড়িতেই ফিরে যেতে বলেন?

সেই ত তোমার বাবার আদেশ বন্দনা। এ তো বলরামপুরের মুখুয্যেবাড়ী নয় —হুকুম দেওয়ার কর্তা এ-ক্ষেত্রে তোমার মুখুয্যেমশাই নয়,—মাসী আবার আদেশটা দিয়েচেন বাপের মুখ দিয়ে, অতএব মান্য করতেই হবে।

বন্দনা বলিল, এ হলো আপনার মামুলি বচন। বাবা জানেন না কিছুই, তবু সেই আদেশ, ন্যায়-অন্যায় যাই হোক, শুনতে হবে? মাসীর বাড়ীটি যে কি সে তো আপনি জানেন।

বিপ্রদাস কহিল, জানিনে, কিন্তু তোমার মুখে শুনেচি সে ভালো জায়গা নয়। আমি সুস্থ থাকলে নিজে গিয়ে তোমাকে বোম্বায়ে পৌঁছে দিয়ে আসতুম, কিন্তু সে শক্তি নেই।

এই অবস্থায় আপনাকে ফেলে চলে যাবো? যে-মাসীকে চিনিনে তার জিদটাই বড় হবে?

কিন্তু উপায় কি?

উপায় এই যে আমি যাবো না।

তবে থাকো। বাবাকে একটা তার করে দাও। কিন্তু মাসী নিতে এলে কি তাঁকে বলবে?

বন্দনা কহিল, যেতে পারবো না, শুধু এই কথাই বলবো। তার বেশি নয়?

বিপ্রদাস বলিল, তোমার মাসী কিন্তু এতেই নিরস্ত হবেন না। এবার হয়ত বাড়ীতে আমার মাকে টেলিগ্রাম করবেন।

এ সম্ভাবনা বন্দনার মনে আসে নাই, শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, বলিল, আপনি

ঠিকই বলচেন মুখুয্যেমশাই, হয়ত কাজটা শেষ হয়েই গেছে—খবর দিতে মাসীর বাকি নেই, কষ্ট কেন জানেন?

বিপ্রদাস কহিল, জানা ত সম্ভব নয়, তবে এটুকু আন্দাজ করা যেতে পারে যে এতখানি উদ্যম তাঁর নিঃস্বার্থ নয়, তোমার একান্ত কল্যাণের জন্যেও নয়; হয়ত কি একটা তাদের মনের মধ্যে আছে।

বন্দনা বলিল, কি আছে আমি জানি। ভাইপো এসেচেন ব্যারিষ্টারী পাশ করে,—মাসী দিয়েচেন আমাদের আলাপ পরিচয় করিয়ে। দৃঢ় বিশ্বাস সে-ই আমার যোগ্য বর। কারণ বাবার আমি এক মেয়ে যে সম্পত্তি তিনি রেখে যাবেন তাঁর আয়ে উপার্জ্জন না করলেও ভাইপোর অনায়াসে চলে যাবে।

বিপ্রদাস বলিল, ভাইপোর কল্যাণ চিন্তা করা পিসির পক্ষ থেকে দোষের নয়। ছেলেটি দেখতে কেমন?

ভালো।

আমার মতো হবে?

বন্দনা হাসিয়া বলিল, এটি হলো আপনার অহঙ্কারের কথা। মনে বেশ জানেন এত রূপ সংসারে আর নেই; কিন্তু সে তুলনা করতে গেলে সংসারে সব মেয়েকেই যে আইবুড়ো থাকতে হয় মুখুয্যেমশাই! কেবল আপনার পানে চেয়েই তাদের দিন কাটাতে হয়। তবু বলবো দেখতে অশোককে ভালই, খুঁৎখুঁৎ করা অন্ততঃ আমার সাজে না!

তা হলে পছন্দ হয়েচে বলো?

যদি হয়েও থাকে, সে পছন্দের কেউ দোষ দেবে না বলতে পারি। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, পাঁচটা বাজলো, আপনার বার্লি খাবার সময় হয়েচে—যাই আনিগে। ইতিমধ্যে অশোকের কথাটা আর একটু ভেবে রাখুন, বলিয়া সে চলিয়া গেল। মিনিট পাঁচেক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল তাহার হাতে রূপোর বাটিতে বার্লি-বরফের ভিতর রাখিয়া ঠাণ্ডা করা—নেবুর রস নিঙড়াইয়া দিয়া কহিল, এর সবটুকু খেতে হবে, ফেলে রাখলে চলবে না। সেবার ত্রুটি দেখিয়ে কেউ যে আমার কৈফিয়ৎ চাইবে সে আমি হতে দেবো না।

বিপ্রদাস বলিল, জুলুমের বিদ্যেটি ষোল আনায় শিক্ষা করে নিয়েচ, কারো কাছে ঠকতে হবে না দেখচি।

বন্দনা বলিল, না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবো, মুখুয্যেমশায়ের ওপর হাত পাকিয়ে পাকা হয়ে গেছি।

খাওয়া শেষ হইলে উচ্ছিষ্ট পাত্রটা হাতে করিয়া বন্দনা চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার একটি কথার জবাব দেবেন মুখুয্যেমশাই?

কি কথা বন্দনা?

সংসারে সকলের চেয়ে আপনাকে কে বেশি ভালোবাসে বলতে পারেন?

পারি।

বলুন ত কি নাম তার?

তার নাম বন্দনা দেবী।

শুনিয়া বন্দনা চক্ষের পলকে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মিনিট পনেরো পরেই আবার ফিরিয়া আসিয়া বিছানার কাছে একটা চৌকি টানিয়া বসিল। বিপ্রদাস হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অমন করে ছুটে পালিয়ে গেলে কেন বলো ত?

বন্দনা প্রথমে জবাব দিতে পারিল না। তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, কথাটা হঠাৎ কেমন সইতে পারলুম না মুখুয্যেমশাই। মনে হ'ল যেন আমার কি একটা বিশ্রী চুরি আপনার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

তাই এখনো মুখ তুলে চাইতে পারচো না?

তা কেন পারবো না, বলিয়া জোর করিয়া মুখ তুলিয়া বন্দনা হাসিতে গেল, কিন্তু সলজ্জ সরমে সমস্ত মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, পরে আত্মসংবরণ করিতে করিতে বলিল, কি করে আপনি এ কথা জানলেন বলুন ত?

বিপ্রদাস কহিল, এ প্রশ্ন একেবারে বাহুল্য বন্দনা। এতই কি পাষাণ আমি যে এটুকুও বুঝতে পারিনি? তা ছাড়া সন্দেহ যদিও কখনো থাকে আজ তোমার পানে চেয়ে আর তা আমার নেই।

বন্দনা আবার মুখ নীচু করিল।

বিপ্রদাস বলিল কিন্তু তাই বলে ত চলবে না বন্দনা, মুখ তুলে তোমাকে চাইতে হবে। লজ্জা পাবার তুমি কিছুই করোনি, আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই। চাও, মুখ তোলো, শোন আমার কথা।

এ সেই আদেশ। বন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিল, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় আমার উপর খুব রাগ করেচেন, না মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস স্মিতমুখে বলিল, কিছুমাত্র না। একি রাগ করার কথা? শুধু আমার মনের আশা এইটুকু যে, এ ভুল তোমার নিজের কাছেই একদিন ধরা পড়বে। কেবল সেইদিনই এর প্রতিকার হবে।

কিন্তু ধরা যদি কোনদিন না পড়ে? এ-কে ভুল বলেই যদি কোনদিন টের না পাই?

পাবেই। এর থেকে যে সংসারে কত অনর্থের সূত্রপাত হয় এ যদি না বুঝতে পারো ত আমিও বুঝবো আমাকে তুমি ভালোবাসোনি। সুধীরকে ভালোবাসার মতো এ-ও তোমার একটা খেয়াল - মনের মধ্যে কাউকে টেনে এনে শুধু আপনাকে ভোলানো। তার বেশি নয়।

বন্দনার মুখ মুহূর্তে ম্লান হইয়া উঠিল, অত্যন্ত ব্যথিত-কণ্ঠে বলিল, সুধীরের সঙ্গে তুলনা করবেন না মুখুয্যেমশাই, এ আমি সইতে পারিনে। কিন্তু এর থেকে সংসারে যে অনর্থের সূত্রপাত হয়, আপনার এ কথা মানবো। মানবো যে, এ অমঙ্গল টেনে আনে, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে বলে স্বীকার করবো না। মিথ্যেই যদি হ'তো এতটুকু ভালোবাসাই কি আপনার পেতুম? পাইনি কি আমি?

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে বিপ্রদাস কথাগুলি শুনিতেছিল, জিজ্ঞাসা শেষ করিয়া বন্দনা মুখ তুলিতেই সে চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, পেয়েচো বই কি বন্দনা, তুমি অনেকখানিই পেয়েচ। নইলে তোমার হাতে আমি খেতুম কি করে? তোমার রাত্রি দিনের সেবা নিতে পারতুম আমি কিসের জোরে? কিন্তু তাই বলে কি গ্লানির মধ্যে, অধর্মের মধ্যে নিজে নেমে দাঁড়াবো, তোমাকে টেনে নামাবো? যারা আমার পানে চেয়ে চিরদিন বিশ্বাসে মাথা উঁচু করে আছে সমস্ত ভেঙে চুরে তাদের হেঁট করে দেবো? এই কি তুমি বলো?

বন্দনা দৃপ্তস্বরে কহিল, তা'হলে আপনিও স্বীকার করুন আজ ছাড়তে যা পারেন না সে শুধু এই দম্ভটাকে। [illegible] সত্য করে ওদের কাছে এই বড় হয়ে থাকার মোহকেই আপনি বড় বলে জেনেচেন। নইলে কিসের গ্লানি মুখুয্যেমশাই - কাকে মানতে যাবো আমরা অধর্ম বলে? মানুষের মনগড়া একটা ব্যবস্থা মানুষেই যাকে বারবার মেনেচে, বার বার ভেঙেচে তাকেই? আপনি পারলেও আমি এ পারবো না।

বিপ্রদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, তুমি না পারলেও আমি পারবো, আর তাতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। ইংরাজি বই অনেক পড়েচো বন্দনা, মাসীর বাড়ীতে আলোচনাও অনেক শুনেচো, সে সব ভুলতে সময় লাগবে দেখচি।

বন্দনা কহিল আপনি আমাকে তামাসা করচেন, আমি কিন্তু একটুও তামাসা করিনি মুখুয্যেমশাই, যা বলেচি সমস্তই সত্য বলেচি।

তা বুঝেচি। কিন্তু এ পাগলামি মাথায় এনে দিলে কে?

আপনি।

বলো কি? এ অধর্ম বুদ্ধি দিলুম তোমাকে অবশেষে নিজে আমিই?

হাঁ, আপনি দিয়েচেন। হয়তো না জেনে কিন্তু আপনি ছাড়া আর কেউ নয়।

এইবার বিপ্রদাস নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, যাকে অধর্ম্ম বলে নিন্দে করলেন তাকে ত আমি মানিনে,— আমি জানি, ধর্ম্ম বলে স্বীকার করেচেন যা একমনে সে শুধু আপনার সংস্কার। অত্যন্ত দৃঢ় সংস্কার, তবু সে তার বড়ো নয়।

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল, বলিল, হয়তো এ কথা তোমার সত্যি বন্দনা, এ আমার সংস্কার,— সুদৃঢ় সংস্কার, কিন্তু মানুষের ধর্ম্ম যখন এই সংস্কারের রূপ ধরে বন্দনা, তখনি সে হয় যথার্থ, তখনি হয় সে সহজ। জীবনের কর্ত্তব্যে আর তখন ঠোকাঠুকি বাধে না, তাকে মানতে গিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই করে মরতে হয় না। তখন বুদ্ধি হয়ে আসে শান্ত, অবাধ জলস্রোতের মতো সে সহজে বয়ে যায়। বুঝি একেই বলেছিলুম সেদিন, এ হলো বিপ্রদাসের অত্যাজ্য ধর্ম্ম—এর আর পরিবর্ত্তন নেই।

কোনদিনই কি এর পরিবর্ত্তন নেই মুখুয্যেমশাই ?

তাইতো আজও জানি বন্দনা। আজও ভাবতে পারিনে এ-জীবনে এর পরিবর্ত্তন আছে।

এতক্ষণে বন্দনার দুই চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, বিপ্রদাস সযত্নে তাহার হাতখান টানিয়া লইয়া বলিল, কিন্তু এ পরিবর্ত্তনেরই বা দরকার কিসের ? ভালো তোমাকে বেসেচি,—রইলো তোমার সে ভালোবাসা আমার মনের মধ্যে—এখন থেকে সে দেবে আমাকে সান্ত্বনা, দুর্ব্বলতায় বল, ভার যখন আর একাকী বইতে পারবো না তখন দেবো তোমাকে ডাক। সে-ও রইলো আজ থেকে তোমার জন্যে তোলা। আসবে ত তখন ?

বন্দনা বাঁ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, আসবো যদি আসবার শক্তি থাকে,—পথ যদি থাকে তখনও খোলা, নইলে পারবো না ত আসতে মুখুয্যেমশাই !

কথাটা শুনিয়া বিপ্রদাস যেন চমকিয়া গেল, বলিল, বটেই ত ! বটেই ত ! আমার পথ যদি থাকে খোলা, চিরদিনের তরে যদি বন্ধ হয়ে সে না যায়। তখন এসো কিন্তু। অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থেকো না।

বন্দনা চোখের জল আবার মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার একটি ভিক্ষে রইলো মুখুয্যেমশাই, আমার কথা যেন কাউকে বলবেন না।

না, বলবো না। বলার লোক যে আমার নেই সে তো তুমি নিজেই জানতে পেরেচো।

হাঁ পেরেছি।

দুইজনে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, এই বিপুল সংসারে আমি যে এতখানি একা এ কথা তুমি কি করে বুঝেছিলে বন্দনা?

বন্দনা বলিল, কি জানি কি করে বুঝেছিলুম। আপনাদের বাড়ী থেকে রাগ করে চলে এলুম, আপনি এলেন সঙ্গে। গাড়ীতে সেই মাতাল সাহেবগুলোর কথা মনে পড়ে? ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়—তবু মনে হলো যাদের আমরা চারপাশে দেখি তাদের দলের আপনি নয়,—একাকী কোন ভার কাঁধে নিতেই আপনার বাধে না। এই কথাই বলেছিলেন সেদিন দ্বিজুবাবু—মিলিয়ে দেখলুম কারও কাছে কিছুই আপনি প্রত্যাশা করেন না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কেবলি আপনাকে মনে পড়ে—কিছুতে ঘুমোতে পারলুম না। শেষরাত্রে উঠে দেখি নিচে পূজোর ঘরে আলো জ্বলছে, আপনি বসেচেন ধ্যানে। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভোর হয়ে এলো, পাছে চাকররা কেউ দেখতে পায় ভয়ে ভয়ে পালিয়ে এলুম আমার ঘরে। আপনার সে মূর্তি আর ভুলতে পারলুম না মুখুয্যেমশাই, আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, দেখেছিলে নাকি আমাকে পূজো করতে?

বন্দনা বলিল, পূজো করতে ত আপনার মাকেও দেখেছি, কিন্তু সে ঠিক নয়। সে আলাদা। আপনি কিসের ধ্যান করেন মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস পুনরায় হাসিয়া বলিল, সে জেনে তোমার কি হবে? তুমি ত তা করবে না!

না করবো না। তবু জানতে ইচ্ছে করে।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা কহিতে লাগিল, আমার সেইদিনই প্রথম মনে হলো সকলের মধ্যে থেকেও আপনি আলাদা, আপনি একা। যেখানে উঠলে আপনার সঙ্গ পাওয়া যায় সেখানে ওরা কেউ উঠতে পারে না। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো মুখুয্যেমশাই? বলবেন?

কি কথা বন্দনা?

মেয়েদের ভালোবাসায় বোধ হয় আর আপনার প্রয়োজন নেই—না?

এ প্রশ্নের মানে?

মানে জানিনে, এমনি জিজ্ঞাসা করচি। এ বোধ হয় আর আপনি কামনা করেন না,—আপনার কাছে একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে।—সত্যি কি-না বলুন।

বিপ্রদাস উত্তর দিল না, শুধু হাসিমুখে চাহিয়া রহিল।

নীচের প্রাঙ্গণে সহসা গাড়ির শব্দ শোনা গেল, আর পাওয়া গেল দ্বিজদাসের কণ্ঠস্বর। এর পরক্ষণেই দ্বারের কাছে আসিয়া অন্নদা ডাকিয়া বলিল, দ্বিজু এলো বিপিন।

একলা নাকি? না, আর কেউ সঙ্গে এলো?

না, একাই ত দেখচি। আর কেউ নেই।

শুনিয়া বন্দনা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, যাই মুখুয্যেমশাই, দেখিগে তার খাবার যোগাড় ঠিক আছে কি না। বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সকালে দ্বিজু আসিয়া যখন বিপ্রদাসের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল তখন ঘরের একধারে বসিয়া বন্দনা পূজার সজ্জা প্রস্তুত করিতেছিল, দ্বিজদাস বলিল, এই পঞ্চমীতে মায়ের পুকুর প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ ব্যাপার দাদা?

মায়ের কাজে ত বৃহৎ ব্যাপারই হয় দ্বিজু, এতে ভাবনার কি আছে? বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

দ্বিজদাস কহিল, তা হয়। এবার সঙ্গে মিলেছে বাসুর ভালো হওয়ার মানৎ পূজো -সেও একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ। অধ্যাপক বিদায়ের-ফর্দ তৈরী হচ্ছে, কুটুম্ব-স্বজন অতিথ-অভ্যাগতের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা বৌদিদির মুখে মুখে পেলুম তাকে আশঙ্কা হয় এবার আপনার অর্থে ওরা কিঞ্চিৎ গভীর খাবোল মারবে। সময় থাকিতে সতর্ক হোন।

বন্দনা মুখ তুলিল না, কিন্তু সামলাইতে না পারিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। বিপ্রদাস বিষয়ী লোক, বিপ্রদাস কৃপণ, এ দুর্নাম একা মা ছাড়া প্রচার করিবার সুযোগ পাইলে কেহ ছাড়ে না। বিপ্রদাস নিজেও এ-হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, এবার কিন্তু তোর পালা। এবার খরচ হবে তোর।

আমার? কোন আপত্তি নেই যদি থাকে। কিন্তু তাতে ব্যবস্থার কিছু অদল বদল করতে হবে। বিদায় যারা পাবে তারা টোলের পণ্ডিত-সমাজ নয়, বরঞ্চ টোলের দোর বন্ধ করে যাদের বাইরে ঠেলে রাখা হয়েচে—তারা।

বিপ্রদাস তেমনই হাসিয়া কহিল, টোলের ওপর তোর রাগ কিসের? লোকের মুখে মুখে এদের শুধু নিন্দেই শুনলি, নিজে কখনও চোখে দেখলিনে। ওদের দল-ভুক্ত বলে হয়ত আমি পর্য্যন্ত তোর আমলে ভাত পাবো না।

দ্বিজদাস কাছে আসিয়া আর একবার পায়ের ধুলা লইল, কহিল, ঐ কথাটা বলবেন না। আপনি দু-দলেরই বাইরে, অথচ তৃতীয় স্থানটা যে কি তাও আমি জানিনে। শুধু এইটুকু জেনে রেখেচি আমার দাদা আমাদের বিচারের বাইরে।

বিপ্রদাস কথাটাকে চাপা দিল। জিজ্ঞাসা করিল, আমার অসুখের কথা মা শোনেননি ত?

না। সে বরঞ্চ ছিল ভালো, পুকুর-প্রতিষ্ঠার হাঙ্গামা বন্ধ হ'তো।

আত্মীয়দের আনবার ব্যবস্থা হয়েচে?

হচ্চে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—সকলকেই। সকন্যা অক্ষয়বাবুর আমন্ত্রণ-লিপি গেছে, মায়ের বিশ্বাস বৃহৎ ব্যাপারে মৈত্রেয়ীর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে। আমার ওপর ভার পড়েচে তাঁদের নিয়ে যাবার।

মা আর কাউকে নিয়ে যাবার কথা বলে দেননি?

হাঁ, অন্নদিকেও নিয়ে যেতে হবে। কলেজের ছেলেরা যদি কেউ যেতে চায় তারাও।

তোর বউদিদির কোন ফরমাস নেই?

না।

নীচে আবার মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। হর্নের চেনা আওয়াজ কানে আসিতেই বন্দনা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, মাসীমার গাড়ী। আমি দেখি গে মুখুয্যেমশাই। আপনি সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে নিন দেরী হয়ে যাচ্চে। বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমিও যাই মুখ-হাত ধুই গে। ঘণ্টাখানেক পরে আসবো, বলিয়া দ্বিজদাসও চলিয়া গেল। বিপ্রদাসের পূজা আহ্নিক সমাপ্ত হইল, আজ খাবার [illegible] দিয়া গেল [illegible]। মাসীর বাড়ী [illegible] যে [illegible] নিতে আসিয়াছে, বন্দনা ব্যস্ত আছে তাহাকে লইয়া। এ খবর [illegible] দিল।

বিপ্রদাস [illegible]। আনন্দ [illegible] তাহার বিরাট [illegible], কলিকাতার অর্দ্ধেক [illegible] গাড়ী [illegible] চালান দিতে হইবে। তুই [illegible] এই লইয়া যখন ওখানে ব্যস্ত [illegible] দরজার বাহির হইতে পারিবো না [illegible], মুখুয্যেমশাই আসতে পারি? [illegible] বিশ্ব আমার জুতা বদেচে।

[illegible], এসো।

বন্দনা [illegible] আসিয়া প্রবেশ করিল। সে বেশে বলরামপুরে তাহাদের প্রথম দেখা [illegible] সেই বেশ। বিপ্রদাস অত্যন্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কোথাও যাচ্চো না কি?

হাঁ, মাসীমার বাড়ীতে।

[illegible]?

ফেরবার কথা ত জানিনে মুখুয্যেমশাই। এই বলিয়া হেঁট হইয়া সে বিপ্রদাসকে প্রণাম করিল, কিন্তু অন্য দিনের মত পায়ে হাত দিয়া স্পর্শ করিল না। মুখ তুলিল না, শুধু কপালে হাত ঠেকাইয়া দ্বিজদাসকেও নমস্কার করিল, তাহার পরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২০

দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা হঠাৎ চলে গেল কেন? আমার এসে পড়াটাই কি কারণ নাকি?

বিপ্রদাস বলিল, না। ওঁর বাবা টেলিগ্রাম করেচেন মাসীর বাড়ীতে গিয়ে থাকতে যতদিন না বোম্বায়ে ফিরে যাওয়া ঘটে।

কিন্তু হঠাৎ মাসী বেরুলো কোথা থেকে? বন্দনা আমার সঙ্গে ত প্রায় কথাই কইলেন না, সর্ব্বক্ষণ আড়ালে আড়ালে রইলেন, তার পর সকাল না হতে হতেই দেখচি সরে পড়লেন। একটা নমস্কার করে গেলেন সত্যি কিন্তু সেও মুখ ফিরিয়ে। আমার সম্বন্ধে হ'লো কি তাঁর?

প্রশ্নের জবাবটা বিপ্রদাস এড়াইয়া গেল এবং মাসীর ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানাইয়া কহিল, আমার অসুখে ভয় পেয়ে এই মাসীর বাড়ী থেকেই অন্নদি ওকে ডেকে এনেছিলেন আমার শুশ্রূষা করতে। যথেষ্ট করেচে। ওর কাছে তোদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

দ্বিজদাস কহিল, উচিত নয় বলিনে, কিন্তু আপনাকে সেবা করতে যাওয়াটাও ত একটা ভাগ্য। সে মূল্যটা যদি উনিও অনুভব করতে পেরে থাকেন ত কৃতজ্ঞতা ওঁর কাছেও আমাদের পাওনা আছে।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, তুই ভারি নরাধম।

দ্বিজদাস বলিল, নরাধম কিন্তু নির্ব্বোধ নই। আমার কথা যাক্। কিন্তু এই সেবা করার কথাটা মায়ের কানে গেলে উনি চিরকাল আমাদের মাকেই কিনে রাখবেন। সেই কি সোজা সম্পদ?

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, মাকে এতকাল পরে তুই চিনতে পেরেছিস বল্?

দ্বিজদাস বলিল, যদি পেরেও থাকি সে শুধু আপনিই জানুন। আমি মায়ের কুপুত্র, আমি কুলাঙ্গার, তাঁর কাছে এই পরিচয়ই থাক্। একে আর নাড়িয়ে কাজ নেই দাদা।

কিন্তু কেন? মা তোকে বিশ্বাস করতে পারেন, তোকে ভাল ভাবতে পারেন, এ কি তুই সত্যিই চাস্‌নে? এ অভিমানে লাভ কি বল্‌তো?

লাভ কি জানিনে কিন্তু লোভ বিশেষ নেই। আমি আপনার পেয়েচি স্নেহ পেয়েচি বৌদিদির ভালোবাসা, এই আমার সাতরাজার ধন, সাতজন্ম দু'হাতে বিলিয়েও শেষ করতে পারবো না, কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই তাহার চোখ মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। হৃদয়ের এই সকল আবেগ-উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে সে চিরদিন পরাঙ্মুখ,—চিরদিন নিঃস্পৃহতার আবরণে ঢাকা দিয়া বেড়ানোই তাহার প্রকৃতি,—মুহূর্তে নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া বলিল, কিন্তু এ-সব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেটা প্রয়োজন সে হচ্ছে এই যে আমার চোখে বন্দনার চলে যাওয়ার ভাবটা দেখালো যেন রাগের মতো। এর মানেটা বলে দিন।

মানেটা বোধ হয় এই যে, তুই যখন এসে পড়েছিস্ তখন ওর আর দরকার নেই। এখন থেকে সেবা শুশ্রূষার ভার তোর উপর। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিতে লাগিল।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি ঠাট্টা করছেন বটে, কিন্তু আমি বলচি, এইসব ইংরাজি-নবিশ মেয়েগুলো এই দম্ভতেই একদিন মরবে। আপনাকে রোগে সেবা করবার দিন যেন-না কখনও আসে কিন্তু এলে প্রমাণ হতে দেরি হবে না যে দাদার সেবায় দ্বিজুকে হারানো দশটা বন্দনার সাধ্যে কুলোবে না, এ কথা তাকে জানিয়ে দেবেন।

স্নেহ-হাস্যে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আচ্ছা জানাবো, কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে। তবে, সে পরীক্ষার প্রয়োজন দাদার কাছে নেই,—আছে শুধু একজনের কাছে সে মা। বোঝা-পড়া তাদের একটা হওয়া দরকার—বুঝলি রে দ্বিজু?

দ্বিজদাস বলিল, না দাদা, বুঝলাম না। কিন্তু মা যখন, তখন বেঁচে থাকলে বোঝা-পড়া একদিন হবেই, কিন্তু এখুনি প্রয়োজনটা কিসের এলো এইটেই ভেবে পাচ্ছিনে। এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, আমার কপালে সবই উল্টো। বাবা জন্ম দিলেন কিন্তু দিয়ে গেলেন না কানাকড়ির সম্পত্তি—সে দিলেন আপনি। মা গর্ভে ধারণ করলেন কিন্তু পালন করলেন অন্নদাদিদি. আর সমস্ত ভার বয়ে মানুষ করে তুললেন বৌদিদি,—দুজনেই পরের ঘর থেকে এসে। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ এবং মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী—এই শ্লোক আউড়ে মনকে আর কত চাঙ্গা রাখবো দাদা আপনিই বলুন?

বিপ্রদাস কহিল, মায়ের মামলা নিয়ে আর ওকালতি করবো না, সে তুই আপনিই একদিন বুঝবি, কিন্তু বাবার সম্বন্ধে যে ধারণা তোর আছে সে ভুল। অর্দ্ধেক বিষয়ের সত্যিই তুই মালিক।

দ্বিজদাস বলিল, হতে পারে সত্যি, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে ঘরে দোর দিয়ে তাঁর উইলখানা কি আপনি পুড়িয়ে ফেলেননি?

কে বললে তোকে?

এতকাল যিনি আমাকে সকল দিক দিয়ে বক্ষে করে এসেছেন সে তাঁর মুখেই শোন।

তা হতে পারে, কিন্তু তোর বৌদিদি ত সে পড়ে দেখেননি। এমন ত হতে পারে বাবা তোকেই সমস্ত দিয়ে গিয়েছিলেন বলে রাগ করে আমি তা পুড়িয়েছি। অসম্ভব ত নয়।

শুনিয়া কৌতুকের হাসিতে দ্বিজদাস প্রথমটা খুব হাসিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আপনি যে কখনো মিথ্যে বলেন না। দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যেটা নোট করে গিয়েছিলেন বেদব্যাস, আর কলিতে আপনারটা নোট করে রাখবে দ্বিজদাস। দুই-ই হবে সমান। যা হোক, এটা বোঝা গেল, বিপাকে পড়লে সবই সম্ভব হয়। আর পাপ বাড়াবেন না, এখন থেকে কি আমাকে করতে হবে?

আমাদের কারবার বিষয়-আশয় সমস্ত দেখতে হবে।

কিন্তু কেন? কিসের জন্যে এত ভার আমি বইতে যাবো আমাকে বুঝিয়ে দিন। আপনি একা পারচেন না নাকি? অসম্ভব। আমি নিকর্মা অপদার্থ হয়ে যাচ্ছি? না, যাচ্ছিনে। তবু মা জিজ্ঞেসা করলে তাঁকে জানিয়ে দেবেন পদার্থের আমার দরকার নেই, অপদার্থ হয়েই আমি দিন কাটিয়ে দেবো, তাঁকে ভাবতে হবে না। আপনি থাকতে টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তির বোঝা আমি বইব না। শেষে কি আপনার মতো ঘোরতর বিষয়ী হয়ে উঠবো নাকি? লোকে বলবে, ওর শিরের মধ্যে দিয়ে রক্ত বয় না, বয় শুধু টাকার স্রোত। কিন্তু বলিতে বলিতেই লক্ষ্য করিল বিপ্রদাস অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছে, তাহার কথায় কান নাই। এমন সচরাচর হয় না,—এ-স্বভাব বিপ্রদাসের নয়, একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, দাদা, সত্যিই কি চান আমি বিষয়কর্ম দেখি, যা আমার চিরদিনের স্বপ্ন সেই স্বদেশ-সেবায় জলাঞ্জলি দিই?

বিপ্রদাস তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, জলাঞ্জলি দিবি এমন কথা ত তোকে কোনদিনই বলিনে দ্বিজু। যা তোর স্বপ্ন সে তোর থাক,—চিরদিন থাক—তবু বলি সংসারের ভার তুই নে।

কিন্তু কেন বলুন? কারণ না জানলে আমি কিছুতেই এ-কথা মানবো না।

বিপ্রদাস এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, এর কারণ ত খুবই স্পষ্ট দ্বিজু। আজ আমি আছি, কিন্তু এমন ত ঘটতে পারে আর আমি নেই।

দ্বিজদাস জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, না, ঘটতে পারে না। আপনি নেই, কোথাও নেই এ আমি ভাবতে পারিনে।

তাহার বিশ্বাসের প্রবলতা বিপ্রদাসকে আঘাত করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, সংসারে সবই ঘটে রে, এমন কি অসম্ভবও। এই কথাটা ভাবতে যারা ভয় পায় তারা নিজেদের ঠকায়। আবার এমনও হতে পারে আমি ক্লান্ত, আমার ছুটির দরকার,—তবু দিবিনে তুই?

না দাদা, পারবো না দিতে। তার চেয়ে সহজ আপনার আদেশ পালন করা। বলুন, কবে থেকে আমাকে কি করতে হবে।

আজ থেকে এ সংসারের সব ভার নিতে হবে।

আজ থেকেই? এতই তাড়াতাড়ি? বেশ তাই হবে। আপনার অবাধ্য হবো না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু শুনতে পাইল দাদার কথা—লোকে বলতে হবে না রে, আমি জানি আমার অবাধ্য তুই নয়।

দ্বিজদাসের কাজ সুরু হইয়া গেল। সে অলস অকর্মণ্য উদাসীন এই ছিল সকলের চিরদিনের অভিযোগ। কিন্তু দাদার আদেশে মায়ের ব্রতপ্রতিষ্ঠার সুবৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল যখন একাকী তাহার পরে তখন এ দুর্নাম অপ্রমাণ করিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না। এই অনভ্যস্ত গুরুভার সে যে এত স্বচ্ছন্দে বহন করিবে এতখানি আশা বিপ্রদাস করে নাই, কিন্তু তাহার নিরলস, সুশৃঙ্খল কর্ম্মপটুতায় সে যেন একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। যাহা কিনিয়া পাঠাইবার তাহা গাড়ী বোঝাই করিয়া দ্বিজদাস বাড়ী পাঠাইল, যাহা লইবার তাহা সঙ্গে রাখিল, আত্মীয়-কুটুম্বগণকে একত্র করিয়া যথাযোগ্য সমাদরে রওনা করিয়া দিল, এখানকার সকল কার্য্য সমাধা করিয়া আজ গৃহে ফিরিবার দিন সে দাদার শেষ উপদেশ গ্রহণ করিতে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে বসিয়া বন্দনা। সেই যাবার দিন হইতে আর সে আসে নাই, তাহার কথা কাজের ভিড়ে দ্বিজদাস ভুলিয়াছিল—আজ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে সে আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া শুধু একটা মামুলি নমস্কার শিষ্টাচার সারিয়া লইয়া বলিল, দাদা, আজ রাত্রের গাড়ীতে আমি বাড়ী যাচ্ছি, সঙ্গে যাচ্ছেন অক্ষয়বাবু, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা মৈত্রেয়ী। আপনার কলেজের ছাত্ররা বোধ করি কাল-পরশু যাবে,—তাদের ভাড়া দিয়ে গেলুম। অনুদিকে কি সঙ্গে নিয়ে যাবেন? কিন্তু দিন তিন-চারের বেশি বিলম্ব করবেন না যেন।

আমাকে কি যেতেই হবে?

হাঁ। না যান তো একজোড়া খড়ম কিনে দিন, নিয়ে গিয়ে ভরতের ম'তো সিংহাসনে বসাবো।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, কাজিলের অগ্রগণ্য হয়েচিস্ তুই। কিন্তু আশ্চর্য করালি অক্ষয়বাবুর কথায়। তিনি যাবেন কি করে? তাঁর তো ছুটি নেই—কাজ কামাই হবে যে?

দ্বিজদাস বলিল, তা হবে, কিন্তু লোকসান নেই—ওদিকে তার চেয়েও ঢের বড় কাজ হবে বড় ঘরে মেয়ে দিতে পারাটা। টাকাওয়ালা জামাই ভবিষ্যতের অনেক ভরসা—কলেজের বাঁধা মাইনের অনেক বেশি।

বিপ্রদাস রাগিয়া বলিল, তোর কথাগুলো যেমন রূঢ় তেমনি কর্কশ। মানুষের সম্মান রেখে কথা কইতে জানিসনে?

দ্বিজদাস বলিল, জানি কি-না বৌদিদিকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। সৌজন্যের বাজে অপব্যয় করিনে শুধু এই আমার দোষ।

শুনিয়া বিপ্রদাস না হাসিয়া পারিল না, বলিল, তোর একটি সাক্ষী শুধু বৌদিদি। যেমন মাতালের সাক্ষী শুঁড়ী।

দ্বিজদাস কহিল, তা হোক, আপনার কথাটাও ঠিক মধুমাখা হচ্চে না দাদা। কারণ আমিও মাতাল নই, তিনিও মদের যোগান দেন না। দেন অমৃত, দেন গোপনে বহুলোকের অন্ন যা অনেক বড়লোক পারে না।

বিপ্রদাস কহিল, তাদের পেরেও কাজ নেই। আদর দিয়ে দেওরকে অন্ধ করে তোলা ছাড়া বড়লোকদের অন্য কাজ আছে।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়া হাসিতে লাগিল, দ্বিজদাস সে। লক্ষ্য করিয়া বলিল, এ নিয়ে আর তর্ক করবো না দাদা। বৌদিদি আপনার নেই,—বাঙালীর সংসারে তাঁর স্নেহ যে কি সে আপনি কোনদিন জানেন না। অন্ধকে আলো বোঝানোর চেষ্টায় ফল নেই। একটু হাসিয়া বলিল, বন্দনা আড়ালে হাসচেন কিন্তু মাসীর বাড়ীর বদলে দিনকতক আমাদের বাড়ীতে কাটিয়ে এলে হয়ত আমার কথাটা বুঝতেন। কিন্তু থাক্‌গে এ-সব আলোচনা। আপনি কবে বাড়ী যাচ্চেন বলুন?

আমি বড় ক্লান্ত দ্বিজু, মাকে বুঝিয়ে বলতে পারবিনে?

বিপ্রদাসের এমন নির্জীব নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর সে কখনো শোনে নাই, চমকিয়া চাহিয়া দেখিল ক্ষীণ হাসিটুকু তখনো ওষ্ঠপ্রান্তে লাগিয়া আছে—কিন্তু এ যেন তাহার দাদা নয় আর কেহ—বিস্ময় ও ব্যথায় অভিভূত হইয়া কহিল, অসুখ কি এখনো সারেনি দাদা?

না, সেরে গেছে।

তবু মায়ের কাজে বাড়ী যেতে পারবেন না এ-কথা মাকে বোঝাবো কি করে? ভয় পেয়ে তিনি চলে আসবেন, তাঁর সমস্ত আয়োজন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, তুই আমাকে কবে যেতে বলিস?

দ্বিজদাস বলিল, আজ, কাল, পরশু—যবে হোক। আমাকে অনুমতি দিন আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

বিপ্রদাস হাসিমুখে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, বেশ তাই হবে। আমি নিজেই যেতে পারবো, তোকে ফিরে আসতে হবে না।

দ্বিজদাস চলিয়া গেলে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি হলো মুখুয্যেমশাই, বাড়ী যেতে আপত্তি করলেন কিসের জন্যে?

বিপ্রদাস কহিল, কারণটা ত নিজের কানেই শুনলে?

শুনলুম, কিন্তু ও-জবাব পরের জন্যে, আমার জন্যে নয়। বলুন কিসের জন্যে বাড়ী যেতে চান না। আপনাকে বলতেই হবে।

আমি ক্লান্ত।

না।

না কেন? ক্লান্তিতে সকলের দাবী আছে, নেই কি শুধু আমার?

আপনারও আছে, কিন্তু সে দাবী সত্যিকার হলে সকলের আগে বুঝতে পারতুম আমি। আর সকলের চোখকেই ঠকাতে পারবেন, পারবেন না ঠকাতে শুধু আমার চোখকে। যাবার সময় মেজদিকে চিঠি লিখে যাবো, আপনার রাগ ধরবার কখনো দরকার হলে যেন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান।

মেজদি নিজে পারবেন না রাগ ধরতে, তুমি দেবে ধরে! এ কথা শুনলে কিন্তু তিনি খুশী হবেন না।

বন্দনা বলিল, খুশী হবেন না সত্যি, কিন্তু কৃতজ্ঞ হবেন। আমার মেজদি হলেন সে-যুগের মানুষ, স্বামী তাঁকে খুঁজে বেছে নিতে হয়নি, ভগবান দিয়েছিলেন আশীর্বাদের মতো অঞ্জলি পূর্ণ করে। তখন থেকে সুস্থ সবল মানুষটিকে নিয়েই তাঁর কারবার। কিন্তু সে মানুষেরও যে হঠাৎ একদিন মন ভাঙতে পারে এ খবর তিনি জানবেন কি করে?

বিপ্রদাস কথা না কহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল।

বন্দনা বলিল, আপনি হাসলেন যে বড়ো?

বিপ্রদাস বলিল, হাসি আপনি আসে বন্দনা। স্বামী খুঁজে-বেছে নেবার

অভিযানে আজ পর্য্যন্ত যাদের তুমি দেখতে পেয়েচো তাদের বাইরে যে কেউ আছে তা তোমরা ভাবতে পারো না। সংসারে সাধারণ নিয়মটাই শুধু মানো, স্বীকার করতে চাও না তার ব্যতিক্রমটাকে। অথচ এই ব্যতিক্রমটার জোরেই টিকে আছে ধর্ম্ম, টিকে আছে পুণ্য, আছে কাব্য-সাহিত্য, আছে অবিচলিত শ্রদ্ধা বিশ্বাস! এ না থাকলে পৃথিবীটা যেতো একেবারে মরুভূমি হয়ে। এই সত্যটাই আজও জানো না।

বন্দনা বিদ্রূপের সুরে বলিল, এই ব্যতিক্রমটা বুঝি আপনি নিজে মুখুয্যেমশাই? কিন্তু সেদিন যে বললেন আমাকেও আপনি ভালবাসেন?

সে আজও বলি। কিন্তু ভালবাসার একটিমাত্র পথই তোমাদের চোখে পড়ে আর সব থাকে বন্ধ, তাই সেদিনের কথাগুলো আমার তুমি বুঝতে পারনি। একবার দেখে এসো গে দ্বিজু আর তার বৌদিদিকে। দৃষ্টি অন্ধ না হোলে দেখতে পাবে কি করে শ্রদ্ধা গিয়ে মিশেচে ভালবাসার সঙ্গে। রহস্য-কৌতুকে, আদরে-আহ্লাদে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় সে শুধু তার বৌদিদি নয়, সে তার বন্ধু, সে তার মা। সেই সম্বন্ধ ত তোমার-আমারও,—ঠিক তেমনি করেই কেন আমাকে তুমি নিতে পারলে না বন্দনা!

তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছিল গভীর স্নেহের সঙ্গে মিশিয়া তিরস্কারের সুর, বন্দনাকে তাহা কঠিন আঘাত করিল। কিছুক্ষণ নীরবে অধোমুখে থাকিয়া সহসা চোখ তুলিয়া বলিল, আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম মুখুয্যেমশাই। আমার মেজদিদিকে যদি আপনি সত্যই ভালোবাসতেন, দুঃখ আমার ছিল না; কিন্তু তা আপনি বাসেন না। আপনি পালন করেন শুধু ধর্ম্ম, মেনে চলেন শুধু কর্ত্তব্য। কঠিন আপনার প্রকৃতি,—কাউকে ভালোবাসতে জানেন না। যত ঢেকেই রাখুন এ সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আজ আমার ভুলও ভাঙলো। শূন্যের মধ্যে হাত বাড়িয়ে মানুষ খুঁজতে আর না যাই, আজ আমাকে এই আশীর্ব্বাদ আপনি করুন।

বিপ্রদাস সহাস্যে হাত বাড়াইয়া বলিল,—করলুম তোমাকে সেই আশীর্ব্বাদ। আজ থেকে মানুষ খোঁজা যেন তোমার শেষ হয়, যে তোমার চিরদিনের তাকে যেন তিনিই তোমাকে দান করেন।

কথাটাকে অপমানকর পরিহাস মনে করিয়া বন্দনা রাগিয়া বলিল, আপনি ভুল করেচেন মুখুয্যেমশাই, মানুষ খুঁজে বেড়ানোই আমার পেশা নয়। তারা আলাদা। কিন্তু হঠাৎ আজ কেন এসেচি এখনো সেই কথাটা আপনাকে বলা হয়নি। এদিক দিয়ে সত্যই আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙে গেছে। এখানে আপনাদের সংশ্রবে এসে ভেবেছিলুম এই সব আচার-বিচার বুঝি সত্যিই ভালো, খাওয়া-ছোঁয়ার নিয়ম মেনে চলা, ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, পূজোর সাজ-গোছ করা—আরও কত কি খুঁটিনাটি,

—মনে করতুম এ-সব বুঝি সত্যিই মানুষকে পবিত্র করে তোলে, কিন্তু এবার মাসীমার বাড়ীতে গিয়ে মূঢ়তা ঘুচেছে। দিনকয়েক কি পাগলামিই না করেছিলুম মুখুয্যেমশাই। যেন সত্যিই এ-সব বিশ্বাস করি, যেন আমাদের শিক্ষার সংস্কারে সত্যিই কোথাও এর থেকে প্রভেদ নেই। এই বলিয়া সে জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিয়াছিল কথাটা হয়ত বিপ্রদাসকে ভারি আঘাত করবে, কিন্তু দেখিতে পাইল একেবারেই না। তাহার স্নিগ্ধ হাসিতে সে প্রসন্ন হাসি যোগ করিয়া বলিল, আমি জানতুম বন্দনা। তোমার কি মনে নেই আমি সতর্ক করে একদিন তোমাকে বলেছিলুম এ-সব তোমার জন্যে নয়, এ-সব করতে তুমি যেয়ো না। সেই মূঢ়তা ঘুচেছে জেনে আমি খুশীই হলুম। মনে করেছিলে শুনে বুঝি বড় কষ্ট পাবো, কিন্তু তা নয়। যার যা স্বাভাবিক নয় তা না করলে আমি দুঃখ বোধ করিনে। তোমার ত মনে আছে আমি কিসের ধ্যান করি তুমি জানতে চাইলে আমি চুপ করেছিলুম। বলতে বাধা ছিল বলে নয়, অকারণ বলে। কিন্তু এসব কথাবার্তা এখন থাক্। তোমার বোম্বায়ে ফিরে যাবার কি কোন দিন স্থির হ'লো?

অভিমানে বন্দনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বিপ্রদাসের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলিল, না।

সেদিন তোমার মাসীর ভাইপো অশোকের কথা বলেছিলে। বলেছিলে ছেলেটিকে তোমার ভালই লেগেচে। এ কয়দিনে তার সম্বন্ধে আর কিছু কি জানতে পারলে?

না।

তোমাদের বিয়েই যদি হয় আমি আশীর্বাদ করবো, কিন্তু মাসীর তাড়ায় যেন কিছু করে বোসো না। তার তাগাদাকে একটু সামলে চোলো।

বন্দনার চোখে জল আসিয়া পড়িল, কিন্তু মুখ নীচু করিয়া সামলাইয়া বলিল, আচ্ছা।

বিপ্রদাস বলিল, আমি পরশু বাড়ী যাব। দু'তিন দিনের বেশি থাকতে পারবো না। ফিরে আসার পরেও যদি কলকাতায় থাকো একবার এসো।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়াই ছিল, মাথা নাড়িয়া কি একটা জবাব দিল তাহার স্পষ্ট অর্থ বুঝা গেল না।

বিপ্রদাস কহিল, শুনলে ত আমার ছুটি মঞ্জুর হ'লো, এখন থেকে সব ভার দ্বিজুর। সংসারের ঘানিতে বাবা আমাকে ছেলেবেলাতেই জুড়ে দিয়েছিলেন, কখনো অবকাশ পাইনি কোথাও যাবার। আজ মনে হচ্ছে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচবো।

এবার বন্দনা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি নিশ্বাস ফেলার এতই দরকার হয়েছে মুখুয্যেমশাই? সত্যিই কি আজ আপনি এত শ্রান্ত?

বিপ্রদাস এ প্রশ্নের উত্তরটা এড়াইয়া গেল, বলিল, ভালো কথা বন্দনা, আমার অসুখে তোমার সেবার উল্লেখ করে দ্বিজুকে বলেছিলুম, তোমার কাছে তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এর অর্দ্ধেক তারা কেউ পারতো না। দ্বিজু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেও তোমাকে বলতে বলেচে, যদি সে সময় কখনো আসে দাদা সেবায় তার সমকক্ষ হওয়া দশটা বন্দনারও সাধ্যে কুলোবে না।

বন্দনা বলিল, তাঁকেও বলবেন সত্যি আমি স্বীকার করে নিলুম। কিন্তু পরীক্ষার দিন যদি কখনো আসে তখন যেন তাঁর দেখা মেলে।

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিমুখে বলিল, দেখা মিলবে বন্দনা, সে পিছোবার লোক নয়। তাকে তুমি জানো না।

জানি মুখুয্যেমশাই। ভালো করেই জানি, আপনার কাজে তাঁর প্রতিযোগিতা করা সত্যিই বন্দনার শক্তিতে কুলোবে না।

ভ্রাতৃগর্ব্বে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, জানো বন্দনা, দ্বিজু আমার সাধু লোক।

আপনার চেয়েও নাকি?

হাঁ, আমার চেয়েও। এই বলিয়া বিপ্রদাস এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু সে বলছিল তুমি নাকি তার উপর রাগ করে আছো। কথা কওনি কেন?

কথা কওয়ার দরকার হয়নি মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তবেই ত দেখচি তুমি সত্যই রাগ করে আছো। কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলি বন্দনা, দ্বিজুর ব্যবহারটা রুক্ষ, কথাগুলোও সর্ব্বদা বড় মোলায়েম হয় না, কিন্তু তার কর্কশ কারণটা ঘুচিয়ে যদি কখন তার দেখা পাও, দেখবে এমন মধুর লোক আর নেই। কথাটা আমার বিশ্বাস কোরো, এমন নির্ভর করবার মানুষও তুমি সহজে খুঁজে পাবে না।

বন্দনা আর একদিকে চাহিয়া রহিল, উত্তর দিল না। হঠাৎ এক সময়ে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, মুখুয্যেমশাই, আমি যাই, যদি থাকতে পারি আপনি ফিরে এলে দেখা করবো। যদি না পারি এই আমার শেষ নমস্কার রইলো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল। একটা কথা বলিবারও সে বিপ্রদাসকে অবকাশ দিল না।

বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ির মুখে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, দ্বিজদাস দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ আবার কি?

একটা মিনতি আছে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে আমাদের দেশের বাড়ীতে একবার যেতে হবে।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে? এর হেতু?

দ্বিজদাস কহিল, বলবো বলেই দাঁড়িয়ে আছি। একদিন বিনা আহ্বানেই আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন, আজ আবার সেই দয়া আপনাকে করতে হবে।

বন্দনা এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিল, তারপর বলিল, কিন্তু আমাকে যাবার নিমন্ত্রণ করচে কে? মা, দাদা, না আপনি নিজে?

আমি নিজেই করচি।

কিন্তু আপনি ত ও-বাড়ীতে তৃতীয় পক্ষ, ডাকবার আপনার অধিকার কি?

দ্বিজদাস বলিল, আর কোন অধিকার না থাক্ আমার বাঁচবার অধিকার আছে। সেই অধিকারে এই আবেদন উপস্থিত করলুম। বলুন মঞ্জুর করলেন? একান্ত প্রয়োজন না হলে কোন প্রার্থনাই আমি কারো কাছে করিনে।

বন্দনা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য দিকে চাহিয়া রহিল, তার পরে বলিল, আচ্ছা, তাই যাবো, কিন্তু আমার মান অপমানের ভার রইলো আপনার উপর।

দ্বিজদাস সকৃতজ্ঞ-কণ্ঠে কহিল, আমার সাধ্য সামান্য, তবু নিলুম সেই ভার।

বন্দনা বলিল, বিপদের সময়ে এ কথা ভুলবেন না যেন।

না, ভুলবো না।

২১

অনেকদিন পরে বিপ্রদাস নীচের অফিস-ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে টেবিলের 'পরে কাগজ-পত্রের স্তূপ—কতদিনের কত কাজ বাকি। দেহ ক্লান্ত কিন্তু দ্বিজুর ভরসায় ফেলিয়া রাখাও আর চলে না। একটা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা টানিয়া লইয়া সেই পাতা উল্টাইতেছিল, বাহিরে মোটরের বাঁশী কানে গেল এবং অনতিবিলম্বে পূবের খোলা দরজা দিয়া বন্দনা প্রবেশ করিল। আজ একা নয়, সঙ্গে একটি অপরিচিত যুবক, পরণে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে ফুলকাটা কট্‌কি চটি এবং কাঁধ হইতে তির্যক ভঙ্গিতে জড়ানো মোটা সাদা চাদর। বয়স ত্রিশের নীচে, দেহের গঠন আর একটু দীর্ঘচ্ছন্দের হইলে অনায়াসে সুপুরুষ বলা চলিত। বিপ্রদাস অভ্যর্থনা করিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই ইনিই মিষ্টার চাউড্রি—বার-এ্যাট-ল। কিন্তু

এখানে অশোকবাবু বলে ডাকলেও অফেন্স নিতে পারবেন না এই সর্ত্তে আলাপ করিয়ে দিতে রাজি হয়ে সঙ্গে এনেচি। আলাপ হবে, কিন্তু তার আগে আপন কর্ত্তব্যটা সেরে নিই—এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, পায়ের ধুলোটা কিন্তু এঁর সুমুখে নিতে পারলুম না পাছে মনে করে বসেন ওঁদের সমাজের আমি কলঙ্ক। কিন্তু তাই বলে যেন অভিমানভরে আপনিও ভেবে নেবেন না নতুন কায়দাটা আমার মাসীর কাছে শেখা। তাঁর ঘরে আপনার প্রসন্নতার বহরটা আমার পরিমাপ করা কি না।

বিপ্রদাস কহিল, তোমার মাসীমার কাছে এইভাবেই আমার গুণ-গান করো নাকি? নবাগত যুবকটির প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, বন্দনার মুখে আপনার কথা এত বেশি শুনেচি যে অসুস্থ না থাকলে আমি নিজেই যেতুম আলাপ করতে। দেখেই মনে হ'লো চেহারাটা পর্য্যন্ত চেনা, যেন কতবার দেখেচি। ভালোই হ'লো অনর্থক বিলম্ব না করে উনি নিজেই সঙ্গে করে আনলেন।

ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বন্দনা শাসনের ভঙ্গিতে তর্জ্জনী তুলিয়া কহিল, মুখুয্যেমশাই, অত্যুক্তি অতিশয়োক্তিকে ছাড়িয়ে প্রায় মিথ্যার কোঠায় এলো, এবার থামুন নইলে হাঙ্গামা করবো।

ইহার অর্থ?

ইহার অর্থ এই হয় যে আমাদের আর সাধারণের মত সত্যি-মিথ্যে যা খুশি বানিয়ে বলা আপনারও চলে। আপনি মোটেই অসাধারণ ব্যক্তি নন,—ঠিক আমাদের মতোই সাধারণ মনুষ্য।

বিপ্রদাস কহিল, না। সকলকে জিজ্ঞাসা করো, তারা একবাক্যে সাক্ষ্য দেবে তোমার অনুমান অশ্রদ্ধেয়, অগ্রাহ্য।

বন্দনা বলিল, এবার তাদের কাছেই আপনাকে নিয়ে গিয়ে বাইরের ঐ সিংহ চর্ম্মটি দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলে দেবো, তখন আসল মূর্ত্তিটি তারা দেখতে পাবে,—তাদের ভয় ভাঙবে। আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বলবে তুমি রাজরাণী হও।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, আশীর্ব্বাদে আপত্তি নেই, এমন কি নিজে করতেও প্রস্তুত, কিন্তু আশীর্ব্বাদ ত তোমরা চাও না, বলো কুসংস্কার, বলো ও শুধু কথার কথা।

বন্দনা পুনরায় আঙুল তুলিয়া বলিল, ফের খোঁচা দেবার চেষ্টা! কে বললে গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ আমরা চাইনে—কে বলেচে কুসংস্কার, এবার কিন্তু সত্যই রাগ হচ্চে মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যিই রাগ হচ্চে নাকি? তবে থাক এ-সব

গোলামদের কথা। কিন্তু হঠাৎ সকালবেলাতেই আবির্ভাব কেন? কোন কাজ আছে নাকি?

বন্দনা কহিল, অনেক। প্রথম আপনার কৈফিয়ৎ নেওয়া। কেন আমার বিনা হুকুমে নীচে নেমে কাজ সুরু করেচেন?

করিনি, করবার সঙ্কল্প করেছিলুম মাত্র। এই রইলো—বলিয়া সেই মোটা খাতাটা বিপ্রদাস ঠেলিয়া দিলেন।

বন্দনা প্রসন্নমুখে কহিল, কৈফিয়ৎ satisfactory, অবাধ্যতা মার্জ্জনা করা গেল। ভবিষ্যতে এমনি অনুগত থাকলেই আমার কাজ চলে যাবে। এবার শুনুন মন দিয়ে। ততক্ষণ এর সঙ্গে বসে গল্প করুন—মুখুয্যেদের ঐশ্বর্য্যের বিবরণ, প্রজা শাসনের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী—যা খুশি। আমি ওপরে যাচ্ছি অন্নদিকে নিয়ে সমস্ত গুছিয়ে নিতে। কাল সকালের ট্রেনে আমরা বলরামপুর যাত্রা করবো, দিনে দিনে যাবো ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকবে না। দ্বিজুবাবু চাকরের মতো সঙ্গে যান—বড় ঘরের বড় ব্যবহার যা। আর কাপড় দোয়াত কালি কুশ্চ্যুতাং সবটা কখনো চোখে দেখেননি—আর কোথা থেকেই বা দেখবেন—

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নিজে নিশ্চয়ই অনেক দেখেচো—

বন্দনা বলিল, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর ও ভদ্ররুচি-বিগর্হিত। উনি দেখেননি এত কথাই হচ্ছিলো। তা শুনুন। ওঁকে অনুমতি দিয়েচি সঙ্গে যাবার, তাতে এত খুশী হয়েচেন যে পরে নিজে আমাকে সঙ্গে করে বোম্বাই পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে সম্মত হয়েচেন।

বিপ্রদাস মুখ অতিশয় গম্ভীর করিয়া কহিল, বলো কি? এতখানি ত্যাগ স্বীকার আমাদের সমাজে মেলে না, এ শুধু তোমাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। শুনে বিস্ময় লাগচে।

বন্দনা বলিল, আপনার কথায় যে শুধু তাপই আছে, ষোল-আনা হিংসেও আছে। এত বলিয়া সে চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছড়াইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, বিপ্রদাস তাহাকে ডাকিয়া কহিল, এ যেন কথামালার সেই কুকুরের ভুষি আগলানোর গল্প। খাবেও না, আর ষাঁড়ের দল এসে যে মনের সাধে চিবোবে তাও দেবে না। মানুষ বাঁচে কি করে বলো ত?

বন্দনা দ্বারপ্রান্তে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কৃত্রিম রোষে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ঠিক আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ, কিচ্ছু তফাৎ নেই। লোকগুলো কেবল মিথ্যে ভয় করে মরে।

তুমি গিয়ে এবার তাদের ভয় ভেঙ্গে দিয়ে এসো।

তাই তো যাচ্চি। এবং ভূষির সঙ্গে একজনের উপমা দেবার দুঃখ-ঋণ শোধ নিয়ে আসবো—এই বলিয়া বন্দনা দীপ্ত কটাক্ষে পুনরায় তড়িৎ বৃষ্টি করিয়া দ্রুত-পদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিপ্রদাস কহিল, মিষ্টার -

অশোক সবিনয়ে বাধা দিল, না, না, চলবে না। ওটাকে বাদ দিতে বাধবে না বলেই ধুতি-চাদর এবং চটি জুতো পরে এসেচি বিপ্রদাসবাবু। উনিও ভরসা দিয়েছিলেন যে—

বিপ্রদাস মনে মনে খুশী হইল। বলিল, ভালোই হ'লো অশোকবাবু, সম্বোধনটা সহজ দাঁড়ালো। পাড়াগাঁয়ের মানুষ, মনেও থাকে না, অভ্যাসও নেই, এবার স্বচ্ছন্দ আলাপ জমাতে পারবো। শুনলাম আমাদের পল্লীগ্রামের বাড়ীতে যেতে চেয়েছেন, কালই যদি যান ত কৃতার্থ হবো। আমাদের সংসারের কর্ত্রী আমার মা তাঁর পক্ষ থেকে আপনাকে আমি সসম্মানে আমন্ত্রণ করচি।

বিপ্রদাসের বিনীত বচনে অশোক পুলকিত চিত্তে বলিল, নিশ্চয় যাবো, নিশ্চয় যাবো। [illegible] আপনার মায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে, কত অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত হবেন বিদায় গ্রহণ করতে। আনন্দোৎসব [illegible] খাওয়া দাওয়া, কত [illegible], [illegible] যাওয়া, [illegible] বিচিত্র [illegible]

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, সময় বাড়ানো কথা অশোকবাবু, বন্দনা শুধু রহস্য করেচে।

রহস্য করে তার লাভ কি বিপ্রদাসবাবু?

একটা লাভ আমাদের অপ্রতিভ করা। বলরামপুরের মুখুয্যেদের ওপর সে মনে মনে চটা। দ্বিতীয় লাভ আপনাকে সে কোন ছলে বোম্বায়ে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

অশোক বলিল, প্রয়োজন হলে বোম্বাই পর্য্যন্ত আমাকে সঙ্গে যেতে হবে এ কথা আছে, কিন্তু মুখুয্যেদের 'পরে সে চটা, আপনাদের সে লজ্জিত করতে চায় এমন হতেই পারে না। কালও বলরামপুরে যাবার স্থির ছিল না, কিন্তু আপনাদের কথা নিয়েই ওর মাসীর সঙ্গে হয়ে গেল ঝগড়া। মাসী বললেন, বিপ্রদাসের মা সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে যদি জলাশয় খনন করিয়ে থাকেন ত তাঁর প্রশংসা করি, কিন্তু ঘটা করে প্রতিষ্ঠা করবার কোন অর্থ নেই, ওটা কুসংস্কার। কুসংস্কারে যোগ দেওয়া আমি অন্যায় মনে করি। বন্দনা বললেন,—ওঁরা বড়লোক, বড়লোকদের কাজে কর্ম্মে ঘটা হয়েই থাকে মাসীমা। তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? আমার পিসীমা বললেন," বড়লোকের অপব্যয় আশ্চর্য্যের কিছু নেই মানি, কিন্তু ও-তো কেবল ওই নয়, ওটা কুসংস্কার। তোমার যাওয়াতেই আমার আপত্তি। বন্দনা বললেন,

আমি কিন্তু কুসংস্কার মনে করিনে মাসীমা। বরঞ্চ এই মনে করি যে, যা জানিনে, জানার কখনো চেষ্টা করিনি, তাকে সরাসরি বিচার করতে যাওয়াই কুসংস্কার। ওর জবাব শুনে পিসিমা রাগে জ্বলে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবার অনুমতি নিয়েচো?

বন্দনা উত্তর দিলেন, বাবা বারণ করবেন না আমি জানি। দিদিরও স্বামী অসুস্থ, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ভার পড়েচে আমার ওপর।

ভার দিলে কে শুনি? তিনি নিজেই বোধ হয়? প্রশ্ন শুনে বন্দনা যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। আমার মনে হলো তাঁর মাথায় দ্রুত রক্ত চড়ে যাচ্ছে, এবার হঠাৎ কি-একটা বলে ফেলবেন, কিন্তু, সে-সব কিছুই করলেন না, শুধু আস্তে আস্তে বললেন, যে যা খুশি জিজ্ঞেস করলেই যে আমাকে জবাব দিতে হবে ছেলেবেলা থেকে এ শিক্ষা আমার হয়নি মাসীমা। পরশু সকালে মুখুযোমশাইকে নিয়ে আমি বলরামপুরে যাবো এর বেশি তোমাকে বলতে পাবো না।

পিসিমা রাগ করে উঠে গেলেন। আমি বললুম, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন? আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ সব আচার অনুষ্ঠান চোখে দেখি। বন্দনা বললেন, কিন্তু সে সব যে কুসংস্কার অশোকবাবু। চোখে দেখলেও যে আপনাদের জাত যায়। বললুম, যদি আপনার না যায় ত আমারও যাবে না। আর যদি যায় ত দুজনের এক সঙ্গেই জাত যাক, আমার কোন ক্ষতি নেই।

বন্দনা বললেন, আপনি ত বিশ্বাস করেন না, সে-সব চোখে দেখলে যে মনে মনে হাসবেন।

বললুম, আপনিই কি বিশ্বাস করেন নাকি? তিনি বললেন, না করিনে, কিন্তু মুখুয্যেমশাই করেন। আমি কেবল আশা করি তাঁর বিশ্বাস যেন একদিন আমারও সত্যি বিশ্বাস হয়ে ওঠে। বিপ্রদাসবাবু, আপনাকে বন্দনা মনে মনে পুজো করে, এত ভক্তি সে জগতে কাউকে করে না।

খবরটা অজানা নয়, নূতনও নয়, তথাপি অপরের মুখে শুনিয়া তাহার নিজের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে প্রশ্ন করিল, আপনাদের যে বিবাহ-প্রস্তাব হয়েছিল সে কি স্থির হয়ে গেছে? বন্দনা সম্মতি দিয়েচেন?

না। কিন্তু অসম্মতি জানান নি।

এটা আশার কথা অশোকবাবু। চুপ করে থাকাটা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মতির চিহ্ন।

অশোক সকৃতজ্ঞ-চক্ষে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, নাও হতে পারে। অন্ততঃ

নিজে আমি এখনো তাই মনে করি। একটু থামিয়া কহিল, মুস্কিল হয়েছে এই যে আমি গরীব। কিন্তু বন্দনা ধনবতী। ধনে আমার লোভ নেই তা নয়, কিন্তু পিসীমার মতো ঐটেই আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। এ-কথা বোঝাবো কি করে যে পিসীমার সঙ্গে আমি চক্রান্ত করিনি।

এই লোকটির প্রতি মনে মনে বিপ্রদাসের একটা অবহেলার ভাব ছিল, তাহার বাক্যের সরলতায় এই ভাবটা একটু কমিল। সদয়কণ্ঠে কহিল, পিসির ষড়যন্ত্রে আপনি যে যোগ দেননি সত্যি হলে একথা বন্দনা একদিন বুঝবেই, তখন প্রসন্ন হতেও তার বিলম্ব হবে না, ধনের প্রমাণ নিতেও তখন বাধা ঘটবে না।

অশোক উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ কি আপনি নিশ্চয় জানেন বিপ্রদাসবাবু?

ইহার জবাব দিতে গিয়া বিপ্রদাস দ্বিধায় পড়িল, একটু ভাবিয়া বলিল, ওর যতটুকু জানি তাইতে মনে হয়।

অশোক কহিল, আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয় ওঁর নিজের প্রসন্নতার চেয়েও আমার ঢের বেশী প্রয়োজন আপনার প্রসন্নতার। সে যেদিন পাবো, আমার না-পাবার কিছু থাকবে না।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, আমার প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে ও স্বামী নির্ব্বাচন করবে এমন অদ্ভুত ইঙ্গিত আপনাকে দিলে কে—বন্দনা নয় ত? যদি দিয়ে থাকে ত নিছক পরিহাস করেচে এই কথাই কেবল বলতে পারি অশোকবাবু।

না পরিহাস নয়, এ সত্য।

কে বললে?

অশোক এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিল, এ-সব মুখ দিয়ে বলার বস্তু নয় বিপ্রদাসবাবু। সেদিন মাসীমার সঙ্গে ঝগড়া করে বন্দনা আমার ঘরে এসে ঢুকলেন— এমন কখনো করেন না—একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসে বললেন, আমাকে বোম্বায়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। বললুম, যখনি হুকুম করবেন তখনি প্রস্তুত। বললেন, যাচ্চি বলরামপুরে, সময় হলে তার পরে জানাবো। বললুম, তাই জানাবেন কিন্তু মাসীমাকে অমন চটিয়ে দিলেন কেন? তাঁদের ঐ সব পূজা-পাঠ, হোম-জপ, ঠাকুর-দেবতা সত্যিই ত আর বিশ্বাস করেন না, তবু বললেন, বিশ্বাস করতে পেলে বেঁচে যাই। কেন বললেন ও কথা? বন্দনা বললেন, মিথ্যে বলিনি অশোকবাবু, ওঁদের মতো সত্য বিশ্বাসে ঐ সব যদি কখনো গ্রহণ করতে পারি আমি ধন্য হয়ে যাই। মুখুয্যেমশায়ের অসুখে সেবা করেছিলুম, তাঁর কাছে একদিন বিশ্বাসের বর চেয়ে নেবো। তার পরে সুরু হলো আপনার কথা। এত শ্রদ্ধা যে কেউ

কাউকে করে, কারো শুভ কামনায় কেউ যে এমন অনুক্ষণ মগ্ন থাকতে পারে এর আগে কখনো কল্পনাও করিনি। কথায় কথায় তিনি একদিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন। তখন আপনি অসুস্থ, আপনার পূজো আহ্নিকের আয়োজন তিনিই করেন। সেদিন বেলা হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আসতে কি একটা পায়ে ঠেকলো, যতই নিজেকে বোঝাতে চাইলেন ও কিছু নয়, ওতে পূজোর ব্যাঘাত হবে না, ততই কিন্তু মন অবুঝ হ'য়ে উঠতে লাগলো পাছে কোথা দিয়েও আপনার কাজে ত্রুটি স্পর্শ করে। তাই আবার স্নান করে এসে সমস্ত আয়োজন তাঁকে নূতন করে করতে হ'লো। আপনি কিন্তু সেদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, বন্দনা, সকালে যদি তোমার ঘুম না ভাঙে ত অন্নদাদিদিকে দিও পূজোর সাজ করতে। মনে পড়ে বিপ্রদাসবাবু?

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, পড়ে।

অশোক বলিতে লাগিল, এমন কতদিনের কত ছোটখাটো বিষয় গল্প করে বলতে বলতে সেদিন রাত্রি অনেক হয়ে গেল, শেষে বললেন, মাসী তাঁদের কুসংস্কারের খোঁটা দিলেন, আমি নিজেও একদিন দিয়েছি বিপ্রদাসবাবু কিন্তু আজ কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বুঝতে আমার গোল বাধে। পাছে তার বিচার ত কোন দিন করিনি, আজন্মের বিশ্বাস একে দোষ নেই, কিন্তু এখন যেন বাধা ঠেকে। বুদ্ধি দিয়ে লজ্জা পাই, লোকের কাছে লুকোতে চাই, কিন্তু যখনি মনে হয় এ-সব উনি ভালোবাসেন না, তখনি মন যেন ভয় থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে।

শুনিতে শুনিতে বিপ্রদাসের মুখ পাংশু হইয়া আসিল, জোর করিয়া হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, বন্দনা বুঝি এখন খাওয়া ছোঁয়ার বিচার আরম্ভ করেছে? কিন্তু সেদিন যে হেসে দম্ভ করে বলে গেল মাসীর বাড়ীতে গিয়ে ও আপন সমাজ, আপন সহজ বুদ্ধি ফিরে পেয়েছে, মুখুয্যেদের বাড়ীর সংস্র প্রকারের ক্ষুদ্রতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে গেছে।

অশোক সবিস্ময়ে কি একটা বলিতে গেলে কিন্তু বিঘ্ন ঘটিল। পর্দা সরাইয়া বন্দনা প্রবেশ করিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, সমস্ত গুছিয়ে রেখে এলুম। কাল সকাল সাড়ে ন'টায় গাড়ী। পূজোর টুকিটাকি বাজগুলো ওর মধ্যে দেরে রাখবেন। এত বিড়ম্বনাও ভগবান আপনার কপালে লিখেছিলেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তাই হবে বোধ হয়।

বোধ হয় নয় নিশ্চয়। ভাবি এগুলো আপনার কেউ ঘুচোতে পারতো। তা শুনুন। বালকের সকালের খাবার ব্যবস্থাও করে গেলুম, আমি নিজে এসে খাওয়াবো, তার পরে কাপড় চোপড় পরাবো, তার পরে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে

যাবো। রোগা মানুষ কি-না তাই। চলুন অশোকবাবু, এবার আমরা যাই। পায়ের ধুলো কিন্তু আর নেবো না মুখুয্যেমশাই, ওটা কুসংস্কার। ভদ্র-সমাজে অচল। এই বলিয়া সে হাসিয়া হাত দুটা মাথায় ঠেকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

২২

পরদিন সকালেই সকলে বলরামপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। বাটীর কাছাকাছি আসিতে দেখা গেল দ্বিজদাস প্রায় রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার করিয়াছে। সম্মুখের মাঠে সারি সারি চালা-ঘর—কতক তৈরি হইয়াছে—কতক হইতেছে—ইতিমধ্যেই আহূত ও অনাহূতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এখনো কত লোক যে আসিবে তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া কঠিন।

বিপ্রদাসকে দেখিয়া মা চমকিয়া গেলেন—এ কি দেহ হয়েচে বাবা, একেবারে যে আধখানা হয়ে গেচিস্।

বিপ্রদাস পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, আর ভয় নেই মা, এবার সেরে উঠতে দেরি হবে না।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে যেতেও আর দেবো না তা যত কাজই তোর থাক্। এখন থেকে নিজের চোখে চোখে রাখবো।

বিপ্রদাস হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বন্দনা তাঁহাকে প্রণাম করিলে দয়াময়ী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, এসো মা, এসো—বেঁচে থাকো।

কিন্তু কণ্ঠস্বরে তাঁহার উৎসাহ ছিল না, বুঝা গেল এ শুধু সাধারণ শিষ্টাচার, তার বেশি নয়। তাহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, সে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে, মা এইটুকুই জানিলেন। তিনি মৈত্রেয়ীর কথা পাড়িলেন। মেয়েটির গুণের সীমা নাই, দয়াময়ীর দুঃখ এই যে এক-মুখে তাহার ফর্দ্দ রচিয়া দাখিল করা সম্ভব নয়। বলিলেন, বাপ শেখাননি এমন বিষয় নেই, জানে না এমন কাজ নেই। বৌমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্চে না, —তাই ও একাই সমস্ত ভার যেন মাথায় তুলে নিয়েচে। ভাগ্যে ওকে আনা হয়েছিল বিপিন, নইলে কী যে হোতো আমার ভাবলে ভয় করে।

বিপ্রদাস বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বলো কি মা!

দয়াময়ী কহিলেন, সত্যি বাবা। মেয়েটার কাজকর্ম্ম দেখে মনে হয় কর্ত্তা যে বোঝা আমার ঘাড়ে ফেলে রেখে চলে গেছেন তার আর ভাবনা নেই। বৌমা ওকে

সঙ্গী পেলে সকল ভার স্বচ্ছন্দে বইতে পারবেন, কোথাও ত্রুটি ঘটবে না। এ বছর ত আর হলো না, কিন্তু বেঁচে যদি থাকি আসচে বারে নিশ্চিন্ত-মনে কৈলাস-দর্শনে আমি যাবোই যাবো।

বিপ্রদাস নীরব হইয়া রহিল। দয়াময়ীর কথা ত মিথ্যা নয়, মৈত্রেয়ী হয়ত এমনি প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু যশোগানেরও মাত্রা আছে, স্থান কাল আছে। তাঁহার লক্ষ্য যাই হোক, উপলক্ষটাও কিন্তু চাপা রহিল না। একটা অকরুণ অসহিষ্ণু ক্ষুদ্রতা তাঁহার স্বপ্ন রচিত মর্য্যাদায় গিয়া যেন রূঢ় আঘাত করিল। হঠাৎ ছেলের মুখের পানে চাহিয়া দয়াময়ী নিজের এই ভুলটই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তখনি কি করিয়া যে প্রতিকার করিবেন তাহাও খুঁজিয়া পাইলেন না। দ্বিজদাস কাজের ভীড়ে অন্যত্র আবদ্ধ ছিল, খবর পাইয়া আসিয়া পৌঁছিল।

বিপ্রদাস কহিল, কি ভীষণ কাণ্ড করেচিস্ দ্বিজু, সামলাবি কি করে?

দ্বিজদাস বলিল, ভার ত আপনি নিজে নেননি দাদা, দিয়েচেন আমার ওপর। আপনার ভয়টা কিসের?

বন্দনা ইহার জবাব দিল, বলিল, ওঁর ভাবনা খরচের সব টাকাটা যদি প্রজাদের ঘাড়ে উসুল না হয় তো তহবিলে হাত পড়বে। এতে ভয় হবে না দ্বিজুবাবু?

সকলেই হাসিয়া উঠিল, এবং এই রহস্যটুকুর মধ্যে দিয়া মায়ের মনোভাবটা যেন কমিয়া গেল, স্মিত মুখে কৃত্রিম রুষ্টস্বরে বলিলেন, ওকে জ্বালাতন করতে তুমিও ঠিক তোমার বোনের মতই হবে বন্দনা। ও আমার পরম ধার্মিক ছেলে, সবাই মিলে ওকে মিথ্যে খোঁটা দিলে আমার সয় না।

বন্দনা কহিল, খোঁটা মিথ্যে হলে গায়ে লাগে না, তাতে রাগ করা উচিত নয়।

মা বললেন, রাগ তো ও করে না,—ও শুনে হাসে।

বন্দনা কহিল তারও কারণ আছে মা, মুখুয্যেমশাই জানেন পেটে খেলে পিঠে সইতে হয়, রাগারাগি করা মূর্খতা। ঠিক না মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক বই কি। মূর্খের কথায় রাগারাগি করা নিষেধ, শাস্ত্রে তার জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে।

বন্দনা কহিল, মেজদি কিন্তু আমার চেয়ে মুখ্যু মুখুয্যেমশাই। বোধ হয় আপনার শাস্ত্রের এই ব্যবস্থার জোরেই সবাই আপনাকে এত ভক্তি করে। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল। দ্বিজদাস হাসি চাপিতে অন্যত্র চাহিয়া রহিল এবং দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, বন্দনা মেয়েটা বড় দুষ্টু, ওর সঙ্গে কারো কথায় পারবার যো নেই।

একটু থামিয়া একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু দেখো মা, কর্তাদের আমলে প্রজাদের ওপর এ-রকম যে একেবারেই হ'ত না তা বলিনে, কিন্তু তোমাকে ত বলেচি, বিপিন আমার পরম ধার্মিক ছেলে, যা অন্যায়, যা ওর যথার্থ প্রাপ্য নয়, সে ও কিছুতে নিতে পারে না। কিন্তু ভয় আমার দ্বিজুকে ও পারে।

বিপ্রদাস প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ তোমার অন্যায় কথা মা। দ্বিজু করবে প্রজা পীড়ন। প্রজার পক্ষ নিয়ে ও আমাদের বিরুদ্ধেই একবার তাদের খাজনা দিতে নিষেধ করেছিল সে কথা কি তোমার মনে নেই?

মা বললেন, মনে আছে বলেই ত বলচি। যে ন্যায্য দেনা দিতে বারণ করে, অন্যায় আদায় সেই পারে বিপিন, অপরে পারে না। দয়া মায়া ওর আছে, একটু বেশি পরিমাণেই আছে মানি,—কিন্তু তবু দেখতে পাবি একদিন, ওর হাতেই প্রজারা দুঃখ পাবে ঢের বেশি।

না মা, পাবে না তুমি দেখো।

দয়াময়ী বলিলেন, ভরসা কেবল তুই আছিস্ ব'লে। নইলে এমন কেউ নেই যে ওকে ঠিক পথে চালিয়ে যেতে পারবে। নইলে ও নিজেও একদিন ডুববে পরকেও ডোবাবে।

দ্বিজদাস এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এবার কথা কহিল, বলিল, তোমার শেষের কথাটা ঠিক হ'ল না মা। নিজে ডুববো সে হয়ত একদিন সত্য হবে কিন্তু পরকে ডোবাবো না এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

মা বলিলেন এর একটাও সুখের নয় দ্বিজু, ওটাও আনন্দের নয়। আসলে তোকে চালাবার একজন লোক থাকা চাই।

দ্বিজদাস কহিল, সেই কথাটা স্পষ্ট করে বলো যে সকলের ভাবনা ঘুচুক। আমাকে চালাবার কেউ একজন দরকার। কিন্তু সে যোগাড় তো তুমি প্রায় করে এনেচো মা।

মা বলিলেন, যদি সত্যিই করে এনে থাকি সে তোর ভাগ্যি বলে জানিস্।

তর্ক বিতর্কের মূল তাৎপর্য্যটা এবার সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল।

মা বলিতে লাগিলেন, এত বড় যে কাণ্ড করে তুললি কারো কথা শুনলিনে, বললি দাদার হুকুম, কিন্তু দাদা কি বলেছিল অশ্বমেধ করতে? এখন সামলায় কে বল্‌তো? ভাগ্যে মৈত্রেয়ী এসেছিল সেই তো শুধু ভরসা।

দ্বিজদাস বলিল কাজটা আগে হয়ে যাক মা, তার পরে যাকে খুশি সনন্দ দিও, আমি আপত্তি করবো না, কিন্তু এখুনি তার তাড়াতাড়ি কি

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তখন সনন্দ সই করবে কে দ্বিজুবাবু, তৃতীয় পক্ষ নয় তো?

দ্বিজদাস কহিল, তৃতীয় পক্ষের সাধ্য কি! আজও মহাপরাক্রান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ যে তেমনই বিদ্যমান। বলিতে দুইজনেই হাসিয়া ফেলিল।

বিপদাস ও মা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন কিন্তু অর্থ বুঝিলেন না।

অন্নদা আসিয়া বলিল, বন্দনাদিদি, বড়বাবুর ওষুধগুলো যে কাল গুছিয়ে তুললে সেই কাগজের বাক্সটা তো দেখতে পাচ্চিনে—হারালো না তো?

না, হারায় নি অনুদি, কলকাতার বাড়ীতেই রয়ে গেছে।

দয়াময়ী ভয় পাইয়া বলিলেন, উপায় কি হবে বন্দনা, এত বড় ভুল হয়ে গেল।

বন্দনা কহিল, ভুল হয়নি মা, আসবার সময়ে সেগুলো ইচ্ছে করেই ফেলে এলুম।

ইচ্ছে করে ফেলে এলে? তার মানে?

ভেবলুম, ওষুধ অনেক খেয়েচেন আর না। তখন মা কাছে ছিলেন না তাই ওষুধের দরকার হয়েছিল, এখন, বিনা ওষুধেই সেরে উঠবেন, একটুও দেরি হবে না।

কথাগুলো দয়াময়ীর অত্যন্ত ভাল লাগল, তথাপি বলিলেন, কিন্তু ভালো করোনি মা। পাড়াগাঁ জায়গা, ডাক্তার-বদ্যি তেমন মেলে না দরকার হলে—

অন্নদা বলিল, দরকার আর হবে না মা। হলে উনি নিশ্চয় আনতেন, কখনো ফেলে আসতেন না। বন্দনাদিদি ডাক্তার-বদ্যির চেয়েও বেশি জানে।

দয়াময়ী প্রশংসমান চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। বন্দনা কহিল, অনুদির বাড়িয়ে বলা স্বভাব মা, নইলে সত্যিই আমি কিছু জানিনে। যা একটু শিখেচি সে শুধু মুখুয্যেমশায়ের সেবা করে।

অন্নদা বলিল, সে যে কি সেবা মা সে শুধু আমি জানি। হঠাৎ একদিন কি বিপদেই পড়ে গেলুম। বাড়ীতে কেউ নেই, বাবুর অসুখের তার পেয়ে দ্বিজু চলে এসেচে এখানে, দত্তমশাই গেছেন ঢাকায়, বিপনের হ'ল জ্বর। প্রথম দুটো দিন কোনমতে কাটলো, কিন্তু তার পরের দিন জ্বর গেল ভয়ানক বেড়ে। ডাক্তার ডেকে পাঠালুম, সে ওষুধ দিলে কিন্তু ভয় দেখালে চতুর্গুণ। মুখ্যু মেয়েমানুষ, কি যে করি, তোমাদেরও খবর দিতে পারিনে, বিপিন করলে মানা,—আকুল হয়ে ছুটে গেলাম বন্দনার কাছে ওঁর মাসীর বাড়ীতে। কেঁদে বললুম, দিদি, রাগ করে থেকো না, এসো। তোমার মুখুয্যেমশাইয়ের বড় অসুখ। বন্দনাদিদি যেমন ছিলেন তেমনি এসে আমার গাড়ীতে উঠলেন, মাসীকে বলবারও সময় পেলেন না। বাড়ী এসে বিপিনের ভার নিলেন। দিন রাতে একটি ঘণ্টাও সে ক'টা দিন উনি জিরোতে

পাননি। কেবল ওষুধ খাওয়ানোই তো নয়, সকালে পুজোর সাজ থেকে আরম্ভ করে রাত্রিরে মশারি ফেলে শুইয়ে আসা পর্য্যন্ত যা-কিছু সমস্ত। এখন বন্দনাদিদি যদি ওষুধ দিতে আর না চায় মা, অন্যথা করে কাজ নেই. ওতেই বিপিন সুস্থ হয়ে উঠবে।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠবো মা, তোমরা ওকে আর বাধা দিও না, ওর সুবুদ্ধি হোক, আমাকে ওষুধ গেলানো বন্ধ করুক। আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ করবো, বন্দনা রাজ-রাণী হোক।

দয়াময়ী নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া যেন স্নেহ ও মমতা উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

ঝি আসিয়া কহিল, মা, বৌদিদি বলচেন কলকাতা থেকে যে-সব জিনিসপত্র এখন এলো কোন্ ঘরে তুলবেন?

দয়াময়ী জবাব দিবার পূর্ব্বেই বন্দনা বলিল, মা, আমি আপনার ম্লেচ্ছ মেয়ে বলে আপনার এত বড় কাজে কি কোন ভারই পাবো না; কেবল চুপ করে বসে থাকবো? এমন কত জিনিস তো আছে যা আমি ছুঁলেও ছোঁয়া যায় না।

দয়াময়ী তাহার হাত ধরিয়া একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন, আঁচল হইতে একটা চাবির গোছা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, চুপ করে তোমাকে বসে থাকতেই বা দেব কেন মা? এই দিলুম তোমাকে আমার আপন ভাঁড়ারের চাবি যা বৌমা ছাড়া আর কাউকে দিতে পারিনে। আজ থেকে এ ভার রইলো তোমার।

কি আছে মা এ ভাঁড়ারে?

এ চাবির গুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত, দ্বিজদাস কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আছে যা ছোঁয়া-ছুঁয়ির নাগালের বাইরে, আছে সোনা রূপো, টাকা-কড়ি, চেলি গরদের জোড়। যা অতি বড় ধার্ম্মিক ব্যক্তিরও মাথায় তুলে নিতে আপত্তি হবে না তুমি ছুঁলেও।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কি করতে হবে মা আমাকে?

দয়াময়ী বলিলেন, অধ্যাপক-বিদায়, অতিথি-অভ্যাগতদের সম্মান-রক্ষা, আত্মীয় স্বজনগণের পাথেয়র ব্যবস্থা,—আর ঐ সঙ্গে রাখবে এই ছেলেটাকে একটু কড়া শাসনে। এই বলিয়া তিনি দ্বিজদাসকে দেখাইয়া কহিলেন, আমি হিসেব বুঝিনে বলে ও আমাকে ঠকিয়ে যে কত টাকা নিয়ে অপব্যয় করচে তার ঠিকানা নেই মা। এইটি তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

দ্বিজদাস বলিল, দাদার সামনে এমন কথা তুমি বোলো না মা। উনি ভাববেন সত্যিই বা। খরচের খাতায় রীতিমত ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্চে মিলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে।

দয়াময়ী বলিলেন, মেলাবো কোন্‌টা? ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্ছে মানি, কিন্তু অপব্যয়ের হিসেব কে লিখচে বল্ তো? আমি সেই কথাই বন্দনাকে জানাচ্ছিলুম।

বন্দনা বলিল, জেনেই বা কি করবো মা? ওঁর টাকা উনি অপব্যয় করলে আমি আটকাবো কি করে?

দয়াময়ী কহিলেন, সে আমি জানিনে। তুমি ভার নিতে চেয়েছিলে, আমি ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম; কিন্তু একটা কথা বলি বন্দনা, তোমাকেও একদিন সংসার করতে হবে, তখন অপব্যয় বাঁচানোর দায় এসে যদি হাতে ঠেকে জানিনে বলেই তো নিস্তার পাবে না।

বন্দনা দ্বিজদাসের প্রতি চাহিয়া কহিল, শুনলেন তো মায়ের হুকুম?

দ্বিজদাস কহিল, শুনলুম বই কি। কিন্তু দাদা দিয়েচেন আমার ওপর খরচ করার ভার, মা দিলেন তোমাকে খরচ না করার ভার। সুতরাং খণ্ড-যুদ্ধ বাধবেই, তখন দোষ দিলে চলবে না।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে বলিল, দোষ দেবার দরকার হবে না দ্বিজুবাবু, ঝগড়া আমাদের হবে না! আপনার টাকা নিয়ে আপনার সঙ্গেই মক্-ফাইট্ শুরু করবার ছেলেমানুষি আমার গেছে। বাঙলাদেশে এসে সে শিক্ষা আমার হয়েচে। ঝগড়ার আগে মায়ের দেওয়া ভার মার হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে আমি সরে যাবো।

দয়াময়ী ঠিক না বুঝিলেও বুঝিলেন এ অভিমান স্বাভাবিক। ব্যথিত-কণ্ঠে কহিলেন, ভার আমি ফিরে নেবো না মা, তোমাকেই এ বইতে হবে; কিন্তু এখানে আর নয়, ভেতরে চলো, তোমার কাজ তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিইগে। এই বলিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন।

সেদিন বন্দনা এ-বাড়িতে ঘণ্টা-কয়েক মাত্র ছিল, কোথায় কি আছে দেখিবার সুযোগ পায় নাই, আজ দেখিল মহলের পরে মহলের যেন শেষ নাই। আশ্রিত আত্মীয়ের সংখ্যা কম নয়, বউ-ঝি নাতি-পুতি লইয়া প্রত্যেকের এক-একটি সংসার। ওদিকটায় আছে কাছারী-বাড়ী ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যবস্থা; কিন্তু এ অংশে আছে ঠাকুরবাড়ী, রান্নাবাড়ী, দয়াময়ীর বিরাট গোশালা এবং উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত বাগান ও পুষ্করিণী। দ্বিতলের পূবের ঘরগুলো দয়াময়ীর, তাহারই একটার

সম্মুখে বন্দনাকে আনিয়া তিনি বলিলেন, মা, এই ঘরটি তোমার, এরই সব ভার রইলো তোমার উপর।

ওধারের বারান্দায় বসিয়া সতী ও মৈত্রেয়ী কি কতগুলা দ্রব্য মনঃসংযোগে পরীক্ষা করিতেছিল, দয়াময়ীর কণ্ঠস্বরে মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং বন্দনাকে দেখিতে পাইয়া দুজনেই কাজ ফেলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে যে সত্যিই আসিবে এ প্রত্যাশা কেহ করে নাই। দি'দির পায়ের ধূলা লইয়া বন্দনা মৈত্রেয়ীকে নমস্কার করিল। মা বলিলেন, আমার এই ম্লেচ্ছ মেয়েটিও কোন একটা কাজের ভার চায় বৌমা, চুপ করে বসে থাকতে ও নারাজ। তোমাদের দিয়েচি নানা কাজ, ওকে দিলুম আমার এই ভাঁড়ারের চাবি।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, এ ভাঁড়ারে কি আছে মা?

আছে এমন সব জিনিস যা ম্লেচ্ছ মেয়েতে ছুঁলেও ছোঁয়া যায় না। এই বলিয়া দয়াময়ী সকৌতুকে হাসিয়া বন্দনাকে দিয়া ঘর খুলাইয়া সকলে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেঝের উপর থরে থরে সাজানো রূপার বাসন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মর্য্যাদা দিতে হইবে। কলিকাতা হইতে ভাঙাইয়া টাকা সিকি প্রভৃতি আনানো হইয়াছে, থলিগুলি স্তূপাকার করিয়া একস্থানে রাখা; গরদ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রসকল বস্তাবন্দী হইয়া এখনো পড়িয়া, খুলিয়া দেখার অবসর ঘটে নাই,—এ সকল ব্যতীত দয়াময়ীর আলমারী সিন্দুকও এই ঘরে। হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিলেন, বন্দনা, ওর মধ্যেই রয়েচে আমার যথাসর্ব্বস্ব, ওর পরেই দ্বিজুর আছে সবচেয়ে লোভ। ওইখানেই পাহারা দিতে হবে মা তোমাকে সবচেয়ে বেশি। আমার মতো তোমাকেও যেন ফাঁকি দিতে ও না পারে।

বন্দনার বিপন্ন মুখের পানে চাহিয়া সতী ভগিনীর হইয়া বলিল, এত বড় কাজের ভার দেওয়া কি ওকে চলবে মা? অনেক টাকা-কড়ির ব্যাপার—তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দয়াময়ী বলিলেন, অনেক টাকাকড়ির ব্যাপার বলেই ওর হাতে চাবি দিলুম বৌমা। নইলে দ্বিজু আমাকে দেউলে করে দেবে।

কিন্তু ও যে বাইরে থেকে এসেচে মা?

সতীর এ কথাটাও শেষ হইল না, দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, বাইরে থেকে একদিন তুমিও এসেছিলে আর তারও অনেক আগে এমনি বাইরে থেকেই আমাকে আসতে হয়েছিল। ওটা আপত্তি নয় বৌমা। কিন্তু আর আমার সময় নেই আমি চললুম। এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বন্দনা বলিল, তোমাদের বাড়ীতে এসে এ কি জালে জড়িয়ে পড়লুম মেজদি। আমি যে নিশ্বাস ফেলবার সময় পাব না।

তাই ত মনে হচ্ছে, বলিয়া সতী শুধু একটু হাসিল।

২৩

সংসারের বিপদ যে কোথায় থাকে এবং কোন পথে কখন যে আত্মপ্রকাশ করে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কাজের মাঝখানে কল্যাণী আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, মা, উনি বলচেন ওঁর সঙ্গে আমাকে এখুনি বাড়ী চলে যেতে। ট্রেনের সময় নেই—ষ্টেশনে বসে থাকবেন সেও ভালো, তবু এ বাড়িতে আর একদণ্ড না।

পুরোহিত প্রতিমার শাস্ত্রীয় ক্রিয়া এইমাত্র চুকিয়াছে, এইমাত্র দয়াময়ী মণ্ডপ হইতে বাটীতে আসিয়া পা দিয়াছেন। ভাবনা ব্যস্ততার মধ্যে তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, মেয়ের কথাটা ভালো বুঝিতে পারিলেন না, হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন কে বলচে তোমাকে যেতে—শশধর? কেন?

বড়দা ওঁকে ভয়ানক অপমান করেচেন—ঘর থেকে বার করে দিয়েচেন, এই বলিয়া কল্যাণী চক্ষু দত আবেগে কাঁদিতে লাগিল।

চারিদিকে লোকজন, কোথাও খাওয়ানোর আয়োজন, কোথাও গানের আসর, কোথাও ভিখারীদের বাদ-বিতণ্ডা, কোথাও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের শাস্ত্রবিচার—অগণিত মানুষের অপরিমেয় কোলাহল,—ইহারই মাঝখানে অকস্মাৎ এই ব্যাপার।

সতী ও মৈত্রেয়ী উপস্থিত হইল, বন্দনা ভাঁড়ারে চাবি দিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, আত্মীয়-কুটুম্বগণের অনেকেই কৌতূহলী হইয়া উঠিল, শশধর আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, মা, আমরা চললুম। আসতে আদেশ করেছিলেন, আমরা এসেছিলুম কিন্তু থাকতে পারলুম না।

কেন বাবা?

বিপ্রদাসবাবু তাঁর ঘর থেকে আমাকে বার করে দিয়েছেন।

তার কারণ?

কারণ বোধ করি এই যে তিনি বড়লোক। অহঙ্কারে চোখে-কানে দেখতে শুনতে পান না। ভেবেচেন নিজের বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান করা সহজ, কিন্তু ছেলেকে একটু বুঝিয়ে দেবেন আমার বাবাও জমিদারী রেখে গেছেন, সেও নিতান্ত ছোট নয়। আমাকেও ভিক্ষে করে বেড়াতে হয় না।

দয়াময়ী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, বিপিনকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি বাবা, কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করি। আমার কাজ এখনো শেষ হ'লো না, ব্রাহ্মণ-ভোজন বাকি, বোষ্টম-ভিক্ষুকদের বিদায় করা হয়নি, তার আগেই যদি তোমরা রাগ করে চলে যাও শশধর, যে পুকুর এই মাত্র প্রতিষ্ঠা করলুম তাতেই ডুব দিয়ে মরবো তোমরা নিশ্চয় জেনো। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখে জল আসিয়া পড়িল।

শাশুড়ীর চোখের জলে বিশেষ ফল হইল না। ভদ্রসন্তান হইয়াও শশধরের আকৃতি ও প্রকৃতি কোনটাই ঠিক ভদ্রোচিত নয়। কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে মন সঙ্কোচ বোধ করে। তাহার বিপুল দেহ ও বিপুলতার মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফুলিতে লাগিল, বলিল, থাকতে পারি যদি বিপ্রদাসবাবু এখানে এসে সকলের সুমুখে হাত জোড় করে আমার কাছে ক্ষমা চান। নইলে নয়।

প্রস্তাবটা এত বড় অভাবিত যে শুনিয়া সকলে যেন বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। বিপ্রদাস ক্ষমা চাহিবে হাত জোড় করিয়া! এবং সকলের সম্মুখে! কয়েক মুহূর্ত্ত সকলেই নির্ব্বাক, সহসা পাংশু-মুখে একান্ত অনুনয়ের কণ্ঠে সতী বলিয়া উঠিল ঠাকুরজামাই, এখন নয় ভাই। কাজকর্ম্ম চুকুক, মা নিশ্চয় এর একটা বিহিত করবেন। তোমাকে অপমান করা কি কখনো হতে পারে? অন্যায় করে থাকলে তিনি নিশ্চয় ক্ষমা চাইবেন।

বন্দনার চোখের কোণ দুটো ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্ত-কণ্ঠে কহিল, তিনি অন্যায় ত কখন করেন না মেজদি!

সতী তাড়া দিয়া উঠিল, তুই থাম বন্দনা। অন্যায় সবাই করে।

বন্দনা বলিল, না, তিনি করেন না।

শুনিয়া মৈত্রেয়ী জ্বলিয়া গেল, তীক্ষ্নস্বরে কহিল, কি করে জানলেন? সেখানে ত আপনি ছিলেন না। উনি কি তবে বানিয়ে বলচেন?

বন্দনা ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বানিয়ে বলার কথা আমি বলিনি। আমি শুধু বলেচি মুখুয্যেমশাই অন্যায় করেন না।

মৈত্রেয়ী প্রত্যুত্তরে তেমনি বক্র-বিদ্রূপে কহিল, অন্যায় সবাই করে। কেউ ভগবান নয়। উনি বাবাকে অসম্মান করতে ছাড়েন নি।

বন্দনা বলিল, তা হলে শশধরবাবুর মত তাঁরও চলে যাওয়া উচিত ছিল, থাকা উচিত ছিল না।

মৈত্রেয়ী তীক্ষ্নস্বরে জবাব দিল, সে কৈফিয়ৎ আপনার কাছে দেবার নয়, মীমাংসা হবে দ্বিজুবাবুর সঙ্গে, যিনি আহ্বান করে এনেচেন।

সতী সরোষে তিরস্কার করিল, তোর পায়ে পড়ি বন্দনা তুই যা এখান থেকে, নিজের কাজে যা।

শশধর দয়াময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের দরবার করতে আসিনি মা, এসেচি জানতে আপনার ছেলে জোড়-হাতে আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন কি না? নইলে চললুম—এক মিনিটও থাকবো না। আপনার মেয়ে আমার সঙ্গে যেতে পারেন না-ও পারেন, কিন্তু তার পরে শ্বশুরবাড়ীর নাম যেন না আর মুখে আনেন। এইখানে আজই তার শেষ হয় যেন!

এ কি সর্ব্বনেশে কথা! শশধরের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়—মেয়ে-জামাইকে বাড়ী আনিয়া এ কি ভয়ঙ্কর বিপদ! সম্মুখে দাঁড়াইয়া কল্যাণী কাঁদিতে লাগিল, পরামর্শ দিবার লোক নাই, ভাবিবার সময় নাই, ত্রাসে লজ্জায় ও গভীর অপমানে দয়াময়ীর কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তিনি কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া সভয়ে বলিলেন, তুমি একটু থাম বাবা, আমি বিপিনকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আমি জানি কোথায় তোমার মস্ত বড় ভুল আছে, কিন্তু এই এক-বাড়ী লোকের মধ্যে এ কলঙ্ক প্রকাশ পেলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে বাছা।

শশধর কহিল, বেশ, আমি দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে ডাকান। বিপ্রদাসবাবু মিথ্যে করেই বলুন এ কাজ তিনি করেন নি।

মিথ্যে কথা সে বলে না শশধর, এই বলিয়া দয়াময়ী বিপ্রদাসকে ডাকাইতে পাঠাইলেন। মিনিট-পাঁচেক পরে বিপ্রদাস আসিয়া দাঁড়াইল। তেমনি শান্ত, গম্ভীর ও আত্মসমাহিত। শুধু চোখের দৃষ্টিতে একটা উদাস ক্লান্ত ছায়া—তাহার অন্তরালে কি কথা যে প্রচ্ছন্ন আছে বলা কঠিন।

দয়াময়ী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, তোর নামে কি কথা শশধর বলে বিপিন। বলে, তুই নাকি ওকে ঘর থেকে বার করে দিয়েচিস। এ কি কখন সত্যি হতে পারে?

বিপ্রদাস বলিল, সত্যি বই কি মা।

ঘর থেকে বার করে দিয়েচিস আমার জামাইকে? আমার এই কাজের বাড়ীতে?

হাঁ, সত্যি বার করে দিয়েচি। বলেচি আর যেন না কখনো ও আমার ঘরে ঢোকে।

শুনিয়া দয়াময়ী বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ এই অভিভূত ভাবটা কাটিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

সে তোমার না শোনাই ভালো মা।

সতী স্থির থাকিতে পারিল না, ব্যাকুল হইয়া নিবেদন করিল, আমরা কেউ

শুনতে চাইনে, কিন্তু ঠাকুরজামাই কল্যাণীকে নিয়ে এক্ষুনি চলে যেতে চাচ্ছেন, এই এক-বাড়ী লোকের মধ্যে ভেবে দেখো সে কত বড় কেলেঙ্কারী. ওঁকে বলো তোমার হঠাৎ অন্যায় হয়ে গেছে বলো ওঁদের থাকতে।

বিপ্রদাস স্ত্রীর মুখের প্রতি এক মুহূর্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, হঠাৎ অন্যায় আমার হয় না সতী।

হয় হয়, হঠাৎ একটা অন্যায় সকলেরি হয়। বল না ওঁদের থাকতে।

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া কহিল, না, অন্যায় আমার হয় নি।

স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে দয়াময়ী স্তব্ধ হইয়া ছিলেন, সহসা কে যেন তাঁহাকে নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া দিল. তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, ন্যায় অন্যায়ের ঝগড়া থাক্। মেয়ে জামাই আমার চিরকালের মত পর হয়ে যাবে এ আমি সইবো না। শশধরের কাছে তুমি ক্ষমা চাও বিপিন।

সে হয় না মা, সে অসম্ভব।

সম্ভব অসম্ভব আমি জানিনে। ক্ষমা তোমাকে চাইতেই হবে।

বিপ্রদাস নিরুত্তরে স্থির হইয়া রহিল। দয়াময়ী মনে মনে বুঝিলেন এ অসম্ভবকে আর সম্ভব করা যাইবে না, ক্রোধের সীমা রহিল না, বলিলেন, বাড়ী তোমার একার নয় বিপিন। কাউকে তাড়াবার অধিকার নেই। তোমাকে দিয়ে যাননি, ওরা এ-বাড়ীতে থাকবে।

বিপ্রদাস কহিল, দেখো মা আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে যদি তুমি এ আদেশ দিতে আমি চুপ করেই থাকতাম, কিন্তু এখন আর পারিনে। শশধর থাকলে এ-বাড়ী ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। আর ফেরাতে পারবে না। কোনটা চাও বল?

জীবনে এমন ভয়ানক প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনদিন কেহ তাঁহাকে ডাকে নাই, এত বড় দুর্ভেদ্য সমস্যার সম্মুখীন হইতেও কেহ বলে নাই। একদিকে মেয়ে জামাই, আর এ দিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিপিন। যে শিশুকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, যে সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, দুঃখের সান্ত্বনা, বিপদের আশ্রয়—যে ছেলে তাঁর প্রাণাধিব প্রিয়। এ অমর্য্যাদা তাহাকে মৃত্যু দিবে কিন্তু সঙ্কল্পচ্যুত করিবে না। বুঝিলেন সর্ব্বনাশের অতলস্পর্শ গহ্বর তাঁর পায়ের নীচে, এ ভুলের প্রতিবিধান নাই, প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নাই—পরিণাম ইহার দৈবের মতই অমোঘ, নির্ম্মম ও অপ্রতিহতগতি। তথাপি নিজেকে শাসন করিতে পারিলেন না, অদম্য ক্রোধ ও অভিমানের বাত্যায় তাঁহাকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল, কটুকণ্ঠে বলিলেন, এ তোমার অন্যায় জিদ বিপিন। তোমার জন্যে মেয়ে জামাইকে জন্মের মত পর করে দেব এ হয় না বাছা।

তোমার যা ইচ্ছে করগে। শশধর, এস তোমরা আমার সঙ্গে—ওর কথায় কান দেবার দরকার নেই। বাড়ী ওর একার নয়। এই বলিয়া তিনি কল্যাণী ও শশধরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের পিছনে পিছনে গেল মৈত্রেয়ী, যেন ইহাদের সে আপন লোক।

মনে হইয়াছিল সতী বুঝি এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার অচঞ্চল দৃঢ়তায় বন্দনা ও বিপ্রদাস উভয়েই বিস্মিত হইল। তাহার চোখে জল নাই কিন্তু মুখ অতিশয় পাণ্ডুর, বলিল, ঠাকুরজামাই কি করেচেন আমরা জানিনে, কিন্তু অকারণে তুমিও যে এত বড় কাণ্ড করোনি, তা নিশ্চয় জানি। ভেবো না, মনে মনে তোমাকে আমি এতটুকু দোষও কোনদিন দেব।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। সতী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আজই চলে যাবে?

না, কাল যাবো।

আর আসবে না এ-বাড়ীতে?

মনে ত হয় না।

আমি? বাসু?

যেতে তোমাদেরও হবে। কাল না পার অন্য কোন দিন।

না অন্য দিন নয়, আমরাও কালই যাবো। এই বলিয়া সতী বন্দনাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই কি করবি বন্দনা, কালই যাবি?

বন্দনা বলিল, না। আমি তো ঝগড়া করিনি মেজদি, যে দল পাকিয়ে কালই যেতে হবে।

সতী বলিল, ঝগড়া আমিও করিনি বন্দনা, উনিও না; কিন্তু যেখানে ওঁর জায়গা হয় না সেখানে আমারও না। একটা দিনও না। তোর বিয়ে হলে এ কথা বুঝতিস্।

বন্দনা বলিল বিয়ে না হয়েও বুঝি মেজদি, স্বামীর জায়গা না হলে স্ত্রীরও হয় না। কিন্তু ভুল ত হয়, না বুঝে তাকেই স্বীকার করা স্ত্রীর কর্তব্য, তোমার এ-কথা আমি মানবো না।

শাশুড়ীর প্রতি সতীর অভিমানের সীমা ছিল না, বলিল, স্বামী থাকলে মানতিস্। বলিয়াই অশ্রু চাপিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বন্দনা কহিল, এ কি করলেন মুখুয্যেমশাই?

না করে উপায় ছিল না বন্দনা।

কিন্তু মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ এ যে ভাবতে পারা যায় না।

বিপ্রদাস বলিল, যায় না সত্যি, কিন্তু নতুন প্রশ্ন এসে যখন পথ আগলায় তখন

নতুন সমাধানের কথাই ভাবতে হয়। এড়িয়ে চলবার ফাঁক থাকে না। তোমার মেজদি আমার সঙ্গে যাবেই—বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু তুমি? আরও দু-চার দিন কি থাকবে মনে করেচো?

বন্দনা বলিল, কতদিন থাকতে হবে আমি জানিনে। কিন্তু নতুন প্রশ্ন আপনার যতই আসুক আমি কিন্তু সেই পুরনো পথেই তার উত্তর খুঁজে ফিরবো—যে পথ প্রথম দিনটিতে আমার চোখে পড়েছিল, যেদিন হঠাৎ এসে এ-বাড়ীতে দাঁড়িয়েছিলুম। যার তুলনা কোথাও দেখিনি, যা আমার মনের ধারণা দিয়েচে চিরকালের মতো বদলে।

বিপ্রদাস ইহার উত্তর দিল না, শুধু ওষ্ঠপ্রান্তে তাহার একটুখানি ম্লান হাসির আভাস দেখা দিল। সে হাসি যেমন বেদনার তেমনি নিরাশার। কহিল, আমি বাইরে চললুম বন্দনা, আবার দেখা হবে।

অশ্রুবাষ্পে বন্দনার চোখ ভরিয়া উঠিয়াছে; বলিল, দেখা যদি হয় তখন শুধু দূর থেকে আপনাকে প্রণাম করবো। কঠোর আপনার প্রকৃতি, কঠিন মন,—না আছে স্নেহ, না আছে ক্ষমা। তখন বলতে যদি না পারি, সুযোগ যদি না হয় এখুনি বলে রাখি মুখুয্যেমশাই, যাদের নিয়ে চলে আমাদের ঘর-কন্না, হাসি-কান্না, মান অভিমান তাদের নিয়েই যেন চলতে পারি, তাদেরই যেন আপনার ব'লে এ জীবনে ভাবতে শিখি। আলেয়ার আলোর পিছনে আর যেন না পথ হারাই। একটু থামিয়া বলিল, দূর থেকে যখন আপনাকে মনে পড়বে তখনি একান্তমনে এই মন্ত্র জপ করবো—তিনি নির্মল, তিনি নিষ্পাপ, তিনি মহৎ। মনের পাষাণ ফলকে তাঁর লেশমাত্র দাগ পড়ে না। জগতে তিনি একক, কারো আপন তিনি নন,—সংসারে কেউ তাঁর আপন হতে পারে না। এই বলিয়া দু'চোখে আঁচল চাপিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সেদিন কাজ-কর্ম্ম চুকিল অনেক রাত্রে। এ-গৃহের সুশৃঙ্খলিত ধারায় কোথাও কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। বাহির হইতে কেহ জানিতেও পারিল না সেই শৃঙ্খলের সবচেয়ে বড় গ্রন্থিই আজ চূর্ণ হইয়া গেল। প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব নাই, কর্ম্মক্লান্ত বৃহৎ ভবন একান্ত নীরব,—যে যেখানে স্থান পাইয়াছে নিদ্রামগ্ন,—ভাঁড়ারের গুরু দায়িত্ব সমাপন করিয়া বন্দনা শ্রান্তপদে নিজের ঘরে যাইতেছিল, চোখে পড়িল ওদিকের বারান্দার পাশে দ্বিজদাসের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। দ্বিধা জাগিল এমন সময়ে যাওয়া উচিত কি-না, কাহারো চোখে পড়িলে সুবিচার সে করিবে না, নিন্দা হয়ত শতমুখে বিস্তার লাভ করিবে, কিন্তু থামিতে পারিল না, যে উদ্বেগ তাহাকে

সারাদিন চঞ্চল ও অশান্ত করিয়া রাখিয়াছে সে তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল দ্বিজুবাবু এখনো জেগে আছেন?

ভিতর হ'তে সাড়া আসিল, আছি। কিন্তু এমন সময়ে আপনি যে?

আসতে পারি।

স্বচ্ছন্দে।

বন্দনা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল রাশীকৃত কাগজপত্র লইয়া দ্বিজদাস বিছানায় বসিয়া। জিজ্ঞাসা করিল, আজকের হিসাব বুঝি। কিন্তু হিসেব ত পালাবে না দ্বিজুবাবু, এত রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে যে।

দ্বিজদাস বলিল, হলে বাঁচতুম, এগুলো চোখে দেখতে হ'তো না।

খরচ অনেক হয়ে গেছে বুঝি? দাদার কাছে গুরুতর কৈফিয়ত দিতে হবে?

দ্বিজদাস কাগজগুলো একেবারে ঠেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল, বলিল চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। শ্রীগুরুর কৃপায় সেদিন আর এখন আমার নেই বন্দনা দেবী, যে দাদার কাছে কৈফিয়ৎ দেবো। এখন উল্টে কৈফিয়ৎ চাইবো আমি। বলবো, দাও শীগ্‌গীর হিসেব—জলদি দাও কপেয়া—কোথায় কি করেচো বলো।

বন্দনা অবাক হইয়া বলিল, ব্যাপার কি?

দ্বিজদাস মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত মাথার উপরে তুলিয়া কহিল, ব্যাপার অতীব ভীষণ। মা দয়াময়ী আমাকে দয়া করুন, ভগ্নীপতি শশধর আমার সহায় হোন সাবধান বিপ্রদাস। তোমাকে এবার আমি ধনে প্রাণে বধ করবো। আমাদের হাতে আর তোমার নিস্তার নেই।

বন্দনার চিন্তা উদ্দাম হইয়া উঠিল, তবু সে না হাসিয়া পারিল না, বলিল, সব তাতেই হাসি তামাস। আপনি এক মুহূর্ত সিরিয়াস হতে জানেন না দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস বলিল, জানিনে? তবে আনো শশধরকে, আনো—না, তারা থাক্‌। দেখবে, হাসি-তামাসা পালাবে চক্ষের নিমেষে সাহারায়, গাম্ভীর্য্যে মুখমণ্ডল হয়ে উঠবে বুনো ওলের মত ভয়াবহ। পরীক্ষা করুন।

বন্দনা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল, কহিল, আপনি তা হলে জেনেচেন সব?

সব নয়, যৎ-কিঞ্চিৎ। সব জানেন দাদা, কিন্তু সে গহন অরণ্য। আর জানে শশধর। সে বলবে বটে, কিন্তু সমস্ত মিথ্যে করে বানিয়ে বলবে।

বন্দনা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, যা জানেন আমাকে বলতে পারেন না দ্বিজুবাবু? আমি সত্যি বড় ভয় পেয়েচি।

দ্বিজদাস কহিল, ভয় পাওয়া বৃথা। দাদার সঙ্কল্প টলবে না,—তাঁকে আমরা হারালাম।

দীপালোকে দেখা গেল এবার অকস্মাৎ তাহার চক্ষু জলে টলটল করিতেছে, ঘাড় ফিরাইয়া কোনমতে মুছিয়া আপনি সে সোজা হইয়া বসিল।

বন্দনা গাঢ়স্বরে কহিল, বিদেশে এত সহজেই আসবে দ্বিজুবাবু, সঙ্গেও কেউ যাবে না?

দ্বিজদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, না। ওঁর ধর্ম আছে জানি এমনি অবাধ এমনি ক্রমেই আসে, কারণ কিছুই মানে না। যারা কাঁদবার সে কাঁদে, কিন্তু শেষ ঐখানে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি জানতে চান হ'লো কেন? বিশেষ জানিনে, কিন্তু যতটুকু জানি সে শুধু আপনাকেই বলবো, আর সাহায্য যদি কখনো চাইতে হয়, সেখানেই থাকুন সে কেবল আপনার কাছেই চাইব।

কেবল আমার কাছেই কেন?

তার কারণ হাত যদি পাততেই হয় মহতের কাছে পাতাই শাস্ত্রের বিধান।

কিন্তু মহৎ কি আর কেউ নেই?

হয়ত আছে, কিন্তু ঠিকানা জানিনে। দাদার কথা তুলবো না, কিন্তু চিরদিন হাত পাতার অপবাদ ছিল বৌদিদির কাছে, কিন্তু সে পথ বন্ধ হ'লো। আপনি ওঁর বোন, আমার দাবি তাঁর থেকে।

কিন্তু মা?

দ্বিজদাস বলিল, রথ যখন দ্রুত চলে মা তার অসাধারণ সারথি, কিন্তু চাকা যখন কাদায় বসে মা তখন নিরুপায়। কেন যে বসে ঠাওরাতেও পারেন না। সে দুর্দিনে যাব আপনার কাছে। দেবেন না কিছু?

ভিক্ষের নিয়ম না জেনে বলবো কি করে দ্বিজুবাবু?

সে নিজেও জানিনে বন্দনা, সহজে চাইতে পারব না। যখন কোথাও মিলবে না জানব তবু তখন।

বন্দনা বহুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, যা জানতে চেয়েছিলুম বললেন না?

দ্বিজদাস বলিল, সমস্ত জানিনে, যা জানি তাও হয়ত অভ্রান্ত নয়। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে দাদা আজ সর্ব্বস্বান্ত। সমস্ত গেছে।

বন্দনা চমকিয়া উঠিল—মুখুয্যেমশাই সর্ব্বস্বান্ত? কি করে এমন হলো দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস বলিল, খুব সহজেই এবং সে ঐ শশধরের ষড়যন্ত্রে। সাহা-চৌধুরী

কোম্পানী হঠাৎ যেদিন দেউলে হ'লো দাদারও সর্ব্বস্ব ডুবল সেই গহ্বরে! অথচ, এ শুধু বাইরের ঘটনা,—যেটুকু চোখে দেখতে পাওয়া গেল। ভিতরে গোপন রহস্যের অন্ত ইতিহাস।

বন্দনা ব্যাকুল হইয়া কহিল, ইতিহাস থাক দ্বিজুবাবু, শুধু ঘটনার কথাই বলুন। বলুন সর্ব্বস্ব যাওয়া সত্যি কি-না।

হ্যাঁ, সত্য। ওখানে কোন ভুল নেই।

কিন্তু মেজদি? বাসু? তাদেরও কিছু রইলো না নাকি?

না। রইলো বৌদির শুধু বাপের বাড়ির অন্ন। সামান্য ঐ ক'টা টাকা।

কিন্তু সে তো মুখুয্যেমশাই ছোঁবেন না দ্বিজুবাবু!

না। তার চেয়ে উপোসের ওপর দাদার বেশি ভরসা। যে কটা দিন চলে।

উভয়েই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। মিনিট কয়েক পরে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি? আপনার নিজের কি হ'লো?

দ্বিজদাস বলিল, পরম নির্ভয়ে ও নিরাপদে আছি। দাদা আপনি ডুবলেন কিন্তু আমাকে রাখলেন ভাসিয়ে। জলকণাটি পর্য্যন্ত লাগতে দিলেন না গায়ে। বলবেন, এ অসম্ভব সম্ভব হ'লো কি করে? হ'লো মায়ের সুবুদ্ধি, দাদার সাধুতা এবং আমার নিজের শুভ-গ্রহের কল্যাণে। গল্পটা বলি শুনুন। এই শশধর ছিল দাদার বাল্যবন্ধু, সহপাঠি। দু'জনের ভালোবাসার অন্ত নেই। বড় হয়ে দাদা এর সঙ্গে দিলেন কল্যাণীর বিয়ে। এই ঘটকালিই দাদার জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি। শোনা গেল, শশধরের বাপের মস্ত জমিদারী, বিপুল অর্থ ও বিরাট কারবার। অতবড় বিত্তশালী ব্যক্তি পাবনা অঞ্চলে কেউ নেই। বছর-চারেক গেল, হঠাৎ একদিন শশধর এসে জানালে জমিদারী, ঐশ্বর্য্য, কারবার অতলে তলাতে আর বিলম্ব নেই, রক্ষা করতে হবে। মা বললেন, রক্ষা করাই উচিত, কিন্তু দ্বিজু আমার নাবালক, তার টাকায় ত হাত দিতে পারা যাবে না বাবা। সে বললে, বছর ঘুরবে না মা, শোধ হয়ে যাবে। মা বললেন, আশীর্ব্বাদ করি তাই যেন হয়, কিন্তু নাবালকের সম্পত্তি কর্ত্তার একা[illegible] নিষেধ।

কল্যাণী কেঁদে এসে দাদার পায়ে গিয়ে পড়লো। বলল, দাদা বিয়ে দিয়েছি[illegible] তুমিই, আজ ছেলেমেয়ে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবো দেখবে তুমি চোখে? মা পারে[illegible] কিন্তু তুমি? যেখানে ওঁর ধর্ম্ম যেখানে ওঁর বিবেক ও বৈরাগ্য, যেখানে উ[illegible] আমাদের সকলের বড় কল্যাণী সেইখানেই দিলে আঘাত। দাদা অভয় দিয়ে বললেন তুই বাড়ী যা বোন, যা করতে পারি আমি করবো। সেই অভয়-মন্ত্র জপতে জপ[illegible]

ল্যাণী বাড়ী ফিরে গেল। তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বন্দনা। কিন্তু চেয়ে দেখুন ভার হয়েচে, এই বলিয়া খোলা জানালার দিকে সে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

বন্দনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ঐ কাগজগুলো আপনার কি?

দ্বিজদাস বলিল, আমার নির্ভয়ে থাকার দলিল। আসবার সময়ে দাদা সঙ্গে নেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনিও কি আমাদের আজই ফেলে চলে যাবেন?

ঠিক জানিনে দ্বিজুবাবু। কিন্তু আর সময় নেই আমি চললুম। আবার দেখা হবে, এই বলিয়া সে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

২৪

মেজদিদিকে জোর করিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া বন্দনা তাহার পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছিল। এই মঙ্গলাচারটুকু অন্নদা তাহাকে শিখাইয়া দিয়া নিজে আত্মগোপন করিয়াছে। তাহার চোখ রাঙা, অবিরত অশ্রুবর্ষণে চোখের পাতা ফুলিয়াছে—বন্দনার প্রশ্নের উত্তরে সে সংক্ষেপে বলিয়াছিল, বৌকে মুখ দেখাতে আমি পারবো না।

তুমি পারবে না কেন অনুদি, তোমার লজ্জা কিসের?

আমার লজ্জা এই জন্যে যে, এর আগে মরিনি কেন? শুধু দ্বিজুকেই ত মানুষ করিনি বন্দনাদিদি, বিপিনকেও করেছিলুম। ওর মা যখন মারা গেল কার হাতে দিয়েছিল তার দু'মাসের ছেলেকে? আমার হাতে। সেদিন কোথায় ছিলেন দয়াময়ী? কোথায় ছিল তাঁর মেয়ে,জামাই। বলিতে বলিতে সে মুখে আঁচল চাপিয়া দ্রুতপদে অন্যত্র সরিয়া গেল। মেঝেয় বসিয়া নিজের জানুর উপর দিদির পা দুটি রাখিয়া বন্দনার আলতা পরানো যেন আর শেষ হইতে চাহে না।

টপ করিয়া এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু সতীর পায়ের উপর পড়িল। হেঁট হইয়াও সে বন্দনার মুখ দেখিতে পাইল না। কিন্তু হাত বাড়াইয়া তাহার চোখ মুছাইয়া বলিল, তুই কেন কাঁদচিস্ বল তো বন্দনা?

বন্দনা তেমনি নত-মুখে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কাঁদচে ত সবাই মেজদি। আমি ত একা নয়।

সবাই কাঁদচে বলে তোকেও কাঁদতে হবে, এত লেখা-পড়া শিখে এই বুঝি তোর বুদ্ধি হ'লো?

দিদির কথা শুনিয়া বন্দনা মুহূর্তের জন্য মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, যুক্তি দেখি কাঁদতে হবে নইলে মানুষ কাঁদবে না, তোমার যুক্তিটা বুঝি এই মেজদি ?

সতী হাত দিয়া তাহার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া সস্নেহে কহিল, তর্কবাগীশের সা তর্কে পারবার জো নেই। তা বলিনি রে, তা আমি বলিনি। ওরা ভেবেচে আম বুঝি সব গেলো, তাই ওদের কান্না, কিন্তু সত্যি তা নয়। আমার এক দি রয়েচেন স্বামী অন্য দিকে ছেলে—সংসারে কোন ক্ষতিই আমার হয়নি ভাই, আম জন্যে তুই শোক করিস্‌নে। দুঃখ আমার নেই।

বন্দনা বলিল, দুঃখ যেন তোমার না-ই থাকে মেজ্‌দি। কিন্তু তোমার দুঃখট সংসারে সব নয়। তোমার কতখানি গেলো সে তুমি জানো, কিন্তু কেঁদে কেঁ যারা চোখ অন্ধ করলে তাদের লোকসান কে পুরোবে বলো ত ?

একটু থামিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই পুরুষমানুষ, যা খুশি উনি বলুন, কি যাবার ক্ষণে আজ শুকনো চোখে যেন তুমি বিদায় নিও না দিদি। সে ওদের ব বিঁধবে।

কাদের বিঁধবে রে বন্দনা ?

কাদের ? জানো না তুমি তাদের ? তোমার ন'বছর বয়সে এসেছিলে এ পরের বাড়ীতে, সেই বাড়ীতে বছরের পর বছর ধরে তোমার আপনার করে দি যারা, আজকের একটা ধাক্কাতেই তাদের ভুলে গেলে মেজদি ? তোমার শাশুড় তোমার দেওর, তোমার সংসারের দাস-দাসী, আশ্রিত-পরিজন, ঠাকুরবাড় অতিথিশালা, গুরু-পুরুত—এদের অভাব পূর্ণ হবে শুধু স্বামী-পুত্র দিয়ে ? আর কে নেই জীবনে—শুধু এই ?

বন্দনা বলিতে লাগিল, এ কাদের মুখের কথা জানো মেজদি, যে সমাজে আম মানুষ হয়েচি তাদের। তুমি ভেবেচো স্বামী-ভক্তির এই শেষ কথা ? স্ত্রীর এ বড়ো ভাববার কিছু নেই ? এ তোমার ভুল। কলকাতায় চলো আমার মাসী বাড়ীতে, দেখবে এ-কথা সেখানে পুরনো হয়ে আছে—এর বেশি তারা ভাবে না, করেও না। অথচ,—কথার মাঝখানে সে থামিয়া গেল। তাহার হঠ মনে হইল কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া দেখিল দ্বিজদাস। কখন যে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে উভয়ের কেহই টের পায় নাই। লজ্জা পাই বন্দনা কি-যেন বলিতে গেল, দ্বিজদাস থামাইয়া দিয়া কহিল, ভয় নেই, মাসীকে চিনিনে তাঁর দলের কাউকেও জানিনে—আপনার কথা তাঁদের কাছে প্রকাশ পা না। কিন্তু আসলে আপনার ভুল হচ্চে। পৃথিবীতে জন্তু জানোয়ারের দল আ

তাদের আচরণ ফরমূলায় বাঁধা যায়, কিন্তু মানুষের দল নেই। এক জোটে এমন গড়পড়তা বিচার তাদের চলে না। সকাল থেকে আজ এই কথাটাই ভাবছিলুম। মাসীর দল থেকে টেনে এনে অনায়াসে আপনাকে দাদার দলে ভর্তি করা যায়, আবার দয়াময়ীর দল থেকে বার করে স্বচ্ছন্দে ঐ মৈত্রেয়ীকে আপনার মাসীর দলে চালান করা চলে। বাজি রেখে বলতে পারি কোথাও এক তিল বিভ্রাট বাধবে না। বাঃ রে মানুষের মন! বাঃ রে তার প্রকৃতি!

সতী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এ কথার মানে ঠাকুরপো?

দ্বিজদাস ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, তোমার কাছেও মানে? দ্বিজুর কাজ, দ্বিজুর কথার মানেই যদি থাকবে বৌদি, এতকাল দয়াময়ী বিপ্রদাসের দরবারে না গিয়ে তোমার কাছেই তার সব আর্জি পেশ হ'তো কেন? মানে বোঝার গরজ তোমার নেই বলেই ত? আজ যাবার দিনেও সেইটুকুই থাক্ বৌদি, ঠিক-ঠিকের চুলচেরা বিচারে কাজ নেই। এই ব'লিয়া সুমুখে আসিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রনাম করিল। এমন সে করে না। পায়ের কাঁচা আলতার রঙ তাহার কপালে লাগিয়াছে, সতী ব্যস্ত হইয়া আঁচলে মুছাইয়া দিতে গেল, সে ঘাড় নাড়িয়া মাথা সরাইয়া বলিল, দাগ আপনিই মুছে যাবে বৌদি, একটা দিন থাকে থাক্। কথাটা কিছুই নয়, দ্বিজু হাসিয়াই বলিল, কিন্তু শুনিয়া বন্দনার দু'চোখ জলে ভরিয়া গেল। লুকাইতে গিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিল না।

দ্বিজদাস বলিল, আমি এসেছিলুম তাগাদা দিতে। সময় হয়ে আসচে, দাদা ব্যস্ত হয়ে পড়েচেন। জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েচে, বাসুকে জামা-কাপড় পরিয়ে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়েচি, মাঙ্গলিকের আয়োজন কে করে দিলে জানিনে কিন্তু তাও হাতের কাছে পেয়ে গেলুম। ভয় হয়েছিল অন্নদি হয়ত ডুবে মরেচেন, কিন্তু সন্দেহ হচ্চে কোথাও বেঁচেই আছেন। নইলে ওগুলো এলো কি করে? কিন্তু খুঁজে পাওয়া যখন তাকে যাবে না তখন খুঁজেও কাজ নেই। ওদিকে দয়াময়ীর মহল অর্গলবদ্ধ। সঙ্কট-উদ্ধরণের যে পন্থা তিনি অবলম্বন করেচেন তাতে করবার কিছুই নেই। তবে শ্রীমতী মৈত্রেয়ীকে বলে যেতে পারো যথাসময়ে মা'র কানে তা পৌঁছবে। কিন্তু আমি বলি প্রয়োজন নেই। এবার তুমি একটু তৎপর হয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসবে চলো বৌদি, তোমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এসে আমি নিস্তার পাই, একটু কাজে মন দিতে পারি।

সতী ম্লান হাসিয়া কহিল, আমাকে বিদায় করতে ঠাকুরপোর ভারি তাড়া।

আমার কাজ পড়ে রয়েচে যে।

কি কাজ শুনি?

এর আগে কখনো ত শুনতে চাওনি বৌদি। যখন যা চেয়েচি জিজ্ঞাসা না করে চিরকাল দিয়ে এসেচ। এ তোমার শোনার যোগ্য নয়।

সতী এবং বন্দনা উভয়েই ক্ষণকাল নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তা পরে সতী বলিল, তুমি যাও ঠাকুরপো, আর আমার দেরি হবে না। বন্দনাকে কহিল তুইও এখানে বেশি দেরি করিসনে বোন,—যত শীঘ্র পারিস্ বোম্বায়ে ফিরে যা। কলকাতায় যাবার দরকার নেই, কাকা সেখানে একলা রয়েছেন ম রাখিস।

বন্দনা বিজুর মতো পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা লইয়া মাথা দিল, বলিল, না মেজদি, মাসীর বাড়ীতে আর না। সেদিনের পাঠ উঠিয়ে দিয়েই বেরিয়েছিলুম এ কখনো ভুলব না। এই বলিয়া সে আঁচলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, হয় কালই বোম্বায়ে ফিরবো, কিন্তু তুমিও যাবার আগে এই ভরসা দিয়ে যাও মেজদি আবার যেন শীঘ্র তোমাদের দেখতে পাই।

সতী মনে মনে কি আশীর্বাদ করিল সে-ই জানে, হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল, হাস্যমুখে বলিল, সে তো তোর নিজের হাতে বন্দনা কাকাকে বলিস্ বিয়ের নেমন্তন্নপত্র দিতে, যেখানে থাকি গিয়ে হাজির হবোই একটুখানি থামিয়া বোধ হয় মনে মনে চিন্তা করিল বলা উচিত কি না তার পরে বলিল, ভারি সাধ ছিল এ বাড়ীতে তুই পড়বি। ঠাকুরপোর হাতে তোকে সঁপে দিয়ে তোর হাতে সংসারের ভার বাসুর ভার সব তুলে দিয়ে মায়ের সঙ্গে কৈলাস দর্শনে যাবো, ফিরতে না পারি না-ই পারলুম, কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর। এই বলিয়া সে চুপ করিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিল, এ-বাড়ীতে আমি যা পেয়েছিলুম জগতে কেউ তা পায় না। আবার সবচেয়ে বেশী করে পেয়েছিলুম আমার শাশুড়ীকে। কিন্তু তাঁর সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটলো সবচেয়ে বেশি। যাবার আগে প্রণাম করতে পেলুম না, দোর বন্ধ, চৌকাঠের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে বললুম, মা, এই কাঠের ওপরে তোমার পায়ের ধুলো লেগে আছে, এই আমার—কথা শেষ করিতে পারিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া এইবার সে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার দু'চোখ বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু নামিয়া আসিল। মিনিট দুই তিন গেল সামলাইতে আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, আর পেলুম না খুঁজে আমার অনুদিকে। সে আমার মায়েরও বড় বন্দনা। আমরা চলে গেলে তাকে বলিস ত রে, আমি রাগ করে গেছি। আবার দুচক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিল, আবার সে আঁচলে মুছিয়া ফেলিল

একটা বিড়াল পুষিয়াছিল, নাম নিমু। কাজ-কর্ম্মের বাড়ীতে সেটা যে কোথায় গিয়াছে ঠিকানা নাই। সকাল হইতে কয়েকবার মনে পড়িয়াছে, এখনও তাহাকে মনে পড়িল। বলিল, নিমুটা যে কোথায় ডুব মারলে দেখে যেতে পেলুম না। অন্যদিকে বলিস ত বন্দনা। অথচ, একটু পূর্ব্বেই জোর করিয়া বলিয়াছিল, তাহার এক দিকে রহিলেন স্বামী, অন্য দিকে সন্তান—সংসারের কোন ক্ষতিই তাহার হয় নাই! কথাটা কত বড়ই না মিথ্যা!

বৌদি করচো কি? বাহির হইতে দ্বিজদাসের আর এক দফা তাগাদা আসিল।

যাচ্ছি ভাই হয়েচে—বলিয়া সতী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

* * * *

ষ্টেশন হইতে দ্বিজদাস যখন একাকী ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে তেমনি আলো জ্বলিয়াছে, তেমনভাবেই লোকজন আপন-আপন কাজে ব্যস্ত, এই বৃহৎ পরিবারের কোথায় কি বিপ্লব ঘটিয়াছে কেহ জানেও না। বাহিরের মহলে উপরে বিপ্রদাসের বসিবার ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ,—ও-দিকটা অন্ধকার। এমন কত দিনই আলো জ্বলে না, বিপ্রদাস থাকেন কলকাতায়, অভাবনীয় কিছু নয়। সিঁড়ির বাঁ দিকের ঘরটায় থাকে অশোক, জানালা দিয়া চোখে পড়িল ইজি চেয়ারে পা ছড়াইয়া বাতির আলোকে সে নিবিষ্ট-চিত্তে কি একখানা বই পড়িতেছে। কলেজ কামাই করিয়া অক্ষয়বাবু আজও আছেন, তাঁর ঘরটা শেষের দিকে, তিনি ঘরে আছেন কিংবা বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছেন জানা গেল না। মোটর হইতে প্রাঙ্গণে পা দিয়াই দ্বিজদাসের চোখে পড়িয়াছিল ত্রিতলের লাইব্রেরী ঘরটা। সন্ধ্যার পর এ ঘরটা প্রায় থাকে অন্ধকার, আজ কিন্তু খোলা জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। তাহার সন্দেহ রহিল না এখানে আছে বন্দনা। বই পড়িতে নয়, চোখ মুছিতে। লোকের সংস্রব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সে এই নির্জ্জনে আশ্রয় লইয়াছে। আজ রাত্রিটা কোনমতে কাটাইয়া সে কাল চলিয়া যাইবে সুদূর বোম্বাই অঞ্চলে,—যেখানে মানুষ হইয়া সে এত বড় হইয়াছে—যেখানে আছে তাহার পিতা, আত্মীয় স্বজন, তাহার কত দিনের কত বন্ধু এবং বান্ধবী। কোনদিন কোন ছলে কখন যে এ গ্রামে তাহার আবার আসা সম্ভব ভাবাও যায় না। না আসুক কিন্তু এ-বাড়ী সে সহজে ভুলিবে না। বিচিত্র এ দুনিয়া,—কত অদ্ভুত অভাবিত ব্যাপারই না এখানে নিমিষে ঘটে। একটা একটা করিয়া সেই প্রথম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল কথাই দ্বিজুর মনে পড়িল। সেই হঠাৎ আসা আবার তেমনি হঠাৎ রাগ করিয়া যাওয়া। মধ্যে শুধু

বন্দনা কহিল, এ এক প্রকার ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

দ্বিজদাস বলিতে লাগিল, কি জানি, হতেও পারে। অথচ, এই বাসুর ভয়েই মা কাল থেকে ঘরে দোর দিয়ে আছেন। নইলে দাদার জন্যেও না। বৌদিদির জন্যেও না। মা ভাবেন বাসুকে বুঝি তিনি মানুষ করেচেন, কিন্তু হিসেব করলে দেখতে পাবেন ওর বয়সের অর্দ্ধেক কাল কেটেচে ওঁর তীর্থবাসে। তখন কার কাছে থাকতো ও? আমার কাছে। টাইফয়েড জ্বরে কে জেগেচে রাত দিন? আমি। আজ খাবার সময় কে দিলে সাজিয়ে? আমি। ওর জামা কাপড় থাকে আমার আলমারিতে, ওর বই-শ্লেটের জায়গা হ'লো আমার টেবিলে, ওর শোবার বিছানা আমার খাটে। মা টানাটানি করে নিয়ে যান—কিন্তু কত রাতে ঘুম ভেঙে ও পালিয়ে এসেচে আমার ঘরে।

বন্দনা নির্নিমেষে চাহিয়াছিল, বলিল, তবুও চোখের জল শুকিয়ে যেতে এক মুহূর্ত্তের বেশি লাগে না।

দ্বিজদাস কহিল, এই আমার স্বভাব। ওকে নিয়ে আমার ভাবনা শুধু এই যে, সে পড়বে গিয়ে তার বাপ-মায়ের হাতে। আপনি বলবেন, জগতে এই ত স্বাভাবিক, এতে ভয়ের কি আছে? কিন্তু স্বাভাবিক বলেই বিপদ হয়েচে এই যে, এত বড় উল্টো কথাটা মানুষকে আমি বোঝাবো কি করে!

বন্দনা এ-কথা বলিল না যে, বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি? অন্যপক্ষে বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাও তাহার কঠিন, বিশেষতঃ বিপ্রদাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু তর্ক না করিয়া সে নীরব হইয়াই রহিল।

পরক্ষণে বক্তব্য স্পষ্টতর করিতে দ্বিজদাস কহিল, একটা সান্ত্বনা বৌদি রইলেন কাছে, নইলে দাদার হাতে দিয়ে আমার তিলার্দ্ধ শান্তি থাকতো না।

বন্দনা কহিল, আপনি তো নির্ব্বিকার, বাসুর ভালোমন্দ নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কিসের? যা হয় তা হোক না?

শুনিয়া দ্বিজদাসের মুখের উপর সুতীক্ষ্ণ বেদনার ছায়া পড়িল, কিন্তু সে মৌন হইয়া রহিল।

বন্দনা কহিল, দাদার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কথা একদিন আপনার নিজের মুখে শুনেছিলুম। সেও কি ওই চোখের জলের মতো এক নিমিষে শুকিয়ে গেল? কিংবা যে লোক নিজের দোষে সর্ব্বস্বান্ত হয় তাকে বিশ্বাস করা চলে না এই কি অবশেষে বলতে চান?

দ্বিজদাস বিস্ময় ও ব্যথায় অভিভূত চক্ষে ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল,

তাহার পরে দুই হাত এক করিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না, সে আমি বলিনি। আমি বলছিলুম তৃষ্ণার জলের জন্যে মানুষে সমুদ্রের কাছে গিয়ে যেন না হাত পাতে। কিন্তু দাদার সম্বন্ধে আর আলোচনা নয়, বাইরের লোক তা বুঝবে না।

এ কথায় বন্দনা অন্তরে অত্যন্ত আহত হইল, কিন্তু প্রতিবাদেরও কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দ্বিজদাস একেবারে অন্য কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কালই বোম্বায়ে যাবেন?

বন্দনা বলিল, হাঁ।

অশোকবাবুই নিয়ে যাবেন?

হাঁ, তিনিই।

দ্বিজদাস বলিল, বোম্বাই-মেল এখান থেকে বেশি রাতে যায়, কাল আপনাদের আমি ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবো। কিন্তু দিনের বেলায় থাকতে পারবো না, একটু কাজ আছে।

বাবাকে একটা তার করে দেবেন?

আচ্ছা।

মিনিট দুই নীরব থাকিয়া, হঠাৎ করিয়া দ্বিজদাস কহিল, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো ভাবি, কিন্তু নানা কারণে দিন বয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করা আর হয় না। কাল চলে যাবেন, সময় আর পাবো না। যদি রাগ না করেন বলি।

বলুন।

দেরি হইতে লাগিল।

বন্দনা কহিল, রাগ করবো না, আপনি নির্ভয়ে বলুন।

দ্বিজদাস বলিল, কলকাতার বাড়ী থেকে মা একদিন রাগ করে বৌদিদিকে নিয়ে হঠাৎ চলে এলেন আপনার মনে পড়ে?

পড়ে।

কারণ না জেনে আপনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। মন খুব খারাপ ছিল, আমার ঘরে এসে সেদিন একটা কথা বলেছিলেন যে আমাকে আপনার ভাল লাগে। মনে পড়ে?

পড়ে। কিন্তু খুব লজ্জার সঙ্গেই পড়ে।

সে কথার মূল্য কিছু নেই?

না।

দ্বিজদাস ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, আমিও তাই ভাবি। ওর মূল্য কিছু নেই।

একটু পরে কহিল, বৌদি বলছিলেন আপনার মাসীর ইচ্ছে অশোকের সঙ্গে আপনার বিবাহ হয়। সে কি স্থির হ'য়ে গেছে?

বন্দনা বলিল, আমাদের পারিবারিক কথা। বাইরের লোকের সঙ্গে এ আলোচনা চলে না।

দ্বিজদাস বলিল, আলোচনা ত নয়, শুধু একটা খবর।

বন্দনা তিক্তকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে এমন কোন আত্মীয় সম্বন্ধ নেই যাতে এ প্রশ্ন আপনি করতে পারেন। দ্বিজুবাবু, আপনি শিক্ষিত লোক, এ কৌতূহল আপনার লজ্জাকর।

শুনিয়া দ্বিজদাস সত্যিই লজ্জা পাইল, তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। বলিল, আমার ভুল হয়েচে বন্দনা, স্বভাবতঃ আমি কৌতূহলী নই, পরের কথা জানবার লোভ আমার খুব কম। কিন্তু কি করে জানিনে আমার মনে হ'লো যে-কথা সংসারে কাউকে বলতে পারিনে আপনাকে পারি। যে-বিপদে কাউকে ডাকা চলে না আপনাকে চলে। আপনি—

তাহার কথার মাঝখানেই বন্দনা হাসিয়া বলিল, কিন্তু এই বললেন দাদার আলোচনা বাইরের লোকের সঙ্গে করতে আপনি চান না। আমি তো পর, একেবারে বাইরের লোক।

দ্বিজদাস কহিল, তাই যদি হয়, তবে আপনিই বা কেন তাঁর সম্বন্ধে আমাকে অশ্রদ্ধার খোঁটা দিলেন? জানেন না কি হচ্ছে আমার? দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাহার চোখের কোণাদু'টা অশ্রুবাষ্পে ছল্ ছল্ করিয়া আসিয়াছে।

মৈত্রেয়ী ঘরে ঢুকিল। বলিল, দ্বিজুবাবু, আপনি কখন বাড়ী এলেন আমরা তো কেউ জানতে পারিনি?

দ্বিজদাস ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, জানবার দরকার হয়েছিল নাকি?

মৈত্রেয়ী কহিল, বেশ কথা। আপনি কাল খাননি, আজ খাননি,—এ আর কেউ না জানুক আমি জানি। চলুন মা'র ঘরে।

কিন্তু মা'র দরজা ত বন্ধ।

মৈত্রেয়ী বলিল, বন্ধই ছিল, কিন্তু আমি ছাড়িনি। মাথা খোঁড়া খুঁড়ি করে দোর খুলিয়েচি, তাঁকে স্নান করিয়েচি, আহ্নিক করিয়েচি, জোর করে দুটো ফল মুখে গুঁজে

দিয়ে খাইয়ে তবে ছেড়েচি। বলছিলেন, দ্বিজু না খেলে খাবেন না। বললাম, সে হবে না মা আপনার এ আদেশ আমি মানতে পারবো না। কিন্তু তখন থেকে সবাই আমরা আপনার পথ চেয়ে আছি। চলুন আপনার খাবার রেখে এসেচি মা'র ঘরে।

দ্বিজদাস অবাক হইয়া রহিল। ইহার এক কথা সে পূর্ব্বে শোনে নাই। বলিল, চলুন।

মৈত্রেয়ী বন্দনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আপনিও আসুন। মা আপনাকে ডাকচেন। এই বলিয়া সে দ্বিজদাসকে এক প্রকার গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। সকলের পিছে চলে গেল বন্দনা।

শোবার ঘরের মধ্যে দয়াময়ী ছিলেন বিছানায় শুইয়া। অনুজ্জ্বল দীপালোকে তাঁহার শোকাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিতে ক্লেশ বোধ হয়। অশ্রুস্ফীত দুই চক্ষু আরক্ত, সদ্যস্নানে আর্দ্র কেশগুলি আলুথালু বিপর্যস্ত। শিয়রে বসিয়া কল্যাণী হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অন্য দিকে একটা চেয়ারে শশধর, দূরে আর একটা চেয়ারে বসিয়া অক্ষয়বাবু। দ্বিজদাস ঘরে ঢুকিতেই দয়াময়ী মুখ ফিরাইয়া শুইলেন, এবং পরক্ষণেই একটা অস্ফুট ক্রন্দনের অবরুদ্ধ আবেগে তাঁহার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বন্দনা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল, এমন ব্যাপার দৃশ্য বোধ করি সে কখনো কল্পনা করিতেও পারে নাই। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই নির্ব্বাক, এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথমে কথা কহিল শশধর। বলিল, কাল থেকে শুনচি না খেয়েই আছো, যা হোক দু'টো মুখে দাও।

দ্বিজদাস বলিল, হুঁ।

টেবিলের উপর ঠাঁই করিয়া মৈত্রেয়ী যত্নে খাবার গুছাইয়া দিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া শশধর প্রশ্ন করিল, তোমার ফিরতে দেরি হ'ল যে? ওঁরা গেলেন তো সেই সাড়ে ন'টার গাড়ীতে?

হাঁ।

শশধর একটুখানি হাসির ভাব করিয়া বলিল, অথচ, কলকাতার বাড়ীটা তো শুনেচি তোমার।

দ্বিজদাস কহিল, আমার বাড়ীতে দাদার প্রবেশ নিষেধ নাকি?

শশধর কহিল, না বলিনি। বরঞ্চ তিনিই যেন এই ভাবটা দেখিয়ে গেলেন। এ বাড়ী ছেড়েও তো তাঁর যাবার দরকার ছিল না, একটা মিটমাট করে নিলেই তো পারতেন।

দ্বিজদাস বলিল, মিটমাটের পথ যদি খোলা ছিল আপনি করে নিলেন না কেন?

আমি করে নেবো? শশধর অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, এ কি রকম প্রস্তাব? আমাকে অপমান করলেন তিনি আর মিটমাট করবো আমি? মন্দ যুক্তি নয়! এই বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে দ্বিজদাস বলিল, যুক্তি মন্দ দিইনি শশধরবাবু। মেয়েরা কথায় বলে পর্বতের আড়ালে থাকা। দাদা ছিলেন সেই পর্বত, আপনি ছিলেন তাঁর আড়ালে। এখন মুখোমুখি দাঁড়ালুম আমি আর আপনি। মান-অপমানের পালা সাঙ্গ হয়ে তো যায়নি, সবে সুরু হ'লো।

তার মানে?

মানে এই যে, আমি আপনার বাল্যবন্ধু বিপ্রদাস নই - আমি দ্বিজদাস।

শশধরের মুখের হাসি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল, ভয়ানক গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার কথার অর্থ কি বেশ খুলে বল দিকি?

দাদার বন্ধু বলিয়া শশধর 'তুমি' বলিয়া ডাকিলেও দ্বিজদাস তাহাকে 'আপনি' বলিয়াই সম্বোধন করিত, বলিল, আপনার এ-কথা মানি যে অর্থ আর স্পষ্ট হওয়াই ভালো। আমার দাদা সেই জাতের মানুষ যারা সত্য-রক্ষার জন্যে সর্বস্বান্ত হয়, আশ্রিতের জন্য গায়ের মাংস কেটে দেয়, ওদের আদর্শ বলে কি অদ্ভুত বস্তু আছে যার জন্যে পারে না এমন কাজ নেই, —ওরা এক ধরনের পাগল, তাই এই দুর্দশা। কিন্তু আমি নিতান্ত সাধারণ মানুষ, আপনার সঙ্গে বেশি প্রভেদ নেই। ঠিক আপনার মতই আমার হিংসা আছে, ঘৃণা আছে, প্রতিশোধ নেবার শয়তানি বুদ্ধি আছে, সুতরাং দাদাকে ঠকিয়ে থাকলে আপনাকেও ঠকাবো, তাঁর নাম জাল করে থাকলে স্বচ্ছন্দে আপনাকে জেলে পাঠাবো,- অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না দু'পক্ষই একদিন পথের ভিখিরি হয়ে দাঁড়াই। বিজ্ঞ-জনের মুখে শুনি এমনিই নাকি এর পরিণতি। তাই হোক।

শশধর উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, মা শুনেছেন আপনার দ্বিজুর কথা? ওর যা মুখে আসে বলতে ওকে বারণ করে দিন।

দ্বিজদাস বলিল, মাকে নালিশ জানিয়ে লাভ নেই শশধরবাবু। উনি জানেন আমি বিপিন নই,—মাতৃবাক্য দ্বিজুর বেদবাক্য নয়। দ্বিজু তাল ঠুকে স্পর্দ্ধার অভিনয় করে না একথা মা বোঝেন।

কাহারো মুখে কথা নাই, উভয়ের অকস্মাৎ এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ যেন সম্পূর্ণ অভাবিত। বিস্ময়ে ও ভয়ে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। শশধর বুঝিল ইহা পরিহাস নয় অতিশয় কঠোর সঙ্কল্প। উত্তর দিতে গিয়া তার কণ্ঠস্বরে পূর্ব্বের

প্রবলতা ছিল না, তথাপি জোর দিয়াই বলিয়া উঠিল, এই শেষ। এখানে আর আমি জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করবো না।

দ্বিজদাস বলিল, কি করে করছিলেন এতক্ষণ এই ত আশ্চর্য্য শশধরবাবু।

কল্যাণী কাঁদিয়া বলিল, ছোড়দা, অবশেষে তুমিই কি আমাদের মারতে চাও? মায়ের পেটের ভাই তুমি, তুমিই করবে আমাদের সর্ব্বনাশ?

দ্বিজদাস বলিল, তুই ভাবিস্ চোখের জল ফেলে বার বার এড়ানো যায় সর্ব্বনাশ? কোথাও বিচার হবে না, তোদেরই হবে বারংবার জিৎ? দাদা নেই বটে, তবুও থেকে যখন পারিনে আসিস্ আমার কাছে, তখন তোর কান্না শুনবো,—এখন নয়।

দয়াময়ী নিঃশব্দে অনেক সহিয়াছিলেন আর পারিলেন না, চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দ্বিজু, তুই যা এখান থেকে। এমনি করে গালি-গালাজ করতে কি বিপিন তোকে শিখিয়ে দিয়ে গেল?

কে শিখিয়ে দিয়ে গেল বললে? বিপিন?

হাঁ, সেই। নিশ্চয় সে।

দ্বিজদাসের কণ্ঠস্বর মুহূর্ত্তের জন্য কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিল, আমি যাচ্ছি। কিন্তু মা, নিজেকে অনেক ছোট করেচো, আর ছোট ক'রোনা। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

নিজের ঘরে আসিয়া দ্বিজদাস চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ঘণ্টা দুই পরে মৈত্রেয়ী আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে খাবারের পাত্র, বলিল, খাবার সব নতুন করে তৈরী করে নিয়ে এলুম, খেতে বসুন। এই ঘরেই ঠাঁই করে দিই?

এ আপনাকে কে বলে দিলে?

কেউ না। কাল থেকে আপনি খাননি সে কি আমি জানিনে?

এত লোকের মধ্যে আপনার জানার প্রয়োজন?

মৈত্রেয়ী মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব না পাইয়া দ্বিজদাস বলিল, আচ্ছা ঐখানেই রেখে যান। এখন ক্ষিদে নেই, যদি হয় পরে খাবো।

মৈত্রেয়ী ঘরের একধারে আসন পাতিয়া খাবার রাখিয়া সমস্ত সযত্নে ঢাকা দিয়া চলিয়া গেল। পীড়াপীড়ি করিল না, বলিল না যে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে খাওয়ার অসুবিধা ঘটিবে।

রাত্রি বোধ করি তখন বারোটা বাজিয়াছে, দ্বিজদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। সামান্য কিছু খাইয়া শুইয়া পড়িবে এই মনে করিয়া হাত-মুখ ধুইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল দ্বারের বাহিরে কে-একজন বসিয়া আছে। বারান্দার স্বল্প আলোকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

আমি মৈত্রেয়ী।

দ্বিজদাসের বিস্ময়ের সীমা নাই, কহিল এত রাতে আপনি এখানে কেন?

থেকে বসে যদি কিছু দরকার হয় তাই বসে আছি।

এ আপনার ভারি অন্যায়। একে ত প্রয়োজন নেই, আর যদি বা হয় বাড়ীতে আর কি কেউ নেই?

মৈত্রেয়ী মৃদু-কণ্ঠে বলিল, ক'দিন নিরন্তর পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত। কেউ জেগে নেই, সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি নিজেও ত কম খাটেননি, তবে ঘুমোলেন না কেন?

মৈত্রেয়ী উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিজদাসের রুক্ষ স্বর এবার অপেক্ষাকৃত অনেকটা নরম হইয়া আসিল, বলিল, এ-ভাবে বসে থাকাটা বিশ্রী দেখতে। আপনি ভেতরে এসে বসুন, যতক্ষণ খাই তদারক করুন। এই বলিয়া সে মুখ-হাত ধুইতে জলের ঘরে চলিয়া গেল।

ইতিপূর্বে মৈত্রেয়ীর সহিত দ্বিজদাস কম কথাই কহিয়াছে। প্রয়োজন হয় নাই, ইচ্ছাও করে নাই। এখন আলাপটা কিভাবে চালাইবে ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, না আছে খাবারের পাত্র না আছে মৈত্রেয়ী নিজে। ব্যাপারটা ইতিমধ্যে কি ঘটিল অনুমান করিবার পূর্বেই কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ঢাকা খুলে দেখি সমস্ত শুকিয়ে শক্ত হয়ে উঠেচে, তাই আবার আনতে গিয়েছিলুম। বসুন।

দ্বিজদাস কহিল, ধুঁয়া উঠচে দেখচি। এত রাত্রে ও-সব আবার পেলেন কোথায়?

মৈত্রেয়ী বলিল, ঠিক করে রেখে এসেছিলুম। যখনি বললেন খেতে দেরী হবে তখনি জানি এ-সব না রাখলে হয়ত খাওয়াই হবে না।

দ্বিজদাস ভোজনে বসিয়া প্রথমে রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া জানিল ইহার কতকগুলি মৈত্রেয়ীর স্বহস্তের তৈরী। সেগুলি বারংবার অনুরোধ করিয়া সে দ্বিজদাসকে বেশি করিয়া খাওয়াইল। এ-বিদ্যায় সে ব্যুৎপন্ন জানে কি করিয়া খাওয়াইতে হয়।

দ্বিজদাস হাসিয়া কহিল, বেশি খেলে অসুখ করবে যে।

না, করবে না। কাল থেকে উপোস করে আছেন, একে বেশি খাওয়া বলে না।

কিন্তু আমিই ত কেবল না খেয়ে নেই, এ বাড়ীতে বোধ করি অনেকেই আছেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, অনেকের কথা জানিনে, কিন্তু মাকে যে কি করে দুটো খাওয়াতে

পেরেচি সে শুধু আমিই জানি। আমি না থাকলে কতদিন যে তিনি দোর বন্ধ করে অনাহারে থাকতেন আমার ভাবলে ভয় হয়। কিন্তু আমাকে 'আপনি' বলবেন না, শুনলে বড় লজ্জা করে। আমি কত ছোট।

দ্বিজদাস কহিল, সেই ভালো, তোমাকে আর 'আপনি' বলবো না। কিন্তু তুমি অন্নদাদিদির খবর নিয়েছিলে?

মৈত্রেয়ী কহিল তার আবার কি হ'লো? সেও কি না খেয়ে আছে না কি?

এতক্ষণ মৈত্রেয়ীর কথাগুলি তাহার বেশ লাগিতেছিল, একটা প্রসন্নতার বাতাস এই দুঃখের মধ্যেও যেন তাহার মনটাকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল কিন্তু এই শেষ কথাটায় চিত্ত তাহার মুহূর্তে বিরূপ হইয়া উঠিল, কহিল, অন্নদির সম্বন্ধে এ-ভাবে কথা বলতে নেই। হয়ত শুনচো সে আমাদের দাসী, কিন্তু এ-বাড়ীতে তাঁর চেয়ে বড় আমার কেউ নেই। আমাদের মানুষ করেচেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, তা শুনেচি। কিন্তু কত বাড়ীতেই ত পুরনো দাস দাসী ছেলেপুলে মানুষ করে। তাতে নতুন কি আছে? আচ্ছা আপনার খাওয়া হয়ে গেলে তাঁর খবর নেবো।

দ্বিজদাস নিরুত্তরে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ মনে হইল, সত্যই ত, এমন কত পরিবারেই ঘটিয়া থাকে, যে ভিতরের কথা জানে না, তাহার কাছে শুধু বাহিরের ঘটনায় একান্ত বিস্ময়কর ইহাতে কি আছে। কঠোর বিচার হাল্কা হইয়া আসিল, কহিল, অন্নদি না খেয়ে থাকলেও এত রাত্রে আর খাবেন না। তাঁর জন্যে আজকে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

আবার কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিলে দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, মৈত্রেয়ী, পরকে এমন সেবা করতে শিখলে তুমি কার কাছে? তোমার মার কাছে কি?

মৈত্রেয়ী বলিল, না, আমার দিদির কাছে। তাঁর মতো স্বামীকে যত্ন করতে আমি কাউকে দেখিনি।

দ্বিজদাস হাসিয়া বলিল, স্বামী কি পর? আমি পরকে যত্ন করবার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

ওঃ—পর? বলিয়াই মৈত্রেয়ী হাসিয়া সলজ্জে মুখ নীচু করিল।

দ্বিজদাস বলিল, আচ্ছা বলো তোমার দিদির কথা।

মৈত্রেয়ী বলিল, দিদি কিন্তু বেঁচে নেই। তিন বছর হ'লো একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে রেখে মারা গেছেন। চৌধুরীমশাই কিন্তু একটা বছরও অপেক্ষা করলেন না, আবার বিয়ে করলেন। কত বড় অন্যায় বলুন ত!

দ্বিজদাস বলিল, পুরুষমানুষে তাই করে। ওরা অন্যায় মানে না।

আপনিও তাই করবেন নাকি?

আগে একটাই ত করি তার পরে অন্যটার কথা ভাববো।

মৈত্রেয়ী বলিল, এমন করে বললে ত চলবে না। তখন আপনার বৌদিদি ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নেই। মাকে দেখবে কে?

দ্বিজদাস বলিল, কে দেখবে জানিনে মৈত্রেয়ী, হয়ত মেয়ে-জামাই দেখবে, হয়ত আর কেউ এসে তাঁর ভার নেবে,—সংসারে কত অসম্ভবই যে সম্ভব হয় কেউ নির্দ্দেশ করতে পারে না। আমাদের কথা থাক্, তোমার নিজের কথা বলো।

কিন্তু আমার নিজের কথা ত কিছু নেই।

কিছুই নেই? একেবারে কিচ্ছু নেই?

মৈত্রেয়ী প্রথমে একটু জড়সড় হইয়া পড়িল, তার পরে একটু হাসিয়া বলিল, ও, আমি বুঝেছি। আপনি চৌধুরীমশায়ের কথা কারো কাছে শুনেচেন বুঝি? ছি ছি, কি নির্লজ্জ মানুষ, দিদি মরতে প্রস্তাব করে পাঠালেন আমাকে বিয়ে করবেন।

তার পরে?

মৈত্রেয়ী বলিল, চৌধুরীমশায়ের অনেক টাকা, বাবা মা দুজনেই রাজী হয়ে গেলেন, বললেন, আর কিছু না হোক লীলার ছেলে মেয়েগুলো মানুষ হবে। যেন সংসারে আমার আর কিছু কাজ নেই দিদির ছেলে মানুষ করা ছাড়া। বললুম, ও কথা তোমরা মুখে আনলে আমি গলায় দড়ি দেবো।

কেন, এতে আপত্তি তোমার কিসের?

আপত্তি হবে না? জগতে এত বড় অশান্তি আর কিছু আছে নাকি?

দ্বিজদাস বলিল, এ-কথা তোমার সত্যি নয়। জগতে সকল ক্ষেত্রেই অশান্তি আসে না মৈত্রেয়ী। আমার মা দাদাকে মানুষ করেছিলেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার ফল হ'লো কি। আজকের মত দুঃখের ব্যাপার এ-বাড়ীতে আর কখনো এসেচে কি?

দ্বিজদাস স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইহার কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু সত্যিও কিছুতে নয়। মিনট দুই তিন অভিভূতের মত বসিয়া অকস্মাৎ যেন তাহার চমক ভাঙিয়া গেল, বলিল, মৈত্রেয়ী, প্রতিবাদ আমি করবো না এ পরিবারে মহাদুঃখ এলো সত্যি, তবু জানি, তোমার এ-কথা সাধারণ মেয়েদের অতি তুচ্ছ সাংসারিক হিসাবের চেয়ে বড় নয়। বলিয়াই সে উঠিয়াই দাঁড়াইল, তাহার খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল।

পরদিন সমস্ত দুপুর-বেলা সে বাড়ী ছিল না, কি কাজে কোথায় গিয়াছিল সে-ই জানে। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে বাড়ী ফিরিয়া সোজা গিয়া দাঁড়াইল বন্দনার গৃহের সম্মুখে, ডাকিল, আসতে পারি ?

কে, দ্বিজুবাবু ? আসুন।

দ্বিজদাস ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বন্দনার বাক্স গুছানো শেষ হইয়াছে, যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। কহিল, সত্যিই চললেন তা হলে ? একটা দিনও বেশি রাখা গেল না ?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বন্দনার ইচ্ছা হইল না বলে, তবু বলিতেই হইল,—যেতেই ত হবে, একটা দিন বেশি রেখে আমাকে লাভ কি বলুন ?

দ্বিজদাস বলিল, লাভের কথা ত ভাবিনি, শুধু ভেবেচি সবাই গেল—এত বড় বাড়ীতে বন্ধু আর কেউ রইলো না।

বন্দনা কহিল, পুরনো বন্ধু যায়, নতুন বন্ধু আসে এমনিই জগৎ দ্বিজুবাবু। সেই আশায় ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়,—চঞ্চল হলে চলে না।

দ্বিজদাস উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

বন্দনা বলিল, সময় বেশি নেই, কাজের কথা দুটো বলে নিই। শুনেচেন বোধ হয় শশধরবাবু কল্যাণীকে নিয়ে চলে গেছেন ?

না শুনিনি, কিন্তু অনুমান করেছিলুম।

যাবার পূর্ব্বে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত তাদের খাওয়াতে পারা গেল না। দু'জনে এসে মাকে প্রণাম করে বললেন, আমরা চললুম। মা বললেন, এসো। তার পর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। এই বলিয়া বন্দনা নীরব হইল। যে কারণে তাহার যাওয়া, যে-সকল কথা মায়ের সম্মুখে দ্বিজু গত রাত্রে বলিয়াছিল, তাহা উল্লেখ মাত্র করিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, মা ভারি ভেঙে পড়েচেন। দেখলে মায়া হয়,—লজ্জায় কারো কাছে যেন মুখ দেখাতে পারেন না। মৈত্রেয়ী ওঁর যে সেবা করচে বোধ হয় আপন মেয়েতে তা পারে না। মা সুস্থ হয়ে যদি ওঠেন সে শুধু ওর যত্নে। মেয়েটি বেশ ভাল, কিছুদিন ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন এই আমার অনুরোধ।

তাই হবে।

দ্বিজুবাবু, যাবার আগে আর একটি অনুরোধ করে যাবো ?

করুন।

আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

কেন ?

বন্দনা বলিল, এই বৃহৎ পরিবার নইলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। আপনাদের অনেক ক্ষতি হ'লো জানি কিন্তু যা রইলো সেও অনেক। আপনাদের কত দান, কত কাজ, কত আশ্রিত পরিজন, কত দীন-দরিদ্রের অবলম্বন আপনারা—আর সে কি শুধু আজ! কত দীর্ঘকাল ধরে এর ধারা বয়ে চলচে। আপনাদের পরিবারে কোনদিন বাধা পায়নি, সে কি এখন বন্ধ হবে? দাদার ভুলে যা গেলো সে ছিল বাহুল্য, সে ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। যাক সে। যা রেখে গেলেন শান্তমনে তাবেই যথেষ্ট বলে নিন। সেই অবশিষ্ট আপনার অক্ষয় অজস্র হোক, প্রতিদিনের প্রয়োজনে ভগবান অভাব না রাখুন, আজ বিদায় নেবার পূর্ব্বে তাঁর কাছে এই প্রার্থনা জানাই।

দ্বিজদাসের চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বন্দনা বলিতে লাগিল, আপনার বাবা অখণ্ড ভরসায় দাদার ওপর সর্ব্বস্ব রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা রইলো না। পিতার কাছে অপরাধী হয়ে রইলেন। কিন্তু এই ত্রুটি যদি দৈন্য এনে তাঁদের পুণ্য কর্ম্ম বাধাগ্রস্ত করে, কোনদিন মুখুয্যেমশাই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন না। এই অশান্তি থেকে তাঁকে আপনার বাঁচাতে হবে।

দ্বিজদাস অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিল, দাদার কথা এমন করে কেউ ভাবেনি বন্দনা, মাও না। এ কি আশ্চর্য্য!

ভাগ্য ভালো যে, বাতিদানের ছায়ার আড়ালে সে বন্দনার মুখের চেহারা দেখতে পাইল না। বলিল, দাদার জন্যে সকল দুঃখই নিতে পারি, কিন্তু তাঁর কাজের বোঝা বইবো কি করে—সাহস পাইনে যে! সেই সব দেখতেই আজ বেরিয়েছিলুম। তাঁর ইস্কুল, পাঠশালা, টোল, মুসলমানদের ছেলেদের জন্যে মক্তব,—আর সেই কি দু'একটা? অনেকগুলো। প্রজাদের জল নিকাশের একটা খাল কাটা হচ্চে, বহুদিন ধরে তার টাকা যোগাতে হবে। কাগজপত্রের সঙ্গে একটা দীর্ঘ তালিকা পেয়েচি—শুধু দানের অঙ্ক। তারা চাইতে এলে কি যে বলব, জানিনে।

বন্দনা কহিল, বলবেন তারা পাবে। তাদের দিতেই হবে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এতকাল তিনি কিছুই কি কাউকে জানাননি?

এর কারণ ?

দ্বিজদাস বলিল, সুকৃতি গোপন করার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু জানাবেন কাকে সংসারে তাঁর বন্ধু কেউ ছিল না। দুঃখ যখন এসেচে একাকী বহন করেচে আনন্দ যখন এসেচে তাকেও উপভোগ করেচেন একা। কিংবা জানিয়ে থাক হয়ত তাঁর ঐ একটি মাত্র বন্ধুকে।—এই বলিয়া সে উপরের দিকে চাহিয়া কহি কিন্তু সে খবর আত্মীয় স্বজন জানবে কি করে! জানেন শুধু তিনি আর তাঁর অন্তর্যামী।

বন্দনা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা দ্বিজুবাবু, আপনার কি মনে হয় মুখুয্যেমশাই কাউকে কোনদিন ভালোবাসেননি? কোন মানুষকেই না?

দ্বিজদাস বলিল, না, সে তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মানুষের সংসারে এত বড় নিঃস একলা মানুষ আর নেই। তার পরে বহুক্ষণ অবধি উভয়েই নীরব হইয়া রহিল।

বন্দনা জোর করিয়া একটা ভার যেন ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, বলিল, তা হোক, দ্বিজুবাবু। তাঁর সমস্ত কাজ আপনাকে তুলে নিতে হবে,—একটিও ফেলতে পারবেন না।

কিন্তু আমি তো দাদা নই, একলা পারবো কেন বন্দনা?

একলা তো নয় দু'জনে নেবেন। তাই ত বলচি আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

কিন্তু ভালো না বাসলে আমি বিয়ে করবো কি করে?

বন্দনা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, এ কি বলচেন দ্বিজু এ-কথা ত আমাদের সমাজের শুধু আমরাই বলে থাকি। কিন্তু আপনাদের পরিবা কে কবে ভালোবেসে বিয়ে করেচে যে আপনার না হলে নয়? এ ছলনা ছেড়ে দিন।

দ্বিজদাস বলিল, এ বিধি আমাদের বাড়ীর নয় বটে, কিন্তু সেই নজিরই কি চিরদিন মানতে হবে? তাতেই সুখী হবো এ বিশ্বাস আর নেই।

বন্দনা বলিল, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তর্ক চলে না, সুখের জামিন নিতেও পারবো কারণ সে ধন যাঁর হাতে তাঁর ঠিকানা জানিনে। অদ্ভুত তাঁর বিচারপদ্ধতি,—ত অন্বেষণ বৃথা। কিন্তু বিয়ের আগে নয়ন মন-রঞ্জন পূর্ব্বরাগের খেলা খেললুম অনে আবার একদিন সে অনুরাগ দৌড় দিলে যে কোন গহনে সে প্রহসনও দেখ পেলুম অনেক। আমি বলি ও ফাঁদে পা দিয়ে কাজ নেই দ্বিজুবাবু, সো মায়া মৃগ যে-বনে চরে বেড়াচ্চে বেড়াক, এ বাড়ীতে সমাদরে আহ্বান করে কাজ নেই।

দ্বিজদাস মৃদু হাসিয়া কহিল, তার মানে সুধীরবাবু দিয়েচেন আপনার ভয়ানক বিগড়ে।

বন্দনাও হাসিয়া বলিল, হাঁ। কিন্তু মনের তখনও যেটুকু বাকি ছিল বিগড়ে ন আপনি, আবার তার পরে এলেন অশোক। এখন পোড়া অদৃষ্টে উনি টিকে লে বাঁচি।

উনি কে? অশোক? তাঁকে আপনার ভয়টা কিসের?

ভয়টা এই যে তিনিও হঠাৎ ভালোবাসতে সুরু করেচেন।

কেউ ভালবাসার ধার দিয়েও যাবে না এই বুঝি আপনার সঙ্কল্প?

হাঁ, এই আমার প্রতিজ্ঞা। বিয়ে যদি কখনো করি, মস্ত সুখের আশায় যেন বিড়ম্বনায় না পা দিই। তাই অশোকবাবুকে কাল সতর্ক করে দিয়েচি। াকে ভালোবাসলেই আমি ছুটে পালাবো।

শুনে তিনি কি বললেন?

বললেন না কিছুই, শুধু দু'চোখ মেলে চেয়ে রইলেন। দেখে বড় দুঃখ হ'লো বাবু।

দুঃখ যদি সত্যিই হয়ে থাকে ত আজো আশা আছে; কিন্তু জানবেন এ-সব শুধু র বাড়ীর ঘোরতর প্রতিক্রিয়া,—শুধু সাময়িক।

বন্দনা বলিল, অসম্ভব না হতেও পারে। কিন্তু শিখলুম অনেক। ভাবি, ভাগ্যে ছিলুম কলকাতায় নইলে কত জিনিস ত অজানা থেকে যেতো।

দ্বিজদাস কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশি সময় আর নেই, এবার শেষ দশ আমাকে দিয়ে যান কি আমাকে করতে হবে।

বন্দনা পরিহাসের ভঙ্গিতে মাথাটা বার কয়েক নাড়িয়া বলিল, উপদেশ চাই? ই চাই নাকি?

দ্বিজদাস বলিল, হাঁ। সত্যিই চাই। আমি দাদা নই, আমার বন্ধুর প্রয়োজন, দেশের প্রয়োজন। বিবাহ করতে আমাকে বলে গেলেন, আমি তাই করবো। ভালোবাসা না পাই, বন্ধুত্ব না পেলে যত ভার দিয়ে গেলেন, আমি বইবো রে?

দ্বিজুর মুখে পরিহাসের আভাস মাত্র নাই, কণ্ঠস্বর বন্দনাকে বিচলিত করিল, ল, ভয় নেই দ্বিজুবাবু, বন্ধু আসবে, সত্যিকার প্রয়োজনে ভগবান তাকে আপনার রগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন, এ বিশ্বাস রাখবেন।

প্রত্যুত্তরে দ্বিজু কি একটা বলিতে গেল কিন্তু বাধা পড়িল। বাহির হইতে ত্রীর সাড়া পাওয়া গেল—দ্বিজুবাবু আছেন এ ঘরে? মা আপনাকে একবার চেন।

দ্বিজু উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, বারোটায় গাড়ী, সাড়ে এগারোটায় বার হতে হবে। ঠিক সময় এসে ডাক দেবো। মনে থাকে যেন। এই বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

২৫

বন্দনার নির্বিঘ্নে বোম্বাই পৌঁছান-সংবাদের উত্তরে দিনকয়েক পরে দ্বিজদাসের নিকট হইতে জবাব আসিয়াছিল যে, সে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে চিঠি লিখিতে পারে নাই। বন্দনা নিজের চোখে যেমন দেখিয়া গিয়াছে সমস্ত তেমনি চলিতেছে। বিশেষ করিয়া জানাইবার কিছু নাই। মৈত্রেয়ীর পিতা কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে নিজে এখনও এ-বাড়ীতেই আছে। মায়ের সেবা-যত্নের ত্রুটি ধরিবার কিছু নাই, সংসারের ভারও তাহারি উপর পড়িয়াছে, ভালোই চালাইতেছে। বাড়ীর সকলেই তাহার প্রতি খুশী। দ্বিজদাসের নিজের পক্ষ হইতে আজিও অভিযোগের কারণ ঘটে নাই। পরিশেষে, বন্দনা ও তাহার পিতার শুভকামনা করিয়া ও যথাবিধি নমস্কারাদি জানাইয়া সে পত্র সমাপ্ত করিয়াছে।

ইহার পরে তিন মাসেরও অধিক সময় কাটিয়াছে, কিন্তু কোন পক্ষ হইতেই আর পত্রাদির আদান প্রদান হয় নাই। বিপ্রদাসের, মেজদিদির, বাসুর সংবাদ জানিতে মাঝে মাঝে বন্দনার মন উতলা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জানিবার উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। নিজে হইতে তাঁহারা আজও খবর দেন নাই,—কোথায় আছেন, কেমন আছেন, সমস্তই অপরিজ্ঞাত। ইহারই সুপারিশ করিতে দ্বিজদাসকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিবার লজ্জা এত বড় যে, শত ইচ্ছা সত্ত্বেও একাজ তাহার কাছে অসাধ্য ঠেকিয়াছে। এখন বলরামপুরের স্মৃতির তীক্ষ্ণতা ও বেদনার তীব্রতা দুই-ই অনেক লঘু হইয়া গেছে, কিন্তু সেখান হইতে চলিয়া আসার পরে সে প্রায় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু দিনের পর দিন ধরিয়া ব্যথাতুর বিক্ষুব্ধ চিত্ত-তল ধীরে ধীরে যতই শান্ত হইয়া আসিয়াছে ততই উপলব্ধি করিয়াছে তাহার সম্বন্ধ কোন সত্যকার সম্বন্ধ নহে। একত্রবাসের সেই দুঃখে-সুখে ভরা অনির্ব্বচনীয় দিনগুলি বিচিত্র ঘনিষ্ঠতায় মনের মধ্যে যতই কেন-না নিবিড়তার মোহ সঞ্চার করিয়া থাক, আয়ু তার ক্ষণস্থায়ী। একথা বুঝিতে তাহার বাকী নাই যে, এই আচারনিষ্ঠ প্রাচীন-পন্থী মুখুয্যে-পরিবারের কাছে সে আবশ্যকও নয়, আপনারও নয়, উভয় পক্ষের শিক্ষা সংস্কার ও সামাজিক পরিবেষ্টনে যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যেমন সত্য তেমন কঠিন।

ইতিমধ্যে স্বামীর কর্ম্মস্থল পাঞ্জাব হইতে মাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শরীর ভালো নয়। পাঞ্জাবের চেয়ে বোম্বায়ের জল-বাতাস ভালো এ বুদ্ধি তাঁহাকে কোন্ ডাক্তার দিয়াছে সে তিনিই জানেন। কিন্তু আসিয়াছেন স্বাস্থ্যের অজুহাতে। বোম্বাই আসিবার পূর্ব্বে বন্দনা দেখা করিয়া আসে নাই। এ অভিযোগ তাঁহার মনের মধ্যে ছিল, কিন্তু বোনঝির মেজাজের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছেন তাহাতে ভগিনীপতি রে সাহেবের দরবারে প্রকাশ্যে নালিশ রুজু করিবার সাহস ছিল না, তথাপি খাবার টেবিলে বসিয়া কথাটা তিনি ইঙ্গিতে পাড়িলেন। বলিলেন, মিষ্টার রে. এটা অপনি লক্ষ্য করেচেন কি-না জানিনে, কিন্তু আমি অনেক দেখেচি বাপ-মায়ের এক ছেলে কিংবা এক মেয়ে এমনি একগুঁয়ে হ য় ওঠে যে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না।

সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং দেখা গেল দৃষ্টান্ত তাঁহার হাতের কাছেই মজুত আছে। সানন্দে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এই যেমন আমার বুড়ী। একবার না বললে হাঁ বলায় সাধ্য কার? ওর ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি।

বন্দনা কহিল, তাই বুঝি তোমার অবাধ্য মেয়েকে ভালোবাস না বাবা?

সাহেব সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, তুমি আমার অবাধ্য মেয়ে? কোনদিন না। কেউ বলতে পারে না।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল,—এই মাত্র যে তুমিই বললে বাবা।

আমি? কখনো না।

শুনিয়া মাসী পর্য্যন্ত না হাসিয়া পারিলেন না।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবা, তোমার মতো আমার মা-ও কি আমাকে দেখতে পারতেন না?

সাহেব বলিলেন, তোমার মা? এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কতবার ঝগড়া হয়েচে। ছেলেবেলায় তুমি একবার আমার ঘড়ি ভেঙেছিলে। তোমার মা রাগ করে কান মলে দিলেন, তুমি কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে এলে আমার কাছে। আমি বুকে তুলে নিলাম। সে দিন তোমার মার সঙ্গে আমি সারাদিন কথা কইনি। বলিতে বলিতে তিনি পূর্ব্বস্মৃতির আবেগে উঠিয়া আসিয়া মেয়ের মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিলেন।

বন্দনা বলিল, ছেলেবেলার মতো এখন কেন ভালবাস না বাবা?

সাহেব মাসীকে আবেদন করিলেন—শুনলেন মিসেস্ ঘোষাল, বুড়ির কথা?

বন্দনা কহিল, কেন তবে যখন তখন বলো আমার বিয়ে দিয়ে ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলতে চাও? আমি বুঝি তোমার চোখের বালি?

শুনচেন মিসেস্ ঘোষাল, মেয়েটার কথা?

মাসী বলিলেন, সত্যি বন্দনা। মেয়ে বড় হলে বাপ-মায়ের কি যে বিষম দুশ্চিন্তা নিজের মেয়ে হলে একদিন বুঝবে।

আমি বুঝতে চাইনে মাসীমা।

কিন্তু পিতার কর্তব্য রয়েচে যে মা। বাপ-মা তো চিরজীবী নয়। সন্তানের ভবিষ্যৎ না ভাবলে তাঁদের অপরাধ হয়। কেন যে তোমার বাবা মনের মধ্যে শান্তি পান না সে শুধু যারা নিজেরা বাপ-মা তারাই জানে। তোমার বোন প্রকৃতির যতদিন না আমি বিয়ে দিতে পেরেচি ততদিন খেতে পারিনি, ঘুমোতে পারিনি, কত রাত্রি যে জেগে কেটেচে সে তুমি বুঝবে না, কিন্তু তোমার বাবা বুঝবেন। তোমার মা বেঁচে থাকলে আজ তাঁরও আমার দশাই হ'তো।

রে সাহেব মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, খুব সত্যি মিসেস ঘোষাল।

মাসী তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ ওর মা বেঁচে থাকলে বন্দনার জন্য আপনাকে তিনি অস্থির করে তুলতেন। আমি নিজেই কম করেচি ওঁকে। এখন মনে করলেও লজ্জা হয়।

সাহেব সায় দিয়া বলিলেন, দোষ নেই আপনার। ঠিক এমনিই হয় যে।

মাসী বলিতে লাগিলেন, তাই তো জানি। কেবলি ভাবনা হয় নিজেদের বয়স বাড়চে,—মানুষের বেঁচে থাকার তো স্থিরতা নেই—বেঁচে থাকতে মেয়েটার যদি না কোন উপায় করে যেতে পারি হঠাৎ কিছু একটা ঘটলে কি হবে। ভয়ে উনি ত একরকম শুকিয়ে উঠেছিলেন।

বন্দনা আর সহিতে পারিল না, চাহিয়া দেখিল তাহার বাবার মুখও শুকাইয়া উঠিয়াছে, খাওয়া বন্ধ হইয়াছে, বলিল, তুমি মেসোমশাইকে অকারণে নানা ভয় দেখিয়েচো মাসীমা, আবার আমার বাবাকেও দেখাচ্চো। কি এমন হয়েচে বলো ত? বাবা এখনো অনেকদিন বাঁচবেন। তাঁর মেয়ের জন্য যা ভালো, করে যাবার সময় ঢের পাবেন। তুমি মিথ্যে ভাবনা বাড়িয়ে দিও না বাবার।

মাসী দমিবার পাত্রী নহেন। বিশেষতঃ রে সাহেব তাঁহাকেই সমর্থন করিয়া কহিলেন, তোমার মাসীমা ঠিক কথাই বলেচেন বন্দনা। সত্যিই ত আমার শরীর ভালো নয়, সত্যিই ত এ দেহকে বেশি বিশ্বাস করা চলে না। উনি আত্মীয়; সময় থাকতে উনি যদি সতর্ক না করেন কে করবে বলো ত? এই বলিয়া তিনি উত্তরের

প্রতিই চাহিলেন। মাসী কটাক্ষে চাহিয়া দেখিলেন বন্দনার মুখ ছায়াচ্ছন্ন হইয়াছে, অপ্রতিভ-কণ্ঠে ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, এ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত মিষ্টার রে। আপনার একশ বছর পরমায়ু হোক আমরা সবাই প্রার্থনা করি, আমি শুধু বলতে চেয়েছিলুম—

সাহেব বাধা দিলেন—না, আপনি ঠিক কথাই বলেচেন। সত্যিই স্বাস্থ্য আমার ভালো না। সময়ে সাবধান না হওয়া, কর্ত্তব্যে অবহেলা করা আমার পক্ষে সত্যিই অন্যায়।

বন্দনা গূঢ় ক্রোধ দমন করিয়া বলিল, আজ বাবার খাওয়া হবে না মাসীমা।

মাসী বলিলেন, থাক্ এ-সব আলোচনা মিষ্টার রে। আপনার খাওয়া না হলে আমি ভারি কষ্ট পাবো।

সাহেবের আহারে রুচি চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি জোর করিয়া একটুকরা মাংস কাটিয়া মুখে পুরিলেন। অতঃপর খাওয়ার কার্য্য কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরবেই চলিল।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, জামাইয়ের প্র্যাক্‌টিস্ কি রকম হচ্চে মিসেস ঘোষাল?

মাসী জবাব দিলেন, এই ত আরম্ভ করেচেন। শুনতে পাই মন্দ না।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে তিনি মুখের গ্রাসটা গিলিয়া লইয়া কহিলেন, প্র্যাক্‌টিস্ যাই হোক মিষ্টার রে, আমি এইটেই খুব বড় মনে করিনে। আমি বলি তার চেয়েও ঢের বড় মানুষের চরিত্র। সে নির্ম্মল না হলে কোন মেয়েই কোনদিন যথার্থ সুখী হতে পারে না।

তাতে আর সন্দেহ আছে কি?

মাসী বলিতে লাগিলেন, আমার মুস্কিল হয়েচে আমার বাপের বাড়ীর শিক্ষা-সংস্কার, তাঁদের দৃষ্টান্ত আমার মনে গাঁথা। তার থেকে এক তিল কোথাও কম দেখলে আর সইতে পারিনে। আমার অশোককে দেখলে সেই নৈতিক আবহাওয়ার কথা মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যার মধ্যে আমি মানুষ। আমার বাবা, আমার দাদা—এই অশোকও হয়েচে ঠিক তাঁদের মতো। তেমনি সরল, তেমনি উদার, তেমনি চরিত্রবান।

রে-সাহেব সম্পূর্ণ মানিয়া লইলেন, বলিলেন, আমারও ঠিক তাই মনে হয়েচে মিসেস ঘোষাল। ছেলেটি অতি সৎ। ছ'সাত দিন এখানে ছিল, তার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে সাক্ষ্য মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিস্ বুড়ি, অশোককে আমাদের কি ভালই লেগেছিল! যেদিন চলে গেল আমার ত সমস্ত দিন মন খারাপ হয়ে রইলো।

বন্দনা স্বীকার করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, চমৎকার মানুষ। যেমন বিনয়ী তেমনি ভদ্র। আমার ত কোন অনুরোধে কখনো না বলেননি। আমাকে বোম্বায়ে তিনি না পৌঁছে দিলে আমার বিপদ হ'তো।

মাসী বলিলেন, আর একটা জিনিস বোধ হয় লক্ষ্য করেচো বন্দনা, ওর স্ববুদ্ধি নেই। সেটি আজকালকার দিনে দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয় যে আমাদের মধ্যে অনেকেরই দেখতে পাওয়া যায়।

বন্দনা সহাস্যে কহিল, তোমার বাড়ীতে কোন স্ববের দেখা তো কোনদিন পাইনি মাসীমা।

মাসী হাসিয়া বলিলেন, পেয়েচো বই কি মা। তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তোমাকে ঠকাবে তারা কি কোরে?

শুনিয়া রে-সাহেবও হাসিলেন, কথাটি তাহার বড় ভালো লাগলো। বলিলেন, এত বুদ্ধি সচরাচর মেলে না মিসেস ঘোষাল। বাপের মুখে একথা গর্ব্বের মতো শুনতে, কিন্তু না বলেও পারিনে।

বন্দনা বলিল, এ প্রসঙ্গ তুমি বন্ধ করো মাসীমা, নইলে বাবাকে সামলানো যাবে না। তুমি এক-মেয়ের দোষগুলোই দেখচো কিন্তু দেখোনি যে এক-মেয়ের বাপদের মতো দাম্ভিক লোকও পৃথিবীতে কম। আমার বাবার ধারণা ওঁর মেয়ের মতো মেয়ে সংসারে আর দ্বিতীয় নেই।

মাসী বলিলেন, সে ধারণার আমিও বড় অংশীদার বন্দনা। শাস্তি পেতে হলে আমারও পাওয়া উচিত।

পিতার মুখে অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি, কহিলেন, আমি দাম্ভিক কি না জানিনে কিন্তু জানি কন্যা-রত্নে আমি সত্যিই সৌভাগ্যবান। এমন মেয়ে কম বাপেই পায়।

বন্দনা বলিল, বাবা, কই আজ তো তুমি একটিও সন্দেশ খেলে না? ভালো হয়নি বুঝি?

সাহেব প্লেট হইতে আধখানা সন্দেশ ভাঙিয়া লইয়া মুখে দিলেন, বলিলেন, সমস্ত বুড়ীর নিজের হাতের তৈরী। এবার কলকাতা থেকে ফিরে পর্য্যন্ত ও সমস্ত খাওয়া দাওয়া বদলে দিয়েচে। ডাল্‌না, সুক্ত, মাছের ঝোল, দই সন্দেশ আরও কত কি। কার কাছে শুনে এসেচে জানিনে, কিন্তু বাড়ীতে মাংস প্রায় আনতে দেয় না। বলে বাবার ওতে অসুখ করে। দেখুন মিসেস ঘোষাল, এই সব বাঙলা খাওয়া খেয়ে মনে হয় যেন বুড়ো বয়সে আছি ভালো। বেশ যেন একটু ক্ষিদে বোধ করি।

বন্দনা বলিল, মাসীমার অভ্যেস নেই, হয়ত কত কষ্ট হয়।

মাসী এই গূঢ় বিদ্রূপ লক্ষ্য করিলেন না, কহিলেন, না—না, কষ্ট হবে কেন, এ আমার ভালোই লাগে। শুধু আবহাওয়ার চেঞ্জই ত নয়, খাবার চেঞ্জও বড় দরকার। তাই বোধ করি শরীর আমার এত শীঘ্র ভালো হয়ে গেল।

ভালো হয়েচে, না মাসীমা ?

নিশ্চয় হয়েচে। কোন সন্দেহ নেই।

তা হলে আর কিছুদিন থাকো। আরও ভালো হোক।

কিন্তু বেশিদিন থাকবার যে জো নেই বন্দনা। অশোক লিখেচে এ মাসের শেষেই সে পাঞ্জাবে চেঞ্জের জন্যে আসবে। তার আগে আমার তো ফিরে যাওয়া চাই।

ভোজন-পর্ব্ব সমাধা হইয়াছিল, সাহেব উঠি উঠি করিতেছিলেন,—মাসী মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের স্বপক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া আনিয়াছেন, তাহা চক্ষু-লজ্জায় ভ্রষ্ট হইতে দিলে ফিরিয়া আনা হয়ত দুরূহ হইবে। সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া বলিলেন, মিষ্টার রে, একটা কথা ছিল, যদি সময় না—

সাহেব তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, না না, সময় আছে বই কি। বলুন কি কথা।

মাসী বলিলেন, আমি শুনেচি বন্দনার অমত নেই। অশোক অর্থশালী নয় সত্য, কিন্তু সুশিক্ষা ও চরিত্রবলে struggle করে একদিন ও উঠবেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি যদি ওকে আপনার মেয়ের অযোগ্য বিবেচনা না করেন—

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, কিন্তু সে কি করে হতে পারে মিসেস ঘোষাল ? অশোক আপনার ভাই-পো, সম্পর্কে সেও তো বন্দনার মামাতো ভাই।

মাসী বলিলেন, শুধু নামে, নইলে বহু দূরের সম্বন্ধ। আমার দিদিমা এবং বন্দনার মায়ের দিদিমা দুজনে বোন ছিলেন, সেই সম্পর্কেই বন্দনার আমি মাসী। এ বিবাহ নিষিদ্ধ হতে পারে না মিষ্টার রে।

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ হয় মনে মনে কি একটা হিসাব করিলেন, তারপর বলিলেন, অশোককে যতটুকু আমি নিজে দেখেচি এবং যতটুকু বন্দনার মুখে শুনেচি তাতে অযোগ্য মনে করিনে। মেয়ের বিয়ে একদিন আমাকে দিতেই হবে, কিন্তু তার নিজের অভিমত জানা দরকার।

মাসী স্নেহের কণ্ঠে উৎসাহ দিয়া কহিলেন, লজ্জা কোরো না মা, বল তোমার বাবাকে কি তোমার ইচ্ছে।

বন্দনার মুখ পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণে সুস্পষ্ট স্বরে বলিল, আমার ইচ্ছেকে আমি বিসর্জ্জন দিয়েচি মাসীমা। সে খোঁজ করার দরকার নেই।

সাহেব সভয়ে কহিলেন, এর মানে?

বন্দনা বলিল, মানে ঠিক তোমাদের আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না বাবা। কিন্তু তাই বলে ভেবো না যেন আমি বাধা দিচ্চি। একটু থামিয়া কহিল, আমার সতীদিদির বিয়ে হয়েছিল তাঁর ন'বছর বয়সে। বাপ-মা যাঁর হাতে তাঁকে সমর্পণ করলেন মেজদিদি তাঁকেই নিলেন, নিজের বুদ্ধিতে বেছে নেননি। তবু ভাগ্যে যাঁকে পেলে সে-স্বামী জগতে দুর্লভ। আমি সেই ভাগ্যকেই বিশ্বাস করবো বাবা। বিপ্রদাসবাবু সাধুপুরুষ, আসবার আগে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন যেখানে আমার কল্যাণ ভগবান সেখানেই আমাকে দেবেন। তাঁর সেই কথা কখনো মিথ্যে হবে না। তুমি আমাকে যা আদেশ করবে আমি তাই পালন করবো। মনের মধ্যে কোন সংশয়, কোন ভয় রাখ্‌বো না।

সাহেব বিস্ময়ে স্থির হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

মাসী বলিলেন, বিয়ের সময় তোমার মেজদি ছিলেন বালিকা, তাই তার মতামতের প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু তুমি তা নও, বড় হয়েচো, নিজের ভাল-মন্দের দায়িত্ব তোমার নিজের, এমন চোখ বুজে ভাগ্যের খেলা দেখা ত তোমার সাজে না বন্দনা!

সাজে কি না জানিনে মাসীমা, কিন্তু তাঁর মতো তেমনি করেই ভাগ্যকে আমি প্রসন্নমনে মেনে নেবো।

কিন্তু এমন উদাসীনের মতো কথা বললে তোমার বাবা মনঃস্থির করবেন কি করে?

যেমন করে ওঁর দাদা করেছিলেন সতীদিদির সম্বন্ধে, যেমন করে ওঁর সকল পূর্ব্ব-পুরুষরাই দিয়েচেন তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ, আমার সম্বন্ধে বাবা তেমনি করেই মনঃস্থির করুন।

তুমি নিজে কিছুই দেখবে না, কিছুই ভাববে না?

ভাবা-ভাবি, দেখা দেখি অনেক দেখলুম মাসীমা। আর না। এখন নির্ভর করবো বাবার আশীর্ব্বাদের আর সেই ভাগ্যের 'পরে যার শেষ কেউ আজও দেখতে পায়নি।

মাসী হতাশ হইয়া একটুখানি তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, ভাগ্যকে আমরাও মানি, কিন্তু তোমার সমাজ, শিক্ষা, সংস্কার সব ডুবিয়ে দিয়ে মুখুয্যেদের এই ক'দিনের

সংস্রব যে তোমাকে এতখানি আচ্ছন্ন করবে তা ভাবিনি। তোমার কথা শুনলে মনে হয় না যে তুমি আমাদের সেই বন্দনা। যেন একেবারে আমাদের থেকে পর হয়ে গেছো।

বন্দনা বলিল, না মাসীমা, আমি পর হয়ে যাইনি। তাঁদের আপনার করতে আমার কাউকে পর করতে হবে না এ-কথা নিশ্চয় জেনে এসেচি। আমাকে নিয়ে তোমরা কোন শঙ্কা কোরো না।

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে অশোককে আসতে একটা টেলিগ্রাম করে দিই?

দাও। আমার কোন আপত্তি নেই। এই বলিয়া বন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিষ্টার রে, আপনার নাম করেই তবে টেলিগ্রামটা পাঠাই—বলিয়া মাসী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন সাহেবের দুই চোখ অকস্মাৎ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না এবং সাহেব ধীরে ধীরে যখন বলিলেন, টেলিগ্রাম আজ থাক্ মিসেস ঘোষাল, তখনও হেতু বুঝতে না পারিয়া বলিলেন, থাকবে কেন মিষ্টার রে, বন্দনা ত সম্মতি দিয়ে গেল।

না না, আজ থাক্, বলিয়া তিনি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। এই নীরবতা এবং ঐ অশ্রুজল মাসীকে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করিল। একজন প্রবীণ পদস্থ লোকের এইরূপ সেন্টিমেন্টালিটি তাঁহার অসহ্য। কিন্তু জিদ করিতেও সাহস করিলেন না। মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া সাহেব বলিলেন, ওর বাপের ভাবনা আমি ভেবেচি, কিন্তু ওর মা নেই, তাঁর ভাবনাও আমাকেই ভাবতে হবে মিসেস ঘোষাল। একটু সময় চাই।

মাসী মনে মনে বলিলেন, আর একটা স্টুপিড সেন্টিমেন্টালিটি। সাহেব অনুমান করিলেন কি-না জানি না, কিন্তু এবার জোর করিয়া একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মুস্কিল হয়েচে ওর কথা আমরা কেউ ভালো বুঝতে পারিনে। শুধু আজ নয়, বাঙলা থেকে আসা পর্য্যন্তই মনে হয় ঠিক যেন ওকে বুঝতে পারিনে। ও সম্মতি দিলে বটে কিন্তু সে—ও, না ওর নতুন রিলিজন ভেবেই পেলুম না।

নতুন রিলিজন মানে?

মানে আমিও জানিনে। কিন্তু বেশ দেখতে পাই বাঙলা থেকে ও কি-যেন একটা সঙ্গে করে এনেচে, সে রাত্রি-দিন থাকে ওকে ঘিরে। ওর খাওয়া গেছে বদলে, কথা গেছে বদলে, ওর চলা-ফেরা পর্য্যন্ত মনে হয় যেন আগেকার মতো নেই।

ভোরবেলায় স্নান করে আমার ঘরে গিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় নেয়। বলি, বুড়ী, আগে তো তুই এ-সব করতিস্‌নে?

তখন জানতুম না বাবা। এখন তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে দিন আরম্ভ করি। বেশ বুঝতে পারি সে আমাকে সমস্ত দিন সমস্ত কাজে রক্ষে করে চলে। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু পুনরায় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

মাসী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এ-সব নতুন ধাঁচা শিখে এসেচে ও মুখুয্যেদের বাড়ীতে। জানেন ত তাঁরা কি-রকম গোঁড়া? কিন্তু এ-কে রিলিজন বলে না, বলে কুসংস্কার। ও পূজো-টুজো করে নাকি?

সাহেব বলিলেন, জানিনে করে কি না। হয়ত করে না। কুসংস্কার বলে আমারও মনে হয়েচে, নিষেধ করতেও গেছি, কিন্তু বুড়ী আগেকার মতো আর তো তর্ক করে না, শুধু চুপ করে চেয়ে থাকে। আমারও মুখ যায় বন্ধ হয়ে—কিছুই বলতে পারিনে।

মাসী বলিলেন, এ আপনার দুর্ব্বলতা! কিন্তু নিশ্চিত জানবেন একে রিলিজন বলে না, বলে শুধু সুপারস্টিশন! একে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়! অপরাধ!

সাহেব বিধাভরে আস্তে আস্তে বলিলেন, তাই হবে বোধ হয়। রিলিজন কথাটা মুখেই বলি, কখনো নিজেও চর্চ্চা করিনি, এর নেচার কি তা-ও জানিনে, শুধু মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি মেয়েটাকে এমন আগাগোড়া বদলে দিলে কিসে? সে হাসি নেই, আনন্দের চঞ্চলতা নেই, বর্ষা দিনের ফুটন্ত ফুলের মতো পাপড়িগুলি যেন জলে ভিজে। কখনো ডেকে বলি, বুড়ী, আমাকে লুকোসনে মা, তোর ভেতরে কোন অসুখ করেনি ত? অমনি হেসে মাথা দুলিয়ে বলে, না বাবা, আমি ভালো আছি, আমার কোন অসুখ নেই। হাসিমুখে ঘরের কাজে চলে যায়, আমার কিন্তু বুকের পাঁজর ভেঙে পড়তে চায় মিসেস ঘোষাল! ঐ একটি মেয়ে, মা নেই, নিজের হাতে মানুষ করে এত বড়টি করেচি,—সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি আমার সেই বন্দনাকে আবার তেমনি ফিরে পাই—

মাসী জোর দিয়া বলিলেন, পাবেন। আমি কথা দিচ্চি পাবেন। এ শুধু একটা সাময়িক অবসাদ, ধর্ম্মের ঝোঁক হলেও হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অসাড়। কেবল ওঁদের সংসর্গে আসার ক্ষণিক বিকার। বিবাহ দিন, সমস্ত দু'দিনেই সেরে যাবে। চিরদিনের শিক্ষাই মানুষের থাকে মিস্টার রে, দু'দিনের বাতিক দু'দিনেই ফুরোয়।

সাহেব আশ্বস্ত হইলেন, তথাপি সন্দেহ ঘুচিল না। বলিলেন, ও কোথায় কার

কাছে কি প্রেরণা পেলে জানিনে, কিন্তু শুনেটি সে যদি আসে সত্যিকার মানুষ থেকে কিছুতে সে ঘোচে না। মানুষের চিরদিনের অভ্যাস দেয় একমুহূর্তে বদলে। নেশা গিয়ে মেশে রক্তের ধারায়, সমস্ত জীবনে তার আর ঘোর কাটে না! সেই আমার ভয় মিসেস ঘোষাল।

প্রত্যুত্তরে মাসী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন, বলিলেন, বাজে বাজে। আমি অনেক দেখেচি মিষ্টার রে—দুদিন পরে আর কিছু থাকে না। আবার যা'কে তাই হয়। কিন্তু বাড়তে দেওয়াও চলবে না,—আজই অশোককে একটা তার করে দিই সে এসে পড়ুক।

আজই দেবেন?

হাঁ, আজই। এবং আপনার নামেই।

সাহেব মৃদুকণ্ঠে সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, যা ভালো হয় করুন। আমি জানি অশোক ভালো ছেলে। চরিত্রবান, সৎ—তা নইলে ওকে নিয়ে বন্দনা কিছুতে আসতে রাজি হ'তো না।

মাসী এই কথাটাকেই আর একবার ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া বলিতে গেলেন, কিন্তু বাধা পড়িল। বন্দনা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবা, আজ হাজি সাহেবের মেয়েরা আমায় চায়ের নেমন্তন্ন করেচে। দুপুরবেলা যাবো, বিকালে অফিসের ফেরত আমাকে বাড়ী নিয়ে এসো।

মাসী প্রশ্ন করিলেন, তাঁদের বাড়াতে তুমি ত কিছু খাবে না বন্দনা?

না মাসীমা।

কেন?

আমার ইচ্ছে করে না। বাবা, তুমি ভুলে যাবে না তো?

না মা, তোমাকে আনতে ভুলে যাবো এমন কখন হয়? এই বলিয়া সাহেব একটু হাসিলেন। বলিলেন, অশোক আসচেন। তাঁকে আজ একটা তার করে দেবো।

বেশ ত বাবা, দাও না।

মাসী বলিলেন, আমিই জোর করে তাকে আনচি। দেখো, এলে যেন না অসম্মান হয়!

তোমার ভয় নেই মাসীমা, আমরা কারো অসম্মান করিনে। অশোকবাবু নিজেই জানেন।

মেয়ের কথা শুনিয়া সাহেব প্রসন্নমুখে বলিলেন, অফিসের পথে আজই তাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবো বুড়ী। আজ শুক্রবার, সোমবারেই সে এসে পৌঁছতে পারবে যদি না কোন ব্যাঘাত ঘটে।

দরওয়ান ডাক লইয়া হাজির হইল। অসংখ্য সংবাদ-পত্র নানা স্থানের চিঠি-পত্রও কম নয়। কিছুদিন হইতে ডাকের প্রতি বন্দনার ঔৎসুক্য ছিল না। সে জানিত প্রতিদিন আশা করিয়া অপেক্ষা করা বৃথা। তাহাকে মনে করিয়া চিঠি লিখিবার কেহ নাই। চলিয়া যাইতেছিল, সাহেব ডাকিয়া বলিলেন, এই যে তোমার নামের দু'খানা। আপনারও একখানা রয়েচে মিসেস ঘোষাল।

নিজের চেয়েও পরের চিঠিতে মাসীর কৌতূহল বেশি। মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিলেন, একখানা ত দেখচি অশোকের হাতের লেখা। ওটা কার?

এই অকারণ প্রশ্নের উত্তর বন্দনা দিল না, চিঠি দুখানা হাতে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সাহেব মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, অশোকের সঙ্গে দেখেচি চিঠি-পত্র চলে। তার করে দিই সে আসুক। ছেলেটি সত্যিই ভালো। তাকে বিশ্বাস না করলে বন্দনা কখনও চিঠি লিখত না।

প্রত্যুত্তরে মাসীও সগর্বে একটু হাসিলেন। অর্থাৎ জানি আমি অনেক কিছুই।

বিকালে আফিসের পথে হাজি-সাহেবের বাড়ী ঘুরিয়া রে সাহেব একাকী ফিরিয়া আসিলেন। বন্দনা সেখানে যায় নাই। মাসী সুমুখেই ছিলেন, মুখ ভার করিয়া বলিলেন, বন্দনা চিঠি নিয়ে সেই যে নিজের ঘরে ঢুকেচে আর বার হয়নি।

সাহেব উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করিলেন, খায় নি?

না। সকালে সেই যে দুটো ফল খেয়েছিল আর কিছু না।

সাহেব দ্রুতপদে কন্যার ঘরের দরজায় গিয়া ঘা দিলেন, বুড়ী!

বন্দনা কবাট খুলিয়া দিল। তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া পিতা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—কি হয়েচে রে?

বন্দনা কহিল, বাবা, আজ রাত্রের গাড়ীতে আমি বলরামপুর যাবো।

বলরামপুর? কেন?

দ্বিজুবাবু একখানা চিঠি লিখেচেন,—পড়বে বাবা?

তুই পড় মা, আমি শুনি, বলিয়া সাহেব চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। বন্দনা তাহাকে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া যে চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইল তাহা এই—

সুচরিতাসু,

আপনার যাবার দিনটি মনে পড়ে। উঠানে গাড়ী, দাঁড়িয়ে বললেন, মাকে

াকে খবর দিতে। বললুম, কুঁড়ে মানুষ আমি, চিঠি-পত্র লেখা সহজে াসেও না, ভালো লিখতেও জানিনে। এ ভার বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ে ান।

শুনে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন, তারপরে গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলেন, দ্বিতীয় নুরোধ করলেন না। হয়ত ভাবলেন অসৌজন্য যাকে এমন সময়েও একটা ভালো থা মুখে আনতে দেয় না তাকে আর বলবার কি আছে?

আমি এমনিই বটে। তবু আশা ছিল লিখতেই যদি হয় যেন এমন কিছু লখতে পারি যা খবরের চেয়ে বড়। সে লেখা যেন অনায়াসে আমার সকল অপরাধের মার্জ্জনা চেয়ে নিতে পারে।

মনে ভাবতুম মানুষের জন্যে কি শুধু অভাবিত দুঃখই আছে, অভাবিত সুখ কি জগতে নেই?

দাদার ইষ্ট-দেবতাও চোখ বুজেই থাকবেন, চেয়ে কখনো দেখবেন না? বেটন যা ঘটল সেই হবে চিরস্থায়ী, তাকে টলাবার শক্তি কোথাও নেই?

দেখা গেল নেই,—সে শক্তি কোথাও নেই। না টললেন ভগবান, না টললে তার ভক্ত। নির্বাক নিষ্কম্প দীপ-শিখা আজও তেমনি উর্দ্ধমুখে জলছে, জ্যোতির কণামাত্র অপচয়ও ঘটেনি।

এ প্রসঙ্গ কেন তাই বলি। তিন দিন হ'লো দাদা বাড়ী ফিরে এসেচেন। সকালে যখন গাড়ী থেকে নামলেন তাঁর পিছনে নামলে বাসু। খালি পা গলায় উত্তরীয়। গাড়ী ফিরে চলে গেলো আর কেউ নামলো না। সকালের রোদে ছাদে দাঁড়িয়েছিলুম, চোখের সুমুখে সমস্ত পৃথিবী হয়ে এলো অন্ধকার—ঠিক অমাবস্যা রাত্রির মতো। বোধ করি মিনিট-দুই হবে, তার পরে আবার সব দেখতে পেলুম, আবার সব স্পষ্ট হয়ে এলো। এমন যে হয় এর আগে আমি জানতুম না।

নীচে নেমে এলুম, দাদা বললেন, তোর বৌদি কাল সকালে মারা গেছেন দিজু। হাতে টাকাকড়ি বিশেষ নেই, সামান্যভাবে তাঁর শ্রাদ্ধের আয়োজন করে দে।

মা কোথায়?

ঢাকায়। তাঁর মেয়ের বাড়ীতে।

ঢাকায়? একটু চুপ করে থেকে বললেন, কি জানি, আসতে হয়ত পারবেন না, কিন্তু মাতৃদায় জানিয়ে বাসু তাঁকে চিঠি দেয় যেন।

বললুম, দেবে বই কি।

বাসু ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে বুকে মুখ লুকালো। তার পরে কেঁদে উঠলো। সে-কান্নারও যেমন ভাষা নেই, চিঠিতে সে প্রকাশ করারও তেমনি ভাষা নেই। শিকারের জন্তু মরার আগে তার শেষ নালিশ রেখে যায় যে ভাষায় অনেকটা তেমনি। তাকে কোলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম নিজের ঘরে। সে তেমনি করেই কাঁদতে লাগলো বুকে মুখ রেখে। মনে মনে বললুম, ওরে বাসু, লোকসানের দিক দিয়ে তুই যে বেশি হারালি তা নয়, আর একজনের ক্ষতির মাত্রা তোকেও ছাপিয়ে গেল। তবু তোকে বোঝাবার লোক পাবি, কিন্তু সে পাবে না। শুধু একটা আশা বন্দনা যদি বোঝেন।

এমন কতক্ষণ গেল। শেষে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললুম, ভয় নেই রে, মা না থাক্ বাপ না থাক্, কিন্তু রইলুম আমি। ঋণ তাঁদের শোধ দিতে পারবো না, কিন্তু অস্বীকার করবো না কখনো। আজ সবচেয়ে ব্যথা সবচেয়ে ক্ষতির দিনে রইলো তোর কাকার শপথ।

কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়াবো না, কথার আছেই বা কি! ছেলেবেলায় বাবা বলতেন গোঁয়ার, মা বলতেন চুয়াড়ে, কতবার রাগ করেচেন দাদা—অনাদরে অবহেলায় কতদিন এ-বাড়ী হয়ে উঠেচে বিষ, তখন বৌদিদি এসেচেন কাছে, বলেচেন ঠাকুরপো, কি চাই বলো ত ভাই? রাগ করে জবাব দিয়েচি, কিছু চাইনে বৌদি, আমি চলে যাবো এখান থেকে।

কবে গো?

আজই।

শুধু হেসে বলেচেন, হুকুম নেই যাবার। যাও তো দেখি আমার অবাধ্য হয়ে।

আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু সেই যাবার দিন যখন সত্যি এলো তখন তিনি গেলেন চলে। ভাবি, কেবল আমার জন্যেই হুকুম? তাঁকে হুকুম করবার কি কেউ ছিল না জগতে?

দাদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি করে ঘটলো? বললেন, কলকাতাতেই শরীর খারাপ হ'লো—বোধ হয় মনে মনে খুবই ভাবতো—নিয়ে গেলাম পশ্চিমে। কিন্তু সুবিধে কোথাও হ'লো না। শেষে হরিদ্বারে পড়লেন জ্বরে, নিয়ে চলে এলাম কাশীতে। সেইখানেই মারা গেলেন। ব্যাস্!

জিজ্ঞাসা করলুম, চিকিৎসা হয়েছিল দাদা?

বললেন, যথাসম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু এই যথাটুকু যে কতটুকু সে দাদা নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না।

ইচ্ছে হ'লো বলি, আমাকে এত বড় শাস্তি দিলেন কেন? কি করেছিলুম আমি? কিন্তু তাঁর মুখের পানে চেয়ে এ প্রশ্ন আমার মুখে এলো না।

জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কাউকে কিছু বলে যাননি দাদা?

বললেন, হাঁ। মৃত্যুর ঘণ্টা-দশেক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চেতনা ছিল, জিজ্ঞেস করলুম, সতী, মাকে কিছু বলবে?

বললে, না।

আমাকে?

না।

দ্বিজুকে?

হাঁ। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। বোলো সবই রইলো।

ছুটে পালিয়ে এলুম বৌদিদির শূন্য ঘরে। ছবি তোলাতে তার ভারি লজ্জা ছিল, শুধু ছিল একখানি লুকানো তার আলমারির আড়ালে। আমারি তোলা ছবি। সুমুখে দাঁড়িয়ে বললুম, ধন্য হয়ে গেছি বৌদি, বুঝেচি তোমার হুকুম। এত শীঘ্র চলে যাবে ভাবিনি, কিন্তু কোথাও যদি থাক দেখতে পাবে তোমার আদেশ অবহেলা করিনি। শুধু এই শক্তি দিও, তোমার শোকে কারো কাছে আমার চোখের জল যেন না পড়ে। কিন্তু আজ এই পর্য্যন্ত তার কথা।

এবার আমি। যাবার সময় অনুরোধ করেছিলেন বিবাহ করতে। কারণ, এত ভার একলা বইতে পারব না—সঙ্গীর দরকার। সেই সঙ্গী হবে মৈত্রেয়ী এই ছিল আপনার মনে। আপত্তি করিনি, ভেবেছিলুম সংসারে পনেরো আনা আনন্দই যদি ঘুচলো এক আনার জন্যে আর টানাটানি করবো না। কিন্তু সে-ও আর হয় না—বৌদিদির মৃত্যু এনে দিলে অলঙ্ঘ্য বাধা। কিসের বাধা? মৈত্রেয়ী ভার নিতে পারে, পারে না সে বোঝা বইতে। এটা জানতে পেরেচি। কিন্তু আমার এবার সেই বোঝাই হ'লো ভারি। তবু বলব বিপদের দিনে সে আমাদের অনেক করেচে, তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সময় যদি আসে তার ঋণ ভুলবো না।

কাল অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে বাসু উঠলো কেঁদে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে গেলুম দাদার ঘরে। দেখি তখনো জেগে বসে বই পড়ছেন।—কি বই দাদা? দাদা বই মুড়ে রেখে হেসে বললেন, কি করতে এসেচিস বল্? তাঁর পানে চেয়ে যা বলতে

এসেছিলুম বলা হ'লো না। ভাবলুম, ঘুমের ঘোরে বাসু কেঁদেচে তাতে বিপ্রদাসের কি? অন্য কথা মনে এলো, বললুম, শ্রাদ্ধের পর কোথায় থাকবেন দাদা? কলকাতায়?

বললেন, না রে, যাব তীর্থভ্রমণে।

ফিরবেন কবে?

দাদা আবার একটু হেসে বললেন, ফিরবো না।

স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দেহ রইলো না যে এ সঙ্কল্প টলবে না। দাদা সংসার ত্যাগ করবেন।

কিন্তু অনুনয়-বিনয় কাঁদা-কাটা কার কাছে? এই নিষ্ঠুর সন্ন্যাসীর কাছে? তার চেয়ে অপমান আছে?

কিন্তু বাসু?

দাদা বললেন, হিমালয়ের কাছে একটা আশ্রমের খোঁজ পেয়েছি। তারা ছোট ছেলেদের ভার নেয়। শিক্ষা দেয় তারাই।

তাদের হাতে তুলে দেবেন ওকে? আর আমি করলুম মানুষ? তার পর দুই হাতে কান চেপে পালিয়ে এলুম ঘর থেকে। তিনি কি জবাব দিলেন শুনিনি।

বাসুর পাশে বসে সমস্ত রাত ভেবেচি। কোথায় যে এর কূল কিছুতে খুঁজে পাইনি। মনে পড়ল আপনাকে। বলে গিয়েছিলেন, বন্ধুর যখন হবে সত্যিকারের প্রয়োজন তখন ভগবান আপনি পৌঁচে দেবেন তাকে দোর-গোড়ায়। বলেছিলেন এ-কথা বিশ্বাস করতে। কে বন্ধু, কবে সে আসবে জানিনে, তবু বিশ্বাস করে আছি আমার এই একান্ত প্রয়োজনে একদিন আসবেই।

দ্বিজদাস

পড়া শেষ হইলে দেখা গেল সাহেবের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। রুমাল বাহির করিয়া মুছিয়া বলিলেন, আজই যাও মা, আমি বাধা দেব না। দরওয়ান আর তোমার বুড়ো হিমুও সঙ্গে যাক।

বন্দনা হেঁট হইয়া তাঁর পায়ের ধুলা লইল, বলিল, যাবার উদ্যোগ করিগে বাবা, আমি উঠি।

২৬

ম্যানেজার বিরাজ দত্ত মোটর লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বন্দনাকে সসম্মানে ট্রেন হইতে নামাইয়া গাড়ীতে আনিয়া বসাইলেন।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মা আজও বাড়ী এসে পৌছননি দত্তমশাই ?

না দিদি।

মৈত্রেয়ী ?

না, তাঁকে ত কেউ আনতে যায়নি।

বাসু ভাল আছে ?

আছে।

মুখুয্যেমশাই ? দ্বিজুবাবু ?

বড়বাবু ভাল আছেন, কিন্তু ছোটবাবুকে দেখলে তেমন ভালো বোধ হয় না।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, জ্বর-টর হয়নি ত ?

দত্ত বলিলেন, ঠিক জানিনে দিদি। কিন্তু সমস্ত কাজকর্ম্ম করেই ত বেড়াচ্ছেন।

বন্দনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, দত্তমশাই, আমার মনে হয় মা হয়ত এ দুঃখের মধ্যে আসবেন না। কিন্তু দুঃখ যতই হোক শ্রাদ্ধের আয়োজন ত করতে হবে। কিন্তু হচ্চে কি ?

হচ্চে বই কি দিদি। কর্ত্তাবাবুর শ্রাদ্ধে যেমন হয়েছিল প্রায় তেমনি ব্যবস্থাই হচ্চে।

কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বন্দনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কার মত বলচেন, মুখুয্যেমশায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের মত ? তেমনই বড় আয়োজন ?

দত্ত বলিলেন, হাঁ, প্রায় তেমনই। গেলেই দেখতে পাবেন। বাবু ডেকে বললেন, দ্বিজু, পাগলামি করিস্‌নে, সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে। ছোটবাবু বললেন, মাত্রা আছে জানি, কিন্তু মাত্রাবোধ সকলের এক নয় দাদা। বড়বাবু হেসে বললেন, কিন্তু তুই যে সকলের মাত্রাই ডিঙিয়ে যাচ্চিস্ দ্বিজু। ছোটবাবু বললেন, তা হলে আপনাদের কাছে মিনতি এই একটিবারের জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি মাত্রা লঙ্ঘন করতে পারবো, কিন্তু বৌদিদির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে পারবো না।

এর পরে আর কেহ কথা কয় নি, এখন আপনি যদি কিছু করতে পারেন। খরচ বিশ-পঁচিশ হাজারের কম যাবে না।

খরচ কি সব ছোটবাবুর?

হাঁ, তাই তো।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তাঁর পক্ষে খুব বেশী মনে হয় দত্তমশাই?

বিরাজ দত্ত বলিলেন, খুব বেশী না হলেও সম্প্রতি গেলও যে অনেক দিদি। এখন সামলে চলার প্রয়োজন। এর উপর নতুন বিপদ আসতেই বা কতক্ষণ?

আবার নতুন বিপদ কিসের?

দত্ত ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনি কি শোনেননি জামাইবাবুর সঙ্গে মামলা বেঁধেচে? এ-সব বস্তুর পরিণাম ত জানেন, ফলাফল কেহ বলতে পারে না।

তবে নিষেধ করেননি কেন?

নিষেধ? এ তো বড়বাবু নয় দিদি, যে নিষেধ মানবেন। একে নিষেধ করতে শুধু একজনই ছিলেন তিনি এখন স্বর্গে। বলিয়া বিরাজ দত্ত নিশ্বাস ফেলিলেন।

বন্দনা আর কোন প্রশ্ন করিল না। বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল সুমুখের মাঠের একদিকে কাঠ কাটিয়া স্তূপাকার করা হইয়াছে। যে-সকল চালা-ঘর দয়াময়ীর ব্রতোপলক্ষে সেদিন তৈরী হইয়াছিল, সেগুলো মেরামত হইতেছে, বাহির প্রাঙ্গণে বিরাট মণ্ডপ নির্মিত হইতেছে, তথায় বহু লোক বিবিধ কাজে নিযুক্ত। বিরাজ দত্ত অত্যুক্তি করে নাই বন্দনা তাহা বুঝিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া সে সোজা উপরে গিয়া উঠিল। প্রথমেই গেল দ্বিজদাসের ঘরে। একটা মোটা বালিশে হেলান দিয়া সে বিছানায় শুইয়াছিল, পর্দা সরানোর শব্দে চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, বন্দু আপনি এলো আমার ঘরের দোরগোড়ায়।

বন্দনা বলিল, হাঁ এলোই ত। কিন্তু এমন সময়ে শুয়ে কেন?

দ্বিজদাস বলিল, চোখ বুজে তোমাকেই ধ্যান করছিলুম আর মনে মনে বলছিলুম, বন্দনা, দুঃখের সীমা নেই আমার। দেহে নেই বল, মনে নেই ভরসা, বোধ করি আর ঠেলতে পারব না, নৌকা মাঝখানেই ডুববে। ও-পারে পৌঁছনো আর ঘটবে না।

বন্দনা বলিল, ঘটতেই হবে। তোমাকে ছুটি দিয়ে এইবার নৌকা বাইবার ভার নেবো আমি।

তাই নাও। রাগ করে চলে যেও না।

বন্দনা কাছে আসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দুজনের চোখ দিয়াই জল পড়িতে লাগিল। এমনভাবে প্রণাম করা তাহার এই প্রথম। বলিল, তোমার চোখেও জল আসে এ আমি জানতুম না।

দ্বিজদাস বলিল, আমিও না। বোধ করি তার আসার পথটা এতকাল বন্ধ ছিল। প্রথম খুললো যেদিন মৈত্রেয়ীকে ডেকে এনে সংসারের ভার দিতে বলে তুমি চলে গেলে। আড়ালে চোখ মুছে ফেলে মনে মনে বললুম, এত বড় আঘাত যে স্বচ্ছন্দে করতে পারে তার কাছে কখনো ভিক্ষে চাইবো না। কিন্তু সে পণ আমার রইলো না। বৌদিদি গেলেন স্বর্গে, শশধরের সঙ্গে মামলা বাধতে মা চলে গেলেন মেয়ের বাড়ীতে, দাদা জানালেন সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প, এক মিনিটের ভূমিকম্পে যেন সমস্ত হয়ে গেল ধূলিসাৎ। এ ও সয়েছিল, কিন্তু শুনলুম যখন বাড়ী ছেড়ে বাসু যাবে কোন-একটা অজানা আশ্রয়ে, সে আর সইলো না। একবার ভাবলুম যা কিছু আছে কল্যাণীর ছেলেদের দিয়ে আমিও যাবো আর এক দিকে, তখন হঠাৎ মনে পড়লো তোমার যাবার আগের শেষ কথাটা—বলেছিলে বিশ্বাস করতে, বলেছিলে আমার একান্ত প্রয়োজনে বন্ধু আপনি আসবে আমার দোর-গোড়ায়। ভাবলুম, এই ত আমার শেষ প্রয়োজন, আর প্রয়োজন হবে কবে? তাই লিখলুম তোমাকে চিঠি। সন্দেহ আসতে চায় মনে, জোর করে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে বলি আসবেই বন্ধু। নইলে মিথ্যে হবে তার কথা, মিথ্যে হয়ে যাবে বৌদিদির শেষের আশীর্ব্বাদ। যে বোঝা তিনি ফেলে গেলেন সে-বোঝা বইবো আমি কোন্ জোরে। বলিতে বলিতে দু'ফোঁটা অশ্রু আবার গড়াইয়া পড়িল।

বন্দনা কহিল, সবাই বলে তুমি অবাধ্য। একা বৌদির ছাড়া আর কারো কথা শোননি।

দ্বিজদাস বলিল, এই তোমার ভয়? কিন্তু কেন যে শুনিনি বৌদি বেঁচে থাকলে এর জবাব দিতেন। এই বলিয়া সে নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিল।

বন্দনা চুপ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল, জবাব পেয়েচি তোমার, আর আমার শঙ্কা নাই। এই বলিয়া সে দ্বিজদাসের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কেবল তোমার চারপাশেই যে ভূমিকম্প হয়েচে তাই নয় আমার মধ্যেও এমনি প্রবল ভূমিকম্প হয়ে গেছে। যা ভূমিসাৎ হবার তা ধূলোয় লুটিয়েচে, যা ভাঙবার নয়, টলবার নয়, সেই অটলকেই আজ ফিরে পেলুম। এবার যাই দাদার কাছে। যাবার দিনে আমাকে তিনি আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন, বন্দনা, যে তোমার আপন, আমার আশীর্ব্বাদ

যেন তাকেই একদিন তোমার হাতে এনে দেয়। সাধুর বাক্য আমি অবিশ্বাস করিনি, নিশ্চয় জেনেছিলুম এ-কথা তার সত্য হবেই। শুধু ভাবিনি, সে আশীর্ব্বাদ এমন দুঃখের ভেতর দিয়ে সেই আপন জনকে এনে দেবে। যাই গিয়ে তাঁকে প্রণাম করিগে।

দ্বিজু, বন্দনা এসেচে, না? বলিয়া সাড়া দিয়া অন্নদা আসিয়া প্রবেশ করিল।

এসেচি অনুদি বলিয়া বন্দনা ফিরিয়া চাহিল। অন্নদার গভীর শোকাচ্ছন্ন মুখের প্রতি চাহিয়া বন্দনা চমকিয়া উঠিল, কাছে গিয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া অস্ফুটে কহিল, তোমার ও-মূর্ত্তি আমি ভাবতেও পারিনি অনুদি, তার পরেই হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্নদার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পিঠের উপর হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, হঠাৎ আর চলে যেও না দিদি, দিনকতক থাকো। আর তোমাকে কি বলবো আমি।

বন্দনা কথা কহিল না, বুকের উপর তেমনি মুখ লুকাইয়া মাথা নাড়িয়া শুধু সায় দিল। এমনিভাবে আবার বহুক্ষণ গেল। তার পরে মুখ তুলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাসু কোথায় অনুদি?

চাকরেরা তাকে পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে গেছে।

তাকে রেঁধে দেয় কে?

অন্নদা কহিল, দ্বিজু। ওরা দুজনে একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে শোয়। বলিতে বলিতে আবার তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, মুছিয়া কহিল, মা তো শুধু বাসুর মরেনি, ওর ও মরেচে। আবার চোখ মুছিয়া বলিল, সবাই বলে অকালে অসময়ে বাড়ীর বৌ মরেছে, ছেলেমানুষের শ্রাদ্ধে এত ঘটা কেন? ওকে সবাই করে মানা—বাহুল্য দেখে তাদের গা যায় জ্বলে, ভাবে এ যে বাড়াবাড়ি! জানে না ত সে ছিল ওর আর এক জন্মের মা। কোন ছলে সে মর্য্যাদায় ঘা লাগলে ওর সইবে কি করে?

দ্বিজদাস বন্দনাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, আর ভয় নেই অনুদি, বন্দনা এসেচেন, এবার সমস্ত বোঝা ওর মাথায় ফেলে দিয়ে আমি আড়াল হয়ে যাবো।

অন্নদা বলিল, পরের মেয়ে এত বোঝা বইবে কেন ভাই?

পরের মেয়েরাই ত বোঝা বয় অনুদি। ওঁকে ডেকে এনে বলেচি, এত দুঃখের ভার বইতে আমি পারবো না, এর ওপর বাসু যদি যায় তো রইলো তোমাদের বলরামপুরের মুখুয্যে-বাড়ী, রইলো তাদের সাতপুরুষের অভিমান,—শশধরের

ছেলেদের ডেকে এনে সংসারে আমি ইস্তফা দেবো। দাদাই শুধু পারে তাই নয়, দ্বিজুও পারে। সন্ন্যাস নিতে পারবো না বটে, ও আমি বুঝনে—কিন্তু টাকাকড়ির বোঝা অনায়াসে ফেলে দিয়ে যাবো।

অন্নদা বন্দনার হাত দুটি ধরিয়া কহিল, পারবে না দিদি বিপিনের মত করতে? পারবে না বাসুকে বাড়ীতে রাখতে?

পারবো অন্নদি।

আর এই যে বাধলো সর্ব্বনেশে মামলা জামাইবাবুর সঙ্গে, পারবে না থামাতে?

হাঁ, এ-ও পারবো অন্নদি। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, উনি কোনদিন আমার অবাধ্য হবেন না, এই সর্ত্তেই এ বাড়ীর ছোটবৌ হতে রাজি হয়েচি অন্নদি।

কথাটা অন্নদা ভাল বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিল, যা গেছে সে তো গেছেই। এর উপর কি মাকেও হারাতে হবে? মকদ্দমা না থামলে তাঁকে ফিরিয়ে আনবো আমি কি করে?

দ্বিজদাস বালিসের তলা হইতে চাবির গোছাটা বাহির করিয়া বন্দনার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া কহিল, এই নাও। অবাধ্য হবো না সেই সর্ত্তই তোমার কাছে আজ করলুম।

বন্দনা চাবির গুচ্ছ আঁচলে বাঁধিল।

এইবার অন্নদা ইহার তাৎপর্য্য বুঝিল। বন্দনাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল, তাহার দুই চোখ বাহিয়া শুধু বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বন্দনা বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বলিল, বড়দা, এলুম।

এই নূতন সম্বোধন বিপ্রদাসের কানে ঠেকিল। কিন্তু এ লইয়া কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনেছিলুম তুমি আসচো, তোমার বাবার তার পাওয়া গিয়েছিল। পথে কষ্ট হয়নি ত?

না।

সঙ্গে কে এল?

আমাদের দরওয়ান আর আমার বুড়ো চাকর হিমু।

বাবা ভালো আছেন?

হাঁ।

বিপ্রদাস একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, দ্বিজু কি পাগলামি করচে দেখলে।

বন্দনা কহিল, আপনি শ্রাদ্ধের কথা বলচেন ত? কিন্তু পাগলামি হবে কেন? আয়োজন এত বড়ই ত চাই। এ নইলে তাঁর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'তো যে।

কিন্তু সামলাতে পারবে কেন বন্দনা?

উনি না পারলেও আমি পারবো বড়দা।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিলেন, সে শক্তি তোমার আছে মানি, কিন্তু মেজাজ বিগড়োলেই মুস্কিল। হঠাৎ রাগ করে চলে না গেলে বাঁচি।

বন্দনা বলিল, সেদিন এসেছিলুম পরের মত, মাথায় কোন ভার ছিল না। কিন্তু আজ এসেচি এ-বাড়ীর ছোট বউ হয়ে। রাগিয়ে দিলে রাগ করতেও পারি, কিন্তু আর চলে যাবো কেমন করে? সে পথ বন্ধ হয়ে গেল যে। এই বলিয়া সে চাবির গোছা দেখাইয়া কহিল, এই দেখুন এ বাড়ীর সব আলমারী-সিন্দুকের চাবি। আপনি তুলে নিয়ে আঁচলে বেঁধেচি।

আনন্দ ও বিস্ময়ে বিপ্রদাস নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন। বন্দনা বলিতে লাগিল, আপনাকে আমার লজ্জা করে বলবার গোপন করে বলবার কিছু নেই। ভগবানের কাছে যেমন মানুষের নেই লুকোবার কিছু ঠিক তেমনি। মনে পড়ে কি আপনার আশীর্ব্বাদ? যাবার দিনে আমাকে বলেছিলেন, যে তোমার যথার্থ আপন তাকেই তুমি পাবে একদিন। সেদিন থেকে গেছে আমার চঞ্চলতা, শান্ত মনে কেবল এই কথাই ভেবেচি, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি আজন্ম শুদ্ধ সত্যবাদী সাধু, তাঁর আশীর্ব্বাদে আর আমার ভয় নেই। যিনি আমার স্বামী তাঁকে আমি পাবোই। দুই চক্ষু তাহার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং আজ এই প্রথম দিন বন্দনা তাঁহার পায়ের উপর বহুক্ষণ ধরিয়া মাথা পাতিয়া নমস্কার করিল। উঠিয়া দাঁড়াইলে বিপ্রদাস কহিলেন, আজ যাকে তুমি পেলে বন্দনা, তার চেয়ে দুর্লভ ধন আর নেই। এ কথাটা আমার চিরদিন মনে রেখো।

বন্দনা কহিল, রাখবো বড়দা। একদিনও ভুলবো না।

একটু থামিয়া কহিল, একদিন অসুখে আপনার সেবা করেছিলুম পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন নিইনি,—মনে পড়ে সে কথা?

পড়ে।

আজ সেই পুরস্কার চাই। বাসুকে আমি নিলুম।

বিপ্রদাস হাসিমুখে বলিলেন, নাও।

তাকে শেখাবো আমাকে মা বলে ডাকতে।

তাই ক'রো। ওর মা এবং বাপ দু'জনকেই আজ রেখে গেলাম তোমার মধ্যে। আর রেখে গেলাম এই মুখুজ্যে-বাড়ীর বৃহৎ মর্য্যাদাকে তোমার হাতে।

বন্দনা ক্ষণকাল মাথা হেঁট করিয়া এই ভার যেন নীরবে গ্রহণ করিল, তার পরে কহিল আর একটি প্রার্থনা। নিজেকে চিনতে না পেরে একদিন আপনার কাছে অপরাধ করেছিলুম। ভুল ভেঙেচে, আজ তার মার্জ্জনা চাই।

মার্জ্জনা অনেকদিন করেচি বন্দনা। আমি জানতাম তোমার অন্তর যাকে একান্ত-মনে চেয়েচে একদিন তাকে তুমি চিনবেই। তাই আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই।

বন্দনার চোখে আবার জল আসিতেছিল, জোর করিয়া নিবারণ করিয়া বলিল, আরও একটি ভিক্ষে। আমাদের সংসারে কি একদিনও থাকবেন না—আর? অভিমানে সঙ্কোচে কোনদিন মন পূর্ণ করে আপনাকে যত্ন করতে পাইনি, কিন্তু সে বাধা ত ঘুচলো; আর ত আমার লজ্জা নেই -কিছুদিন থাকুন না আমার কাছে? দু'দিন পূজো করি। এই বলিয়া সজল চক্ষে চাহিয়া রহিল—তাহার আকুল কণ্ঠস্বর যেন অন্তর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল।

বিপ্রদাস হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

বন্দনা বলিল, এই হাসিমুখের মৌনতাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি বড়দা। কি কঠোর আপনার মন, একে না পারা যায় গলাতে, না পারা যায় টলাতে। দেবেন না উত্তর?

বিপ্রদাস এবার হাসিয়া ফেলিলেন। যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি সুন্দর, তেমনি নির্ম্মল। তাঁহাকে এমন করিয়া হাসিতে বন্দনা যেন এই প্রথম দেখিল। বলিল, উত্তর পেলুম, আর আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু মনকে শান্ত করি কি করে বলে দিন। এ যে কেবলি কেঁদে উঠতে চায়।

বিপ্রদাস বলিলেন, মন আপনি শান্ত হবে বন্দনা, যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝবে তোমার দাদা দুঃখের মাঝে ঝাঁপ দিতে গৃহত্যাগ করেনি। কিন্তু তার আগে নয়।

কিন্তু এ আমি বুঝবো কেমন ক'রে?

শুধু আমাকে বিশ্বাস ক'রে। জানো ত দিদি আমি মিছে কথা বলিনে।

বন্দনা চুপ করিয়া রহিল। মিনিট দুই পর গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাই হবে। আজ থেকে প্রাণপণে বোঝাবো নিজেকে, বড়দা সত্যি কথাই বলে গেছেন,

সত্যবাদী তিনি, মিছে কথায় ভুলিয়ে চলে যাননি। যেখানে আছে মানুষের চরম শ্রেয়ঃ, সেই তীর্থেই তিনি যাত্রা করেচেন।

বিপ্রদাস কহিলেন, হাঁ। তোমার মনকে বুঝিয়ে বোলো যা সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে মধুর, বড়দা সেই পথের সন্ধানে বার হয়েছেন। তাঁকে বাধা দিতে নেই, তাঁকে ভ্রান্ত বলতে নেই, তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।

বন্দনার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, তাই হবে, তাই হবে। এ-জীবনে আর যদি কখনো দেখা না পাই, তবু বলবো তিনি ভ্রান্ত ন'ন, তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।

পর্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া বিরাজ দত্ত বলিলেন, দিদি একটা জরুরি কথা আছে, একবার আসতে হবে যে।

যাই বিরাজবাবু। বড়দা, আসি এখন, বলিয়া বন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সতীর শ্রাদ্ধের কাজ ঘটা করিয়া শেষ হইল। ভিক্ষুক কাঙালী সতীসাধ্বীর জয়গান করিয়া গৃহে ফিরিল, সকলেই বলিল, মুখুয্যে-বাড়ীর কাজ এমনি করেই হয়, এর ছোট-বড় নেই।

সকালে স্নান সারিয়া বন্দনা প্রণাম করিতে বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল—তাঁহার পাশে বসিয়া দয়াময়ী। ভোরের ট্রেনে বাড়ী ফিরিয়াছেন, এখনো কেহ জানে না। মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া বন্দনার বুকে আঘাত লাগিল। সোনার বর্ণ কালি হইয়াছে, মাথার ছোট ছোট চুলগুলি রুক্ষ, ধূলিমাখা, চোখ বসিয়াছে, কপালে রেখা পড়িয়াছে—দুঃখ শোকের এমন ব্যথার ছবি বন্দনা কখনো দেখে নাই। তাহার মনে পড়িল সেদিনের সেই ঐশ্বর্য্যবতী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী বিপ্রদাসের মাকে। ক'টা দিনই বা! আজ সমস্ত মহিমা যেন তাঁহার পথের ধুলায়। কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, কখন এলেন মা, আমি জানতে পারিনি ত।

দয়াময়ী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, বলিলেন, আমার আসার খবর কিসের জন্যে বন্দনা? তখন আসতো বিপ্রদাসের মা, তাই দেশের ছেলে-বুড়ো সবাই টের পেতো। বিপিন, কাজ ত চুকে গেছে বাবা, চল্ না মায়ে-পোয়ে আজই বেরিয়ে পড়ি।

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিয়া কহিলেন, তোমার ভয় নেই মা, মায়ে-পোয়ে যাত্রায় বিঘ্ন ঘটবে না, কিন্তু আজই হয় না। বন্দনার বাবা আসবেন কাল, তোমার ছোটবৌয়ের হাতে সংসার বুঝিয়ে না দিয়ে যাবে কেমন করে?

দয়াময়ী অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, তাই হোক বিপিন। সহ্য হবে না আমার এমন মিথ্যে আর মুখে আনবো না। কিন্তু ক'টা দিন আর বাকি?

কেবল সাতটা দিন মা। আবার আজকের দিনেই আমরা যাত্রা সুরু করবো।

বন্দনা কহিল, মা, বাড়ীর ভেতরে আপনার ঘরে চলুন।

দয়াময়ী মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিলেন—তোমার এই কথাটি রাখতে পারবো না মা। যে ক'টা দিন থাকবো, এইখানেই থাকবো, আবার যাবার দিন এলে এই বাহিরের ঘর থেকেই দু'জনে বার হয়ে যাবো। ভেতরে যা কিছু রইলো সে সব তোমার রইলো মা।

বন্দনা পীড়াপীড়ি করিল না, শুধু আবার একবার তাঁহার পদধূলি লইয়া নতমুখে বাহির হইয়া গেল।

বিপ্রদাসের পত্র পাইয়া রে-সাহেব এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বলরামপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মেয়েকে দ্বিজুর হাতে অর্পণ করিয়া আবার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন।

এ বিবাহে নহবৎ বাজিল না, বরযাত্রীর-কন্যাযাত্রীর বিবাদ বাধিল না, মেয়েরা উলু দিল অস্ফুট, শাঁক বাজিল চাপা স্বরে,—বাসর-গৃহ রহিল স্তব্ধ, মৌন।

নিরালা কক্ষে দ্বিজদাসের বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া বন্দনা প্রশ্ন করিল, কি ভাবচো বলতো?

দ্বিজদাস বলিল, ভাবচি তোমার কথা, ভাবচি আমার চেয়ে তুমি অনেক বড়।

কেন?

নইলে পারতে না। সর্ব্বনাশ বাঁচাতে কি দুঃখের পথ হেঁটেই না তুমি আমার কাছে এলে।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আসতে না?

না।

বন্দনা বলিল, মিছে কথা। কিন্তু আমি কি ভাবছিলুম জানো? তোমার

গলায় মালা পরিয়ে দিতে দিতে ভাবছিলুম, আমি এমন-কি সুকৃতি করেছিলুম যাতে তোমার মত স্বামী পেলুম! পেলুম বাসুকে, মাকে, বড়দাদাকে। আর পেলুম এই বৃহৎ পরিবারের বিপুল ভার। কিন্তু যে সমাজের মেয়ে আমি, তার প্রাপ্য কতটুকু জানো?

দ্বিজদাস কহিল, না।

বন্দনা বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। কহিল, কিন্তু আজ নয়। নিজের পরম সৌভাগ্যের দিনে অন্যের দৈন্যকে কটাক্ষ করবো না। অপরাধ হবে।

হবে না তুমি বলো।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, কহিল আজ তুমি ক্লান্ত একটু ঘুমোও, তোমার মাথায় আমি হাত বুলিয়ে দিই।

মিনিট দুই পরে বলিল, আমার মেজদির কথা মনে পড়ে? সেদিন বড়দার সঙ্গে তখনি চলে যেতে চাইলেন দেখে বললুম, তুমি ত ঝগড়া করোনি মেজদি, তুমি কেন যাবে? মেজদি বললেন, যেখানে স্বামীর স্থান হয় না, সেখানে স্ত্রীরও না। একটা দিনের জন্যেও না! তোর স্বামী থাকলে একথা বুঝতিস। সেদিন হয়ত ঠিক এ-কথা বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝচি তুমি না থাকলে আমি একটা দিনও সেখানে থাকতে পারিনে।

একটু থামিয়া বলিল, এই ত ঘণ্টা-কয়েক আগে পুরুতের সঙ্গে গোটা-কয়েক শব্দ উচ্চারণ করে গেলুম, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমার দেহের প্রতি রক্তকণাটি রমকিমিয়া বদলে গেচে।

দ্বিজদাস চোখ মেলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। তাহার হাতখানি নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিল। কোন কথা কহিল না।

রবিবার ঘুরিয়া আসিল। বিপ্রদাস ও দয়াময়ীর যাবার দিন আজ! তীর্থভ্রমণ দয়াময়ীর একদিন সমাপ্ত হইবে; সেদিন সংসারের আকর্ষণ হয়ত এই গৃহেই আবার তাহাকে টানিয়া আনিবে, কিন্তু যাত্রা শেষ হইবে না আর বিপ্রদাসের, আর ফিরাইয়া আনিবে না তাঁহাকে এ-গৃহে। এ-কথা শুনিয়াছে অনেকে। কেহ বিশ্বাস করিয়াছে, কেহ করে নাই।

প্রাঙ্গণে মোটর দাঁড়াইয়া। কাছে-দূরে বাটীর সকলেই উপস্থিত। মেয়েরা দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছে, বিপ্রদাস উঠিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন দ্বিজুকে দেখচিনে কেন?

কে একজন বলিল, তিনি বাড়ী নেই, কি-একটা কাজে বাহিরে গেছেন শুনিয়

হাসিয়া বলিলেন, পালিয়েচে। সেটা শুধু মুখেই গোঁয়ার, নইলে ভাতুর
গ্রগণ্য।

বন্দনার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল বাসু। বলিল, তুমি কবে আবার আসবে বাবা?
ট্‌ শিগ্‌গির করে এসো।

বিপ্রদাস হাসিয়া তাহার মাথায় একবার হাত বুলাইয়া দিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর
লেন না।

বন্দনা শাশুড়ীর পায়ের ধুলা লইল। তিনি বলিলেন, বাসু রইলো ছোট বৌমা।
র রইলেন মন্দিরে তোমার শ্বশুরকুলের রাধাগোবিন্দজী। ফিরে কথনো এলে তোমার
থেকে এঁদের নেবো। এই বলিয়া তিনি আঁচলে চোখ মুছিলেন।

বন্দনা দূর হইতে বিপ্রদাসকে প্রণাম করিল। তার পরে কাছে আসিয়া সজল-
ক বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কহিল, কলকাতায় পূজোর ঘরে যে-মূর্ত্তি একদিন আপনার
কয়ে দেখেছিলুম, আজ আবার সেই মূর্ত্তিই আমার চোখে পড়লো বড়দা। আর
মার শোক নেই, ঠিকানা আপনার নাইবা পেলুম, জানি মনের মধ্যে যেদিন ডাক
বো আসতেই হবে আপনাকে। যতই না না বলুন, এ-কথা কোনমতেই মিথ্যে
ব না।

বিপ্রদাস শুধু একটু হাসিলেন। যেমন করিয়া ছেলের উত্তর এড়াইয়া গেলেন তেমনি
রিয়া বন্দনারও।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।